বিষ্ণু প্রভাকর

(আওয়ারা মসীহা)

অনুবাদ

দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল

প্রথম বাংলা অনুবাদ : মহালয়া ১৩৬৪।

প্রকাশক :
শীলা ভট্টাচার্য
[illegible]শা প্রকাশনী
৭[illegible], মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
অজয় গুপ্ত

উৎসর্গ

হিন্দী প্রকাশনের পিতামহ ভীষ্ম
শ্রীনাথুরাম প্রেমীকে
যিনি আজ নেই
কিন্তু যাঁর প্রেরণা ছাড়া
'আওয়ারা মসীহার'
সৃষ্টি
অসম্ভব ছিল।

ভূমিকা

কখনও ভাবতে পারিনি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনী আমায় লিখতে হবে। এ আমার বিষয় নয়, কিন্তু হঠাৎই এমন এক জায়গা থেকে এ প্রস্তাব আমার কাছে এল যে আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। হিন্দী গ্রন্থ-রত্নাকর বম্বের স্বত্বাধিকারী শ্রীনাথুরাম প্রেমী শরৎ সাহিত্যের প্রামাণিক হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর বড় সাধ ছিল এই ক্রমে শরৎচন্দ্রের একটি জীবনী প্রকাশ করা হোক। এ সম্বন্ধে তিনি যশপাল জৈনের সঙ্গে কথা বলেন এবং জানিনা কেমন করে লেখক হিসাবে আমার কথা তাঁদের মনে পড়ে। যশপালের আগ্রহে আমি যে তখনই কাজটি হাতে নিয়েছিলাম তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে নিতে হল একথা সত্যি। তার প্রধান কারণ বোধহয় শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার অনুরক্তি। তাঁর সাহিত্য পড়ে তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ করে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর বিষয়ে জানবার তীব্র ইচ্ছে আমার মনে কয়েকবারই জাগে। হয়ত ইচ্ছাপূরণের এই-ই সুযোগ, ভাবলাম বাংলা সাহিত্যে নিশ্চয়ই তাঁর বহু প্রামাণিক জীবনী আছে। স্মৃতি প্রবন্ধ তো না জানি কতই না লেখা হয়েছে। সে সব থেকেই সামগ্রী নিয়ে এই ছোট্ট জীবন চরিতখানি লিখে ফেলব। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখলাম প্রামাণিকতার কথা বাদ দিলেও যথার্থ অর্থে যাকে জীবনী বলা হয় এমন কোন বই বাংলায় নেই। তাঁর জীবনের কল্পিত কাহিনীকে জীবনীর রূপ দিয়ে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সে বইগুলিতে শরৎবাবুর বাস্তব চরিত্রতো ফোটেনি বরং তা আরও জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

এর পর আমি নানান জায়গায় খোঁজ শুরু করলাম কিন্তু যেমন যেমন এগুচ্ছিলাম তাতে যেন আরও বেশী করে জড়িয়ে পড়ছিলাম। খুঁজে খুঁজে আমি তাঁর সমসাময়িক লোকেদের সঙ্গে দেখা করি। বিহার বাংলা বর্মা সব জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু কোথাও উৎসাহজনক আবহাওয়া দেখলাম না। প্রায় সব বন্ধুরাই আমাকে বলেন, 'তুমি শরতের জীবনী লিখতে পারবে না।

নিজের ভূমিকায় এ কথা স্পষ্ট করে লিখে দিও যে শরতের জীবনী লেখা অসম্ভব ব্যাপার।' আবার তাঁদের মধ্যে এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন 'বাদ দাও, বাদ দাও, কিই বা ছিল তাঁর জীবনে যা তুমি পাঠককে দিতে চাও! ছন্নছাড়া কোন লোকের জীবন কি কারুর অনুকরণীয় হতে পারে? তাঁর সম্বন্ধে যা জানি তা আমাদের মধ্যেই থাক অপরে তা জেনেই বা কি করবে? যেতে দাও, ও সব নিয়ে কি হবে?'

এক ভদ্রলোক তো অত্যন্ত উগ্র হয়ে রুক্ষ স্বরে বল্লেন, 'বললাম তো ওঁর বিষয়ে কিছুই বলব না।' আর একজনের তো ঘৃণার শেষ ছিল না। গান্ধীজী ও শরৎকে নিয়ে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, সে সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'ছিঃ, তুমি ওই বদমাশটার সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনা করেছ কি বলে?'

আর এক বন্ধু অনেক বড বড় পদে কাজ করেছেন। আমার কথা শুনে হেসে বললেন, 'কেন এত চিন্তা করছ! দু-চারটে গুণ্ডা বদলোকের জীবন দেখে নাও, ব্যাস শরৎচন্দ্রের জীবনী তৈরি হয়ে যাবে।'

এ ধরনের মন্তব্যের কোন শেষ ছিল না। কিন্তু ফল হল যে এই ধরনের কথাবার্তা আমায় আমার সংকল্প থেকে বিরত না করে বরং একটা চ্যালেঞ্জের প্রেরণা জোগাল। ১৯৫৯ সালে আমি আমার যাত্রা শুরু করি, আজ ১৯৭৩। আমার ১৪ বছর লেগেছে 'আওয়ারা মসীহা' লিখতে। সময় অর্থ দুই-ই আমার কাছে অর্থব্যঞ্জক, কারণ আমি মসীজীবী লেখক। কিন্তু এ কাজে হাত দিয়ে আমি এমন রসের স্বাদ পেলাম যে দাবির সঙ্গে বলতে পারি— আমি যেটুকু করেছি পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে করেছি এবং করে আনন্দও পেয়েছি। এই যে বিশ্বাস ও আনন্দ, এটুকুই আমার যথার্থ পারিশ্রমিক।

আমার আগে বাংলার দু একজন বন্ধু এ বিষয়ে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রামাণিক কাজ হল শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমে শরৎবাবুর জীবনকে সহজবোধ্য করার সামগ্রী জোটানোর প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আমার প্রারম্ভিক কাজ ১৯৬৫-তে শেষ হয়, সেই সময়ই তাঁর লেখা গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এতে শরৎচন্দ্রের জীবনী এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কিছু সামগ্রীও আছে। তাঁর সঙ্গে আমি আমার কাজের তুলনা করতে চাইনা। তিনি আমার অনেক আগে থেকে কাজ করছেন। আমাদের দুজনের ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।

তিনি বাঙ্গালী এবং শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্যেও এসেছেন। আমি বাঙালী নই এবং শরৎবাবুকে দেখার সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটেনি। বাংলা ভাষাও আমি ভাল জানি না—তাই যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই অবাক হয়ে ভেবেছেন, বাইরের কেউ একজন শরৎবাবুর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন!

তাঁরা উৎসাহিত হয়ে অত্যন্ত সততার সঙ্গে আমায় সাহায্য করেন। কেউ কেউ উপেক্ষার চোখেও দেখেছেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বেশী নয় এবং এসব আমার অনুসন্ধান পর্বের প্রথম দিকেই ঘটে। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ গভীরতর হয়, যদি তা না হত তাহলে কি এ কাজ কোন দিন সম্পূর্ণ হতে পারত?

তবু সমস্যার যেন শেষ ছিল না। কয়েকজন বন্ধু যাঁরা শরৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার পরও তা প্রমাণ করতে অস্বীকার করেন। বলেন, 'আপনি আমার নাম না দিয়ে নিজের মত করে এ কথা প্রকাশ করতে পারেন।'

এঁদের মধ্যে এমন বন্ধুও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা আমায় সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, যদি আমি শরৎবাবুর মুখ দিয়ে এমন কিছু বলাই বা নিজেও কিছু লিখি তাহলে পরিণাম ভাল নাও হতে পারে। আমি ক্ষমা পাবনা। কেউ কেউ বা এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেরাই লিখতে আগ্রহী, কিন্তু এটুকুই আমার দুঃখ যে তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই এ কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন। তবুও যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্যই শরৎ সম্বন্ধে প্রামাণিক সামগ্রী লোকসম্মুখে আসে, এবং এর ফলে আমিও কম লাভবান হইনি।

শরৎচন্দ্রের সমকালীন কয়েকজন লোকের কথা আমি জানি যাঁরা সত্য সত্যই তাঁকে ঘৃণা করতেন। রেঙ্গুনের এক ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন, 'তিনি একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর বাড়িতে খুব কম লোকই যেত। আমি তাঁর প্রতিবেশী হয়েও কোনদিন তাঁর বাড়িতে যাইনি। তিনি আফিং ও মদ খেতেন, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনে জীবনযাপন করতেন। আমি সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলতাম।'

এ ধারণা শুধু এই ভদ্রলোকেরই ছিলনা। অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে এই রকমই ভেবে এসেছেন এবং বিশ্বাসও করেছেন। আবার এমনও লোক ছিলেন যাঁরা তাঁর কাছে যেতেন, তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁদের মাধ্যমেই আমি খানিকটা যেন শরৎবাবুকে বুঝতে পেরেছি। গুজব ও রটনায়

ভারাক্রান্ত তাঁর জীবনকে বোঝা তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যারা তাঁর কাছের মানুষ ছিলেন তাঁরাই কি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন ? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। স্বয়ং শরতের মামা ও বাল্যসখা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সম্বন্ধে দু-খানি বই লিখেছেন এবং তাতে যথেষ্ট পরস্পরবিরোধী তথ্য রয়েছে। 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত হয়ত আমায় কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসবে যে শরৎচন্দ্র নামে কোন লোক দেশে ছিলনা, কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক কয়েকটা উপন্যাস লিখে শরৎচন্দ্রের নামে চালিয়ে দেয়।

এ কথায় কোনও সংশয় নেই যে মানুষ শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। সাধারণ কথাবার্তার সময়েও মনের ভাবটি গোপন করে মনগড়া গল্প চালিয়ে যেতেন। অপবাদ, মিথ্যাচার ও তাঁকে নিয়ে ভ্রান্ত ধারণার যে আবর্তে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন তাতে অবশ্য তাঁর নিজেরও অবদান কিছু কম ছিলনা। তিনি ছিলেন পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প শোনাতে পারতেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করত 'এই ঘটনাটি আপনার নিজের জীবনে ঘটেছে ?' তিনি বলতেন, 'না, না গল্প। সবই গল্প একটুও সত্যি নয়।'

শুধু তাই নয়, একই ঘটনা নানান জায়গায় নানানভাবে শোনাতেন। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত 'দাদা কাল যে আপনি এই ঘটনাটি অন্য রকম ভাবে বলেছিলেন ? শরৎ রেগে বলতেন, 'ঘটনা যখন আমার তখন এ দাবিও আমার আছে যে তা আমি আমার ইচ্ছেমত শোনাচ্ছি।'

যে কোন বিধিতেই হোক না কেন তাঁর দুটি বিবাহ হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যু হয় তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় বাইশ বছর পরে।[১]

হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর বিধিসম্মত উত্তরাধিকারিণী ছিলেন কিন্তু চিরদিন লোকেরা ভেবে এসেছে (এবং আজও ভাবেন) যে শরৎচন্দ্র অবিবাহিত ছিলেন। সভা-সমিতিতে তাঁকে 'বালক ব্রহ্মচারী' বলে পরিচয় দেওয়া হত। এ সম্বন্ধে অনেক রকম জনশ্রুতি শোনা যায়, কিন্তু কখনও তিনি এই বিষয়টা স্পষ্ট করেননি। বর্মা প্রত্যাগত এক বন্ধু কলকাতার এক সভায় এই ধরনের কথা-বার্তা শুনে আশ্চর্য হয়ে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি কেন এ সব হতে দেন' ?

শরৎবাবু হেসে বলেছিলেন, 'শুনে ভারি মজা পাই।'

---

১. ৩১ আগষ্ট, ১৯৬০ সাল।

তিনি নিজেই লিখেছেন, 'আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি, এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে, কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এইসব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকারের দায় আমার নয়-তাঁদের। তাঁদের করতে বলো গে।'

বাস্তবিকই নিজের সম্বন্ধে সব কথা তিনি এমন গোপন রাখতে পারতেন যে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত তা জানতে পারতেন না। কবি নরেন্দ্র দেব ও তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী, এঁদের বাড়িতে শরৎচন্দ্র বহু সময় কাটাতেন কিন্তু তাঁরাও তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সামগ্রী একত্রিত করতে পারেন নি। ঠিক এই রকমই অবস্থা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের। শরৎচন্দ্রের বিষয়ে সঠিক কোন কথা তিনিও বলতে পারতেন না। কেউ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সিরিয়াসলি তাঁর জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলে বলতেন, 'দেখো লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? সে লেখক, সেইজন্যে কি জীবনের সব কথা তাকে বলতে হবে, তার কি মানে? লেখকের লেখার মধ্যে তার যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, সেটাই লেখকের যথার্থ পরিচয়। তাই আমি বলতে চাই যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও লেখক জীবন দুটো এক নয়। কোন কারণেই এ দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এটুকু জেনে রেখে আমি আমার লেখার মধ্যে নিজেকে যেটুকু ব্যক্ত করেছি আমার সেটুকু পরিচয়ই পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট। একদিন আমি থাকব না তোমরাও থাকবে না। আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে লোকের জানারও আগ্রহ থাকবে না। সেদিন যদি আমার কোন লেখা বেঁচে থাকে তাহলে তা নিয়েই তারা চর্চা করবে, আমার চরিত্র নিয়ে নয়।'

দুর্ভাগ্য! যদি আজ তিনি সত্যি দেখতে পেতেন যে লোকে তাঁর জীবন নিয়ে কি পরিমাণ চিন্তিত এবং কি ধরনের মনগড়া গুজব ছড়াচ্ছেন। সত্যি মিথ্যের তফাৎ বলে আর কিছু যেন রইল না। হয়ত এসব কথা শুনেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এ জন্যই আমি মরতে চাই না।'

লোকে বলে, একবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'শরৎ তুমি নিজের আত্মকথা লেখ। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'গুরুদেব, যদি জানতাম

যে আমি এতবড় হব তাহলে অন্যরকমভাবে বাঁচার চেষ্টা করতাম।'

এ ব্যঙ্গ হতে পারে আবার নিছক সত্যিও। কিন্তু এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভাবে তিনি ছেলেবেলা থেকে যৌবন পর্যন্ত কাটিয়েছেন সে জীবনের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। একেবারে নিচুতলার গহ্বর থেকে উপরে উঠেছেন। প্রারম্ভিক জীবনে যে অভাব, অপমান, উপেক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁকে এগুতে হয়েছে তাতে তাঁর শিল্পী মন হয়ত শক্তি পেয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবন ভেঙ্গে গিয়েছিল। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে সত্যি কি তাঁর মনে এ বেদনা ছিল যে উচ্ছৃঙ্খল বখাটে জীবন কাটিয়েছেন? মদ খেয়ে নেশায় মাতাল হয়ে বেশ্যাদের কাছে গিয়ে পড়ে থেকেছেন—সম্ভব-অসম্ভব বাস্তব-অবাস্তব ভালবাসার ঘটনা ঘটিয়েছেন।

হয়ত এ দুঃখবোধ তাঁর হয়েছিল তাই গুরুদেবকে ও কথা বলেছিলেন। কোনও এক বার তিনি এ কথাও বলেছিলেন 'আমি আত্মকথা লিখতে পারব না, কারণ আমি তত সত্যবাদী নই আর অতটা সাহসীও নই যা একজন আত্মজীবনী লেখকের হওয়া উচিত।'

এ সব থেকে কি এ কথাই স্পষ্ট হয় না যে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন এই রকম বিরোধাভাসের গভীরে অবগাহন করেই হতে পারে, মানুষকে দেবতা অথবা শয়তান মেনে নিয়ে অর্থাৎ শুধু ভাল ও মন্দ নিয়ে চেনবার প্রচলিত পদ্ধতি দিয়ে নয়। তাইত এক মারাঠি বন্ধু লেখককে সতর্ক করে বলেছিলেন 'শরতের ভাবী জীবনী লেখককে শেষপর্যন্ত এ কথা মনে রাখতে হবে যে তিনি মানুষের দোষগুণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না।'

জীবনী লেখা নিঃসন্দেহে শক্ত কাজ। এমনিতে দেখতে গেলে মনে হবে তিনি কতকগুলো অদ্ভুত অসাধারণ ঘটনা ও আন্দোলনকারী বিচারের সমন্বয়। কোনও ব্যক্তির জীবনকে বুঝতে হলে কিছু মহত্বপূর্ণ ঘটনা অবশ্যই আবশ্যক, কিন্তু অনিবার্য নয়। অনিবার্য হল সেই সকল ঘটনা ও বিচারের প্রেরণা-স্রোত কি তা জানা। যা দেখা যায় তাই সত্য নয়। সত্যকে পেতে হলে গভীরে ঢুকতে হবে। এর অনিবার্যতা সর্বোপরি। ড. জনসন বলেছিলেন, 'সেই লোকই কারুর জীবনী লিখতে পারে যে তার সঙ্গে খেয়েছে, পরেছে, শুয়েছে, বসেছে, কথা কয়েছে।'

এ কথা মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু অনিবার্য নয়। যে ব্যক্তির সে সৌভাগ্য হয়নি তার আস্থায় সন্দেহ করার কোন উচিত কারণ দেখা যায় না। এছাড়া

নিরপেক্ষতার সুযোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে পুরোপুরি। দূরত্ব বস্তু নির্ণায়ক দৃষ্টিদানে সহায়ক।

কোন এক বিদ্বান ব্যক্তি কোথাও লিখেছেন, 'জীবনী লেখা নিছক ইতিহাস মাত্রই হবে যদি না তার অভিব্যক্তি কলাত্মক হয়, আর তাতে যেন লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত না হয়। তা অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের নিরপেক্ষতা কিন্তু স্পষ্ট অধ্যয়ন হবে।

জীবনী কি জিনিস? অভিজ্ঞতার শৃঙ্খলাবদ্ধ কলাত্মক চয়ন। এতে সেই সকল ঘটনাই গাঁথতে হয় যাতে সংবেদনা ও গভীরতা ছাড়া মনকে আলোড়িত করবার ক্ষমতা থাকবে। ঘটনার চয়ন লেখক কোন নীতি তর্ক ও দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করেনা। সে ডুবুরীর মতন জীবন সাগরে ডুবে মুক্তো কুড়িয়ে বেড়ায়। সত্যিকারের জোরালো সংবেদনশীলতার প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি মুক্তো। শ্রেষ্ঠ জীবনী লেখক দেশ, কাল, ব্যক্তি ও ঘটনার সীমানা ভেঙ্গে ফেলে অনুভূতিকে সৌন্দর্যে বিক্ষেপণ করে। বিশুদ্ধ শিল্প ও মানদণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের প্রণয়ন করে।'

জানিনা 'আওয়ারা মসীহা' এই কষ্টিপাথরে কতটা খাঁটি উৎরোবে। কিন্তু একটা কথা পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে শিল্প হয়ত আমি খুইয়েছি, কিন্তু আস্থা হারাইনি এবং সতত জোরালো সত্যিকারের সংবেদনশীল ক্ষণগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে সাহিত্যিকের জীবন তার সাহিত্য। সেই মারাঠী বন্ধু একথাও লিখেছিলেন, 'আমার চেষ্টার উদ্দেশ্য যদি তথ্যপূর্ণ সামগ্রীর খোঁজ করা হয় তাহলে এ চেষ্টা অবশ্যই কতকটা হাস্যকর। তিনি কোথায় জন্মেছিলেন, কবে স্বর্গে গেলেন, রেঙ্গুনে কোথায় ছিলেন, এ পৃথিবীতে কোন স্ত্রীরূপী দেবী তাঁকে সঙ্গ দিয়েছে, কাজ রোজগারের কি ব্যবস্থা ছিল, স্বাস্থ্যের প্রতি কেন অবহেলা করেছিলেন, কেন কারুর কাছে কখনও কোনরকম সাহায্যের মুখাপেক্ষী হননি, অপরের সাহায্যে কেন নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছিলেন? এ রকম অনেক প্রশ্নের উত্তর যদি তাঁর লেখার মধ্যে না পাই তাহলে আর কোথায় পাওয়া যাবে?'

জেবুন্নিসার শব্দে শরৎও তো এই কথাই বলেছেন—

'দর সখুন পিন্‌হা শুদম্ মানিন্দে বু দর-বর্গেগুল,
হর কী দীদন মেল দারদ দর সখুন মীনদ বরা।'

তেরো

অর্থাৎ—সুগন্ধ যেমন ফুলের পাপড়িতে ছড়িয়ে থাকে সেই রকমই আমি আমার কবিতায় পরিব্যাপ্ত। যে আমার সঙ্গে মিলনে ইচ্ছুক, সে আমায় আমার কাব্যে খুঁজে নিক।

'মেরা হর্ শের হ্যায় অখতর মেরি জিন্দা তসবীর
দেখনেবালো নে হর লফ্‌জ মে দেখা হ্যায় মুঝে।

শরৎ সাহিত্য মহান এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর জীবন সেও কিছু কম মহৎ নয়। তাঁর সাহিত্য ঘরে ঘরে সমাদরে পড়া হয়েছে, কিন্তু দেশব্যাপী এই সমাদরের স্রষ্টা তাঁর নিজের ঐকান্তিক দুঃখকে গোপন রেখে হাসিমুখে দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সম্পর্কে তাঁর মামা চিরবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অনেকে বলে থাকেন যে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে আত্মপ্রকাশ করে গেছেন, জীবনী হিসাবে তাই যথেষ্ট। তাঁর স্বতন্ত্র জীবনচরিতের কোন প্রয়োজন নেই। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁর নিজের সাহিত্যের মধ্যে অদ্ভুত আত্মগোপনই করেছেন।'

নিজের সাহিত্যেই যে শরৎ নিজেকে লুকিয়েছেন তা নয়, বাস্তব জীবনেও তিনি নিজেকে সতত গোপন রাখার চেষ্টা করে গেছেন। প্রসিদ্ধি থেকে চিরদিনই মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। লিখতেন ঠিকই কিন্তু তাঁর তরফ থেকে বই প্রকাশ করার আগ্রহ কোনদিনই জানাননি। যদি তাঁর স্বার্থপর বন্ধুরা অজান্তেই তাঁকে অন্ধকার থেকে বাইরে টেনে না আনতেন, যদি না তাঁর প্রতিভা তৎকালীন সাহিত্য জগৎকে আলোড়িত না করে তুলত তাহলে হয়ত তিনি রেঙ্গুনেই নিজের নির্বাসিত জীবন শেষ করে ফেলতেন। কিন্তু একথা অব্যর্থ সত্য যে লেখা তিনি ছাড়েননি। শ্রীইলাচন্দ্র যোশীর কথায় বলা যেতে পারে যে, 'কয়েকটা রহস্যময় মনোগ্রন্থির দরুন নিজের জীবনকালে সম্ভাব্য খ্যাতি তিনি এড়াতে চাইতেন আর লিখতেন শুধু এই ভেবে যে মৃত্যুর পর সেগুলি প্রকাশিত হোক, এবং একজন মৃত লেখকের রচনার মাধ্যমে বর্ণিত মহান আত্মা সমস্ত লেখকদের উপর প্রতিপত্তি ছড়িয়ে দিক।'

এই প্রবৃত্তিকে হীন মনোবৃত্তিও বলা যেতে পারে আবার বৈরাগী উদাসী মনও। আবার এ হয়ত প্রারম্ভিক জীবনের অভাব অনটন অপমানের দরুন অন্তর্মুখী প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। কিন্তু এই কারণগুলির জন্যই জীবনচরিত লেখকের কাছে দুরূহ হয়ে উঠেছে। আবার এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে এই চ্যালেঞ্জই লেখককে সব চেয়ে বেশী শক্তি জুগিয়েছে। এ অবস্থায়

অনুমান করা হয়ত শক্ত নয় যে সব সামগ্রী একত্রিত করতে চোদ্দ পনেরো বছর সময় আমার কেন লেগেছে? আর আজও কি বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে যেটুকু আমি জোগাড় করতে পেরেছি তা একান্ত ভাবেই যথার্থ?

এ দাবি আমি নিশ্চয় করতে পারিনা। আবার আজ যদি কেউ বলে বসে আমি যা লিখেছি সবই মিথ্যে—তারও কোন প্রতিবাদ আমি চাইনা।

শিল্পের জন্য সত্য আদর্শ না হতে পারে কিন্তু জীবন চরিত লেখা এ দিক দিয়ে বিজ্ঞানের কাছাকাছি এবং তার আদর্শের আধার হল সত্য—কিন্তু আগেও বলা হয়েছে ঘটনা সব সময় সত্য হতে পারে না। জীবনে ঘটনার মহত্ত্ব অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ঘটনার চেয়েও মহত্ত্বপূর্ণ জিনিস হল সেই ঘটনার প্রেরণাস্রোত। সেই প্রেরণাটুকুই হল যথার্থ সত্য। আমার এত সময় এই জন্যই লেগেছে যে ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত ঘটনার পিছনে যে সত্য লুকিয়ে রয়েছে তাকে যেন চিনতে পারি, যাতে ঘটনার উর্ধ্বে যে বাস্তব শরৎচন্দ্র রয়েছেন তার যথার্থ স্বরূপ পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে পারি। এ কাজ কি ভাবে কেমন করে সম্ভব হতে পেরেছে বলতে পারব না। হয়ত যাকে 'সিকস্থ সেন্স' বলে তা আমায় সাহায্য করেছে।

শরৎচন্দ্রের সামান্য সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবার সঙ্গেই আমি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা করেছি, সেই সব জায়গায় গিয়েছি যেখানে তাঁর উপন্যাসের পাত্ররা থাকত। সেই পরিবেশ ও আবহাওয়ায় নিজেকে একাত্ম করার চেষ্টা করেছি, যেখানে ছিল তারা জীবন্ত ও সজীব।

হয়ত এই প্রচেষ্টার ফলেই আমি তাঁর এমন একটা ছবি আঁকতে যৎকিঞ্চিৎ সফল হয়েছি, এনাটেমির দৃষ্টিতে হয়ত সঠিক নাও হতে পারে কিন্তু তাতে যে অন্তর্নিহিত চেতন-তত্ত্ব থাকে তা বুঝতে নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে।

শরৎবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে সমাজে যে ভ্রান্তধারণা তৈরী হয়েছে তার আলোচনা করা অসঙ্গত নয়। সাহিত্যিকের চরিত্র সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা রকমেরই হয়। আর শরৎবাবুতো শৈশব থেকে অভাব ও অপমানের সেই পরিবেশে জীবন কাটিয়েছেন যে অবস্থায় হয় লোকে বিদ্রোহ করে, নয় আত্মহত্যা। তাঁর অন্তরে যে সাহিত্যিক লুকিয়ে ছিল সে প্রথম পথটিই বেছে নেওয়ার প্রেরণা দেয়। তাই তৎকালীন সমাজের কঠোর বিধি-নিষেধের

পরোয়া তিনি করেননি। সদাচারের প্রচলিত মানদণ্ডে আঘাত করে তিনি সেই কাজই করেছিলেন যা ছিল যথাস্থিতিবাদী মোড়লদের অকরণীয়। এ অবস্থায় তিনি চরিত্রহীন আখ্যা না পেলেই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হত।

সাহিত্যে তিনি বেশ্যা ও কুলটাদের উচ্চস্থান দিয়ে তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধের সামনে বারবার প্রশ্ন চিহ্ন রেখেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন সতীত্বই নারীত্ব নয়, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও কোথাও তিনি উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি এই কথাই বলেছেন—আমি আমার লেখায় মানুষকে অপমান করতে পারব না। পুরুষ হোক বা নারী হোক পড়ে গেলে উঠে দাঁড়াবার পথ সবার জন্য খোলা থাকা উচিত।

মন জয় করায় বিশ্বাসী শরৎ এ দেখতে চাইতেন না যে জয়ী নীচজাতীয় ও বিজাতীয় কিনা, বিদেশী ও বিধর্মী কিনা, কুপথগামী অথবা পতিত। মন জয় করার মত বিরাট কাজ যে করতে পারে সে কখনও কুপথগামী হতে পারে না। আর যে বাস্তব জীবনকে দেখতে ও জানতে চায় সে শুচি অশুচির গোলকধাঁধায় পড়ে না। এই অভিজ্ঞতার বলেই গোর্কি, টলস্টয় ও শেক্সপীয়র শুচিগ্রস্ত হননি। তাই শরৎবাবু ও তথাকথিত নিচুশ্রেণীর লোকেদের ও পতিতদের মাঝে গিয়েছিলেন ও সব সংস্কারের উর্ধ্বে চিরদিন চিরব্রাত্য হয়ে কাটিয়ে দিলেন। ভদ্র সমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা তিনি কল্পনাতেও আনেননি।

মদ তিনি খেয়েছেন ঠিকই, তবে ছেড়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু একটা খালি মদের বোতল এমন একটা জায়গায় রাখতেন যাতে আসা যাওয়ার পথে লোকের চোখে পড়ে। আফিং খাওয়ার প্রদর্শনীর মওকা তিনি কখন ছাড়তেন না। কুকুরও এমন একটা পুষেছিলেন যেটা দেখতে কদাকার ছিলই আচরণও ছিল তার দারুণ অভদ্র। কিন্তু কুকুরটিকে তিনি এতই ভালবাসতেন যেন ওটি তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান। ভদ্রসমাজকে অপমান করে তিনি আমোদ পেতেন।

নারীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে না জানি কতই না মনগড়া কথা ছড়িয়ে রয়েছে। শরৎ যোগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, ছিলেন না কুপথগামী কামুক পুরুষ। তিনি ছিলেন যে কোন শিল্পীর মতই রোমান্টিক। যখন আত্মীয়সমাজ এমন কি বন্ধুবান্ধবদের দিক হতে তাঁর জন্য দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল তখন তিনি এমন এক বস্তিতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন যে বস্তির দরজা ভদ্রলোকেদের

জন্য দিনের আলোয় খোলা থাকেনা। সমাজের সব শ্রেণীর নারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহজ ও আত্মীয়তায় ভরা ছিল। প্রসিদ্ধির স্বর্ণযুগেও তাদের কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে পেছপা হননি। নিজের সাহিত্যে অত্যন্ত সহজভাবেই তাদের তিনি মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন, তাই তারাও তাঁকে অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা করত, অতি সহজেই তাঁর প্রতি আকর্ষণ বোধ করত। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিতে তারা মুগ্ধ হয়ে যেত তাঁর বিচার ধারার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারত। এই কারণেই দুর্নীতি প্রচারক হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি চরমে গিয়ে পৌছল। কয়লার থেকেও কালো প্রমাণ করার জন্য না জানি কতই না মনগড়া কাহিনী প্রচলিত হয়ে পড়ল। আশ্চর্যের কথা এই যে এই রকম মনগড়া গল্পের প্রচলনে তাঁর নিজের অবদানও কিছু কম ছিল না। সুযোগ পেলেই পরস্পর বিরোধী কথা বলার মওকা তিনি ছাড়তেন না। এক বন্ধুকে তিনি বলেছিলেন, নারীজাতির সম্বন্ধে আমি কোনদিনই উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম না এখনও নই। আবার অন্যদিকে আর এক বন্ধুকে এ কথাও লিখতে পারতেন যে দেড় বছর অবধি একটি রজক কন্যার প্রেমে মগ্ন ছিলেন। তাঁর সারা জীবনটাই তো এমনি অসঙ্গতিতে ভরা পরস্পরবিরোধী ঘটনার বুনানী। এ সবের যথার্থ অর্থ পরিস্থিতি বিশেষ ও পূর্বাপর সম্বন্ধ না জেনে বোঝা মুস্কিল। ঘটনা সন্দর্ভের বাইরে তার কোন অর্থ নেই আবার পরিস্থিতিকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠভূমি বোঝা দরকার। মনে হয় সমাজের প্রতি প্রতিশোধ দেওয়ার বাসনা সহজাত ভাবেই তাঁর অন্তরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। তা না হলে তাঁর চরিত্রে এমন কোন বিশেষ ব্যাপার ছিলনা যা কারোর পক্ষে লজ্জার কারণ হতে পারে। যদি তা হত তাহলে তিনি কেমন করে এ কথা বলতে পারতেন, 'আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি শুধু ছোট কাজ কখনো করিনি। যখন মরবো—ফরসা খাতা রেখে যাবো যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না।'

খুব কম লোকই জানে যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেছিলেন। দেশকে তিনি ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন দেশের মুক্তি আন্দোলনে যদি সাহিত্যিক যোগ না দেন তাহলে কারা দেবে? তাঁর জীবনের এই দিকটিকে আমি বিশেষ করে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সাধারণত যা হয়ে থাকে সেই রকমই বিতর্কিত ব্যাপার এখানেও রয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে জটিল প্রশ্ন হল বাংলা সাহিত্যে তাঁর কি

স্থান? কিছু লোকের ধারণা তিনি আদপেই সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল দুরাচারী বেশ্যাদের প্রবক্তা। অনেকে এ কথাও বলে থাকেন তিনি নতুন আর কি দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উচ্ছিষ্ট নিজের পাত্রে সাজিয়ে তুলে ধরেছেন শুধু বলার কায়দাটুকু নিজের। আবার কিছুলোক এমনও আছেন যাঁরা এটুকু মর্যাদাও তাঁকে দিতে চাননা বরং তাঁর বিপক্ষে ভাষাকে নষ্ট করার অভিযোগ করে থাকেন। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর মৃত্যুর পনেরো মাস আগে তাঁর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাতে এইসব ধারণাগুলি মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়।

শরৎচন্দ্র চিরদিনই রবীন্দ্রনাথকে নিজের গুরু বলে মানতেন। বারকয়েক মতভেদ হয়, তিক্ততার আবহাওয়া তৈরি হয় তবু শেষ পর্যন্ত দুজনেই পরস্পরের প্রতিভা সে ভাবেই বরণ ও গ্রহণ করেছিলেন যেমন ভাবে তাঁদের করা উচিত ছিল। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ব্যাসদেবের পর ভারতের সর্বোত্তম কবি ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথও বারংবার শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের বিশিষ্টতাকে অভিনন্দিত করেন। তাঁর ষষ্টিপূর্তির অনুষ্ঠানে[১] তিনি বলেছিলেন, 'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি-সমবায়ে গড়া নানা কক্ষপথে নানাবেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙ্গালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙ্গালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন। আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম, যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারই আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারও স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞান পত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। তিনি বাঙ্গালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টি সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে, কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন।'

---

১. ১১ অক্টোবর ১৯৩৬ সাল।

এরপর রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন, তিনি তাঁর বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের আগমনে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাবের প্লাবন দেখেছিলেন। ভগীরথের মত বঙ্কিমচন্দ্র যে নতুন সাহিত্য নিয়ে এলেন, তা বাংলাদেশের সবার অন্তর জয় করল। তারা তাঁকে নিজের বলে গ্রহণ করল। শুধু যে সে সময়কার তরুণ ও যুবকরাই গ্রহণ করল তা নয়, বঙ্কিম সাহিত্যের নতুন হাওয়া বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে পৌছল। প্রতিপক্ষ নিন্দা-প্রতিবাদ করতে ত্রুটি রাখেননি, কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য সে সব ডিঙ্গিয়ে নিজের আসন কায়েম করে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ কথাও বলেন যে তিনি তাঁর বৃদ্ধ বয়সে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে সেই একই ব্যাপার দেখলেন। শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য এমন একটা জিনিসের মোড় নিয়ে এসেছে যা বাংলাদেশের সবার অন্তর স্পর্শ করেছে। তাদের নিগূঢ়তম বেদনায় আঘাত করেছে।

কেউ একজন বলেছেন,—বাংলার নবজাগরণের বৈতালিক ছিলেন রামমোহন রায়, মধ্যাহ্নের চারণ বঙ্কিমচন্দ্র আর তার পরিণতি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই রবীন্দ্রযুগের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বঙ্কিম ছিলেন দেবতার উপাসক, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কিন্তু শরৎ মাটির ধূলিকণাকে মহিমামণ্ডিত করে গেছেন। তিনি সহজ বাংলার প্রয়োগ করে নিরঙ্কুশ মনের পরিচয় দিয়েছেন। এদেশে এমন সাহিত্যিক কমই দেখা যায় যাঁকে শুধু স্ব-জাতীয় সাহিত্যিকরাই নয় বরং রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, আইনবিদ, ধর্মতত্ত্বের জ্ঞাতা সবাই একজোটে সহজভাবে বরণ করেছেন। শরৎবাবু সেই বিরল সাহিত্যিকদের একজন যিনি সবার ভালবাসা পেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন তাঁকে চিনতে পেরেছিল। তিনি যেন সবার কণ্ঠেই বলেছিলেন, 'শ্রীশরৎচন্দ্রের লেখায় তাঁর বিশাল মেধা মানব ও বস্তুর সূক্ষ্ম ও যথার্থ পর্যবেক্ষণ এবং দুঃখ ও ব্যথায় সহানুভূতিতে ভরা হৃদয়ের অমিত ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি এত বেশী সংবেদনশীল যে এ সংসারে শান্তি তিনি পেতে পারতেন না। তাঁর দৃষ্টিও তেমনি ধারাল, তাঁর মন বড় নির্মল, তাঁর প্রাণিক প্রকৃতি বড়ই উদাত্ত।'

নবযুগের বার্তা বঙ্কিমচন্দ্র যে দেননি তা নয়। কিন্তু মূলত তিনি সংস্কারক শিল্পী। সাধারণ ও সহজ মানুষের উর্ধ্বে তিনি আদর্শ মহৎ মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপরাধীকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছেন—পরম্পরাকে বিশুদ্ধ মনে করে পাপকে তিনি ঘৃণা করতেন। পাপের প্রচার শরৎচন্দ্রও করেননি,

ঘৃণা করেননি পরম্পরাকে, কিন্তু মানুষকে তিনি দেবতা নয় শুধু মানুষরূপেই ভালবাসতেন। কোন শাস্ত্র শ্লোক মন্ত্র তন্ত্র মানুষের চেয়ে বড় নয়। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা বিশেষত্ব নিয়েও এই পৃথিবীর মাটিতে তৈরি রক্ত মাংসের পুতুল। ভয়ঙ্কর ভাবপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও বিপরীত চিত্তবৃত্তির আন্তরিক সংঘর্ষ যেমন শরৎ সাহিত্যে পাওয়া যায়, বঙ্কিম সাহিত্যে তা কিন্তু দুর্লভ।

যে নবযুগের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন শরৎচন্দ্র তাতে মাটির সোঁদা গন্ধ মাখিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যে ঘটনাগুলি ব্যাখ্যার ভারে চাপা পড়ে গিয়েছে। বিবরণের উপরে বিশ্লেষণের আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু শরতের কথা বলার ভঙ্গি সুমধুর সহজ ও সরল। কোথাও তিনি নিজেকে জীবন থেকে আলাদা করেন নি। সে জীবন একই সঙ্গে ত্যাগে উজ্জ্বল ও স্বার্থে পীড়িত, অভিজ্ঞতায় ধীর, শাসন সংস্কারে ক্লিষ্ট। বুদ্ধি নয়, যুক্তি নয়, শুধু অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে দৈন্য-ও সংস্কার-পীড়িত বিধি-নিষেধ নির্যাতিত আমাদের বাস্তব জীবনকে আমাদের মনের একান্ত নিকটে এনে দিয়েছেন।

সংস্কৃত থেকে ছাড়পত্র পাওয়া লাস্যময়ী প্রবাহময়ী ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বঙ্কিমের ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ সহজ সরল করে তুলেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাকে আরও প্রাঞ্জল অন্তরস্পর্শী করে তুললেন। জীবনের তুচ্ছ সুখ দুঃখের কথা বোঝাবার ক্ষমতা ভাষায় এসে গিয়েছিল। শরৎ তাকে ব্যাপকতা ও গভীরতার সঙ্গে অদ্ভুত সরল করে পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব করে তুললেন। তাঁর ভাষায় এল বাইবেলের সরলতা, এমন সরলতা যা তাঁর জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি মিথ্যা 'আড়ম্বরের উর্ধ্বে অভিজ্ঞতার আগুনে সরল ও নিরভিমান শক্তির জোরে পূর্ণ অভিনব শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ মানবীয় ঘটনাগুলিকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে দেখতেন। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব নৈর্ব্যক্তিক, তাঁর গড়া চরিত্র বিচার ও আদর্শের মানবীয় সংস্করণ। তাঁর লক্ষ্য দেশাতীত কালাতীত মানবের প্রতি। এর মূল্য অনস্বীকার্য না হলেও মানুষের খিদে তাতে মেটে না। তিনি জীবনের বাস্তব সুখ দুঃখকে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু দুঃখাতীত মহাজীবনের বাণী তাঁর রচনায় মুখর। রবীন্দ্রনাথ যা কিছু দিয়েছেন শরৎ তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কবিগুরু যখন সেই সময়ের সামাজিক নিয়ম বর্জিত অনেক বিষয় যেমন, বিধবার

প্রেমাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক বলে চুপ করে রইলেন, শরৎ সেখানে আর একটু এগিয়ে সমাজের সামনে প্রশ্নের ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিলেন। প্রীতিহীন, ধর্মহীন, ক্ষমাহীন সমাজকে বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'তোমার দ্বারা মানবীয় কল্যাণ কিছু হয়েছে কি ?'

শরতের পাত্র পাত্রীরা অসাধারণ হলেও তাদের সমগোত্রীয় লোক সমাজে পাওয়া যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাদের কিছু অমিল নেই কারণ অলক্ষ্যে রয়েছেন তাদের স্রষ্টার অভিজ্ঞতার অসীম কোষ। তাঁর মৌলিকতা অস্বীকার করা অপচেষ্টা। যে প্রতিভার জোরে তিনি রবীন্দ্রযুগে বটগাছের তলায় শুধু যে নিজেরই স্থান রচনা করেছিলেন তা নয় বরং সমগ্র দেশকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন সে কি কম অভিনন্দন পাবার যোগ্য ? তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্র অবশ্যই সীমিত, কিন্তু অপূর্ব প্রেমের ব্যাপারে তিনি অদ্ভুত সৃজনাত্মক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রতি চরিত্রহীনতার অভিযোগ করা হয় কিন্তু সেই চরিত্র চিত্রণে অশ্লীলতা খুঁজলেও পাওয়া যায়না। যা পাওয়া যায় তা হল সংযম, এই সংযমই শরতের বৈশিষ্ট্য। এই যে বিশেষত্ব তা আপনাতে আপনি অদ্বিতীয়। শ্রীইলাচন্দ্র যোশীর কথায়, 'তাঁর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক উচ্চতার ব্যাপকতা ছিল না আর না ছিল অতলস্পর্শী রহস্যানুভূতির সেই নিগূঢ় নিবিড়তা। কিন্তু এমন একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব ছিল যা সহজে কেউ পায়না। জীবনকে সরল সুস্পষ্ট বুঝদারের চোখ দিয়ে দেখে তার সার্থকতায় সহজেই ডুব দিয়ে, কোন জটিল বৌদ্ধিক চেষ্টা ছাড়াই তার সত্যিকারের রূপকে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়া ও সেই রূপের চিত্রণ কোন কৃত্রিম কাব্যাত্মক কৌশলে নয় শুধু নিজের সহজ অন্তরানুভূতির সাহায্যে করে তার ভিতরে লুকোন মর্মস্পর্শী ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে তোলা। এই যে এতবড় দান তিনি পেয়েছিলেন যা অনেক বড় বড় সাহিত্যিকদেরও সুলভ হয় নি।'

অনুভূতির মর্মস্পর্শিতা ও প্রাণের আবেগ এই দুটি গুণের যুগ্ম যোগফল ছিল তাঁর করায়ত্ব।

সমতা ও বৈষম্যের আরও অনেক বিন্দু খোঁজা যেতে পারে কিন্তু যথার্থতা এইটুকুই যে বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ আপন আপন ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বকীয়তায় অপ্রতিম ও অনিবার্য। পরম্পরার সূত্রানুযায়ী পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেক ভাবীকালের মত শরৎচন্দ্রও নিজের পূর্বসূরীদের কাছে ঋণী। রবীন্দ্রনাথের

তো তিনি পরম শিষ্যই—রবীন্দ্রনাথ না থাকলে শরৎও হতেন না। আর শরৎ আছেন তাই 'আওয়ারা মসীহা'ও (ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ) আছেন। এ শুধু আমারই পরিশ্রমের পরিণাম হতে পারে না; না জানি কত লোকেরই বিচার সৌরভ ও স্নেহস্পর্শ একে জীবনদায়িনী শক্তি জুগিয়েছে। পরিশিষ্টে তাঁদের শুধু নামটুকুরই উল্লেখ আছে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না, প্রেমের অর্ঘটুকুই দেওয়া যেতে পারে।

তাঁর প্রথম জীবনকে বোঝার জন্য সেই সময়ের অনেক ব্যক্তি ছাড়া সম্পর্কে তাঁর মামা ও বন্ধু শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। আমি যা লিখেছি সে সবই প্রায় তাঁরই। আমি শুধু এক গবেষক। ঠিক এই রকমই তাঁর বর্মা প্রবাসের কাহিনী জানতে আমি যার কাছে সবার চেয়ে বেশী ঋণী তিনি হলেন যোগেন্দ্রনাথ সরকার। গিরিন্দ্রনাথ ও যতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের অবদানও কিছু কম নয়। এঁদের লেখাকে ভিত্তি করে আমি আমার প্রথম দু খণ্ডের ইমারত খাড়া করেছি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বেশী সামগ্রী আমি শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের বই থেকে গ্রহণ করেছি।

এই রকমভাবে এই বইটির সামগ্রী সংগ্রহের তিনটি প্রমুখ স্রোত রয়েছে। প্রথম—সেই সব ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কোন না কোন ভাবে যাঁদের সঙ্গে শরৎবাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত তাঁর সমসাময়িক বন্ধুদের স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধাদি থেকে এবং তৃতীয়ত তাঁর আপন রচনায় ইতস্তত এলোমেলোভাবে ছড়ানো সেই সব জায়গা ও প্রসঙ্গ যার সঙ্গে তাঁর জীবনের সোজা যোগাযোগ ছিল। এত অভিজ্ঞতার পর তাঁকে খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

আমি স্বীকার করছি বইটিকে আগাগোড়া প্রামাণ্য করবার জন্য সব বিবরণী যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ঋণী সুপরিচিত পর্যটক স্বনামধন্য উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি অত্যন্ত সহজে আমায় আপনার করে নিয়ে শরৎবাবুর যাবতীয় জিনিস, যা তাঁর কাছে সুরক্ষিত রয়েছে আমাকে আমার কাজের জন্য অনায়াসে তা দিয়েছেন। তাঁর স্নেহের প্রতিদানের কল্পনা করাও তাঁর মহত্বকে ছোট করা হয়। এই রকমই গঙ্গোত্রী নিবাসী সুপরিচিত পর্যটক ও ফটোগ্রাফার স্বামী সুন্দরানন্দ আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অনেক ফটো যোগাড় করে দিয়েছেন। সেজন্য সন্ন্যাসীকে কি আর ধন্যবাদ জানাব,

তাঁকে আমি আমার প্রণতি জানাই।

এও কি অদ্ভুত যোগাযোগ যে দুজন বিশেষভাবে আমার প্রতি দয়ালু তাঁরা দুজনেই পর্যটক। শরৎচন্দ্রের জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তো ঐশ্বর্য-শালী পর্যটনের (মহিমান্বিত উচ্ছৃঙ্খলতার) কাহিনী।

অনেক কিছুই এমন বলে ফেলেছি যা বলা হয়ত আমার উচিত হয়নি। কিন্তু নিজের প্রক্রিয়াকে স্পষ্ট করতে এটুকু দরকার ছিল। তবু যদি কোনরকম ধৃষ্টতা আমার দ্বারা হয়ে থাকে সুধীজন যেন স্বাভাবিক উদারতায় আমায় ক্ষমা করেন।

পরিশেষে আমি স্বর্গত শ্রীনাথুরাম প্রেমীকে প্রণাম জানাই যাঁর জন্যে 'আওয়ারা মসীহা'র (ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ) সৃজন সম্ভবপর হয়েছে। আমি দুঃখিত যে বইখানি শেষ হবার আগেই তাঁকে চলে যেতে হল, কিন্তু এ কথা ভেবে মনে সান্ত্বনা পাই যে অন্তত তাঁর একান্ত ইচ্ছেটুকু আমি পূর্ণ করতে পেরেছি। তাঁরই পুণ্য স্মৃতিতে আমার এই যৎকিঞ্চিৎ প্রয়াস সমর্পণ করলাম।

৮১৮ — বিষ্ণু প্রভাকর
আজমেরী গেট
দিল্লি—১১০০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ প্রায় কুড়ি মাসের মধ্যে শেষ—এ ঘটনা শরৎচন্দ্রের প্রতি হিন্দীভাষী পাঠকের আস্থারই পরিচায়ক, কেননা আজ এই আক্রার যুগে পঁয়তাল্লিশ টাকার একটা বিশেষ মূল্য আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ কিছু অদল-বদল করা হয়নি। তবে ছাপা ও মুদ্রণ সংক্রান্ত যে সব ভুল অজান্তে রয়ে গিয়েছিল তা ঠিক করে দিয়েছি এবং কোথাও কোথাও কোন উদ্ধৃতি ও কথা বাদ দিয়েছি বা তার কলেবর খাটো করেছি। শরৎচন্দ্রের 'মহাত্মাজী' নামক প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় এ ভাবে তৃতীয় খণ্ডের বোঝা কিছুটা হাল্কা হয়েছে।

এটা শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকীর বছর। তাঁর জীবন সম্বন্ধে নতুন তথ্য

প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা আশা করা যেতে পারে। তাই সংরণস্কটি ছাপতে যাওয়া পর্যন্ত এই বইটিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোন বিশেষ ব্যাপার আমার চোখে পড়েনি। তবে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত গুজরাতি ভাষায় সর্বপ্রথম সম্ভবতঃ ১৯২৫ সালে শ্রীমহাদেব দেশাই মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি লেখা, 'বিরাজ বউ' 'বিন্দুর ছেলে' 'রামের সুমতি' ও 'মেজদিদি' অনুবাদ করেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর সঙ্গীত রচনার কথা। এই বইটিতে তাঁর মিষ্ট কণ্ঠের আলোচনা বিশদভাবে করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বরচিত কোন গান আছে কি না সে সম্বন্ধে লেখকের কোন প্রামাণিক ধারণা ছিল না। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'সুর-পিয়াসী শরৎচন্দ্র' (দিগন্ত, দিল্লী, ডিসেম্বর ১৯৭৫) প্রবন্ধে এ দাবি জানিয়েছেন যে 'ষোড়শী' নাটকের এই গানটি শরতের নিজের লেখা—

তোর পাবার সময় ছিল যখন
ওরে অবোধ মন,
মরণ খেলায় নেশায় মেতে রইলি অচেতন।
ওরে অবোধ মন।
তখন ছিল মণি, ছিল মাণিক
পথের ধারে,
এখন ডুবল তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।
আজ মিথ্যে যে তোর খোঁজাখুঁজি
মিথ্যে চোখের জল
তারে কোথায় পাবি বল?
তোর অতল তলে তলিয়ে গেল
শেষ সাধনার ধন,
ওরে অবোধ মন।

হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রসঙ্গ নিয়ে আবার একবার আলোড়ন উঠেছে, কিন্তু উইলে যখন তিনি স্ত্রীর স্থান পেয়েছেন তখন এ-ধরণের বিবাদ অর্থহীন।

বিপ্লবীদের তিনি অবাধে অর্থ সাহায্য করতেন, সে সম্বন্ধে আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

'অভিমান' বইখানি পড়বারপর কোনও এক যুবক তাঁকে মারতে পর্যন্ত যান। শ্রী গোপালচন্দ্র রায়ের অনুমান সে যুবকটি নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম ছিলেন কারণ 'অভিমান' বইটিতে এক বিবাহিতা মহিলা স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করে। শরৎচন্দ্র ইটালীন অবলম্বনে বইখানি লিখেছিলেন তাতেও এই ধরনের কাহিনী আছে।

আরও অনেক তথ্য প্রকাশ হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলতে শ্রীমতী নিরুপমা দেবী তাঁকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন যে বিধবা চরিত্র নিয়ে যেন আর আলোচনা না করেন। শরৎচন্দ্র কথা দেন, তাঁর মনে আঘাত দেয় এমন কোন কিছু তিনি কখনও লিখবেন না।

আর একটি কথার উল্লেখ করলে অনুচিৎ হয়ত হবেনা। আমার সমালোচক 'বন্ধুরাও 'আওয়ারা মসীহা'র যেমন অভ্যর্থনা করেছেন তেমন কতগুলি ত্রুটির ব্যাপারে পরামর্শও দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ মনে সে বিষয়ে যা করনীয় করেছি যা করিনি তা কোন জিদের বশে নয় বরং আমার অক্ষমতার দরুণ হয়েছে। প্রামাণিকতার অভাব তার মধ্যে হল সবচেয়ে বড় কারণ। কোথাও কোথাও মতভেদ হয়েছে—যেটা খুবই স্বাভাবিক। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে হয়ত আর একটু কুয়াশা কেটে যাবে। তবুও এ কথা জোর দিয়ে বলতে চাই যে মানুষ শরৎচন্দ্র অথবা সাহিত্যিক শরৎকে প্রভাবিত করছে এমন কোন তথ্য এখনও পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

'আওয়ারা মসীহা' লেখার সময়ে কত রকমের অসুবিধে ভোগ করেছি তার খানিকটা আভাস আমি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছি, কিন্তু মনে হয় তা যথেষ্ট নয়। কারণ তাতে আমার সমালোচক ও পাঠক সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সব বিষয়ের আলোচনা করা এখনও সম্ভব নয় কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—শরৎচন্দ্রের জীবনক্রম এতই জট পাকানো এতই বিশৃঙ্খল যে ক্রমানুসার যথাযথ ভাবে সাজান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কোন ঘটনাটা করে ঘটেছে, কেমন করে ঘটেছে, কবে কোথায় ছিলেন, কতদিন ছিলেন, কোন ভাষণটি কবে দেন, ঠিক কি বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে সত্যিকারের কোনো লেখাজোখা পাওয়া যায়না। যা পাওয়া যায় তা একান্তভাবেই বিশৃঙ্খল। যে খোঁজে আমি বছরের পর বছর দিশাহীন হয়ে

ঘুরে বেড়িয়েছি, জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার দেখেছি, স্কুল কলেজের রেজিস্টার হাতড়ে বেড়িয়েছি, পুরোন চিঠিপত্রের গভীরে ডুবে তবেই একটা রূপ খাড়া করতে পেরেছি।

ভাগলপুর থেকে কবে তিনি পালিয়েছিলেন, তার কতকটা সঠিক খোঁজ তখন পাওয়া গেল যখন ভাগলপুরেই রচিত তাঁর হাতে লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯০১ সালের জুলাই মাসের লেখা দেখলাম। ডিসেম্বর ১৯০২ এর শেষ দিকে তিনি বড় বোনের শ্বশুর বাড়ি গোবিন্দপুর থেকে গিরিন মামাকে যে চিঠিখানি লিখে ছিলেন তা আমি দিল্লিতেই গিরীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর পুত্র শ্রীঅমলকুমার গাঙ্গুলীর সৌজন্যে ১৯৭৩ সালে পেয়েছিলাম। এই চিঠি-খানি পাবার পর অনেকগুলি দিন ও তিথি আপনা হতে সঠিক বার হয়ে আসে। বর্মা থেকে তিনি কবে ফিরে এসেছিলেন, তার দিনতিথিও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে স্থির করা হয়েছে। তা না হলে একজন লেখক সে দিনটির কয়েকদিন বাদে রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা লিখেছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রায় সব জীবনীকারই লিখেছেন যে তিনি ডিসেম্বর ১৮৯৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কিন্তু এ তথ্যকে আমি অস্বীকার করছি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে আমি দেখেছি যে পরীক্ষা সোমবার ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪ থেকে শুরু হয়েছিল এবং খুব দেরী হলেও ১৮৯৪ এর এপ্রিল মাসে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়ে থাকবে। কিন্তু ক্যালেণ্ডারে তা ডিসেম্বর মাসেই বের হয়। এর উপর নির্ভর করে সবাই মেনে নেন যে তিনি ডিসেম্বর ১৮৯৪ এ ম্যাট্রিক পাশ করেন। যদি তাই হয় তাহলে তিনি সেই বছরেই কি ভাবে কলেজে ভর্ত্তি হলেন ?

বাঙ্গালীরা অবশ্যই বঙ্গাব্দের প্রয়োগ করে থাকেন। আমার পক্ষে সেটাও একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সেই তিথিগুলিকে আমি কি ভাবে খ্রীষ্টাব্দে বসাবো। পুরোন ক্যালেণ্ডারের খোঁজে অনেক বন্ধু ও লাইব্রেরীর শরনাপন্ন হতে হয় কারণ দিন ও তিথির নিজস্ব একটি বিশিষ্টতা আছে। (যাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁরা এটা বিশেষ ভাবে মানেন)

এভাবে দেখলে হয়ত অসঙ্গতির অবধি নেই। যদিও এইসব অসঙ্গতি মানুষ শরৎচন্দ্রকে প্রভাবিত করেনা। তিনি কবে কবে কোথায় ছিলেন, কবে কোথায় গিয়েছিলেন এ সবের কোনই মাহাত্ম নেই কিন্তু জীবনক্রমকে বুঝতে হলে এগুলির প্রয়োজন অস্বীকার করা যেতে পারেনা।

আমি আমার ভূমিকায় 'সিক্সথ সেন্স' এর কথা বলছি কিন্তু তা যতটা ভ্রান্ত ও অভ্রান্তের উর্দ্ধে বাস্তবিক· শরৎকে চেনা সম্বন্ধে সত্যি এতটা কিন্তু ঘটনার প্রামাণিকতার বিষয়ে নয়।

'আওয়ারা মসীহা' নামটি নিয়েও যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। এমন এমন অর্থ বার করা হয়েছে যা আমার কল্পনাতেও আসেনি। এই নামের মাধ্যমে আমি তো এটুকুই বলতে চেয়েছি যে কি ভাবে একটি ছন্নছাড়া ছেলে শেষপর্যন্ত নিপীড়িত মানবতার ত্রাণকর্তা হতে পেরেছিলেন! আমি আনন্দিত যে আমার বেশীর ভাগ বন্ধুরাই এই নামটিকে ভালবেসে মেনেছেন।

পরিশেষে আমি আর একটি কথা স্পষ্ট করতে চাই। 'আওয়ারা মসীহা'তে বর্ণিত কোন ঘটনা সম্বন্ধে আমি কল্পনার সাহায্য নিইনি। যতটা এবং যেরকম খোঁজ আমি পেয়েছি ততটাই লিখেছি। ফার্স্ট পার্সন হিসেবে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে আমি যা কিছু বলিয়েছি তা তাঁর সেইসব বন্ধুদের স্মৃতিকথা থেকে নিয়েছি যাঁরা সেই সব ঘটনা ও কথার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। যথাসম্ভব তাঁদেরই· কথার প্রয়োগ করেছি। প্রামাণিকতার দিক দিয়ে কয়েকটি জায়গায় তাঁদেরই বর্ণিত লেখার সাহায্যও নিয়েছি কিন্তু তা নিতান্তই কম। আমি যদি কোথাও স্বাধীনতা নিয়েও থাকি তো এতটুকুই নিয়েছি যতটুকু একজন অনুবাদক নিতে পারে।

ঠিক মনের মতটি কখনও হয় না তবু বন্ধুরা বিশেষতঃ বাঙ্গালী বন্ধুরা আমার এই তুচ্ছ চেষ্টাকে যে ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তাতে আমার উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতায় নত রইলাম। আর শরৎচন্দ্রের প্রতি একবার আবার কবি নজরুলের কথায় নত মস্তকে বলব:

অবমাননার অতল গহ্বরে এ মানুষ ছিল লুকায়ে
শরৎ চাঁদের জ্যোৎস্না তাদের দিল রাজপথ দেখায়ে।

বিষ্ণু প্রভাকর

অনুবাদিকার কথা

'আওয়ারা মসীহা' পড়েছ ?

যেখানেই গেছি এই একই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। অধীর আগ্রহে বইখানি পড়তে শুরু করি। 'আওয়ারা মসীহা'য় (ছন্নছাড়া মহাপ্রাণে) শরৎচন্দ্রকে স্বরূপে জানবার এই নতুন সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত হই। লেখক অত্যন্ত যত্ন ও অনুসন্ধানের পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের বহু বিতর্কিত সংশয়াচ্ছন্ন জীবনকে ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলা ভাষায় এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাবে বেদনা পেয়েছি। পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েছে এই শরৎকে সবার মনের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে ? চকিতে মনে হল, বইখানি যদি বাংলায় অনুবাদ করি কেমন হয় ? আমাদের জনমনের একক দাবিদার শরৎকে পুরোপুরি জানতে কে না আগ্রহী ? এই বিশ্বাসই নিয়ত আমাকে 'আওয়ারা মসীহা' বইটিকে বাংলায় অনুবাদের প্রেরণা দিয়েছে।

বইখানি তন্ময় হয়ে পড়েছি আর ভেবেছি 'আওয়ারা মসীহা' শরতের সার্থক নামকরণ। আওয়ারা অর্থাৎ ছন্নছাড়া আর মসীহা মানে ত্রাণকর্তা বা দেবদূত। লেখকের চোদ্দ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম সাধনা ও ভালবাসার ফল আমায় উৎসাহ দিয়েছে। কি অনুরাগে একজন মসীজীবী লেখক ভিন্ন ভাষার এক অদেখা রহস্যাবৃত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে এত মমতার সাথে পাঠকদের কাছে তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তায় তুলে ধরেছেন তা কি শুধু এই কারণেই যে লেখকের কোন জাত নেই। তাঁদের মনের মৌন ভাবা সে একই ভিন্ন নয়।

কী সেই অনুরাগ যা লেখকের অন্তর্মনকে এভাবে আলোড়িত করেছিল এবং যা তাঁকে বাংলা ভাষাই শুধু শিখতে বাধ্য করেনি, শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যখন যেটুকু পরিবেশ ও ঘটনার খোঁজ পেয়েছেন সেখানেই আকুল হয়ে ছুটে গেছেন আর এক ছন্নছাড়া মহাপ্রাণের মতই।

সাহিত্যিককে জানতে হলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য পড়তে হয়। সাহিত্যিকের ব্যক্তি মনের সাথে তাঁর জীবনী লেখকের সাক্ষাৎকার জরুরী নয়। শ্রীকালিদাস রায়কে একবার শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—আমার ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখক অপরিচয়ের ব্যবধান ভেঙ্গে আমার লেখা থেকে আমায় ঠিকই খুঁজে নেবে।

বিষ্ণু প্রভাকর কি সেই অন্বেষক নন?

বইটি পড়ার পর চির রহস্যাতুরের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে শরৎচন্দ্রের প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ব্যথায় আপনা থেকে ভিজে ওঠে। এই জীবনীটি বাস্তবিকই এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সত্যান্বেষীর অপূর্ব নিষ্ঠার ফল যা তাঁর স্বচ্ছ সাবলীল লেখার ভঙ্গীতে আরও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

লেখকের বিস্তারিত মনোগ্রাহী ভূমিকা সত্বেও কেবল একটি কথা না বলে পারছিনা যে লেখক বড় সুন্দরভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনকে তিনটি ভাগে প্রকাশ করেছেন। 'দিশাহারা, 'দিশান্বেষণ' ও 'দিশান্ত'। প্রথম দুটি অধ্যায়ে ছন্নছাড়া এক ছেলে 'ভবিষ্যৎ সার্থকতার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও সমাজের আর পাঁচজনের মতোই লেখকের কাছ থেকেও সাধারণ স্বাভাবিক ব্যবহার পেয়েছে। অর্থাৎ শরৎ তখন—'সে'।

কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ে বর্মা থেকে পাকাপাকি ভাবে ফিরে আসার পর যখন বাংলার সাহিত্যাকাশে তিনি পরিব্যাপ্ত তখন আর শরৎ 'সে' নয় তিনি—অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখকের এ মনোবিশ্লেষণ গুণগ্রাহী পাঠকের অবশ্য প্রশংসাহ্।

এই অধ্যায়ে সাহিত্যিক শরচৎন্দ্রের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি ফটো ও গিরীন মামার (গিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়) চিঠির ফটোস্টাট কপি বইটির সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে। শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার অনাবিষ্কৃত একটা দিকের পরিচয় এই বইখানিতে পাই। অন্য ভাষার সাহিত্যিকদের সাথে তার নিবিড় যোগাযোগ তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের লেখা মহাত্মাজী প্রবন্ধটি বাংলা সংস্করণে সংযোজনা করা হয়নি কারণ উল্লেখযোগ্য এই প্রবন্ধটি বাংলায় আজও দুর্লভ হয়ে ওঠেনি।

যে উৎসাহ নিয়ে প্রথমে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলাম, বারবার বাধা পেয়ে তা ব্যাহত হয়েছে। লেখক নিজের বক্তব্যে যে অসুবিধার উল্লেখ করেছেন অনুরূপ অসুবিধা আমাকেও ভোগ করতে হয়েছে। লেখকের মতোই শরৎ সম্পর্কে

যাবতীয় বই, পত্র-পত্রিকা আমাকেও দেখতে হয়েছে। যে-সব জায়গা থেকে তিনি প্রতিটি ঘটনা ও উদ্ধৃতি নিয়েছেন সেই মূল লেখাগুলি খুঁজে খুঁজে আমায় পড়তে হয়েছে, মেলাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে দারুণ হতাশ হয়ে পড়েছি। হয়তো সামান্য দুটো লাইন, কিছু কথার জন্য নানান বইয়ের খোঁজ করতে হয়েছে নানান লাইব্রেরিতে। দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। তবুও ত্রুটিহীন কাজের যে আনন্দ, তা আমি পাইনি।

একভাষা থেকে অন্যভাষায় তর্জমার কাজ কখনই সহজ নয়। ভাষার গভীরে অবগাহন না করে কোন ফলপ্রসূ রচনা অসম্ভব। বিশেষতঃ এই বইখানি কল্পনাশ্রিত কোন উপন্যাস নয়। বইটি এমন একজন সাহিত্যিকের জীবন কাহিনী যিনি মানুষের মনে আজও চাপা পড়ে যাননি, যাঁর সমসাময়িক লেখক বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা আজও বিরল নয়, এমন অবস্থায় শুধুমাত্র অনুবাদের কথা ভাবা যায়না। বাংলা ছাড়া অন্য যে কোন ভাষায় বইখানি অনুবাদের ব্যাপারে এত অসুবিধার প্রশ্ন ওঠেনা কারণ মূল বইটি থেকেই সম্পূর্ণ সাহায্য সে পেয়ে যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় এর জন্যেই তা সম্ভব নয় কারণ শরৎচন্দ্র সার্বজনীন লেখক হলেও তাঁর সাহিত্য বাংলা ভাষায় সঞ্জীবিত ও তাঁর সম্পর্কে অধিকাংশ প্রামাণিক বইও বাংলাভাষায়। অন্যান্য ভাষায় সামগ্রী থাকলেও আপেক্ষিক ভাবে তা কম। এ কারণেই লেখকের দেওয়া প্রায় সম্পূর্ণ বইয়ের তালিকা অনুবাদিকাকেও দেখতে হয়েছে। লেখকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপির ছ'টি ফাইল আমি নিখুঁত ভাবে দেখেছি যার ফলে কীভাবে বইটি তিনি খাড়া করতে পেরেছেন তার হদিশ পেয়েছিলাম। কিন্তু আফসোসের কথা বইখানি লেখার সময় বহু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তিনি মূলভাষায় নোট করে রাখেননি প্রয়োজন মতো ভাষান্তর করে নিয়েছেন। তবে যেখানেই তিনি উচিৎ মনে করেছেন অবশ্যই সেখানে ঘটনা বই বা সাল তারিখের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেখানে শুধু কোন উদ্ধৃত অংশটুকু লিখেই বোঝাতে চেয়েছেন সেখানেই আমি ভীষণ মুশকিলে পড়েছি। আমারও দিশাহারা অবস্থাই হয়েছিল। কোথায় খুঁজি? কোন বইয়ে থাকতে পারে এমন চিন্তা আমায় অসংখ্যবার করতে হয়েছে। পাণ্ডুলিপি তৈরির বেশ অনেক দিন পর আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সাহায্য ও খোঁজ পাই। লেখার প্রারম্ভে তা পেলে আমার পরিশ্রম ও খাপছাড়া মেহনত লাঘব হত এবং বইখানি হয়তো আরও কিছুদিন আগে প্রকাশিত হতে পারত। 'দেশ' পত্রিকার শরৎ

শতবার্ষিকী সংখ্যা ও শরৎ সাহিত্য শতবার্ষিকী সংস্করণের পরিশিষ্টে আমি অনেক তথ্যের খোঁজ পাই। বেনারস কলকাতা যখন যেখান থেকে খোঁজ পেয়েছি তা সংগ্রহ করেছি ও লিখেছি। যা আমি পাইনি তা আমার কথায় বুঝিয়েছি। লুপ্ত সংস্করণ কোন বই বা পত্রিকা লাইব্রেরি ইত্যাদিতেও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে সেই সব জায়গায় খোঁজ নিতে হয়েছে যাঁদের কাছে মূল জিনিসটি সংরক্ষিত রয়েছে। স্বনামধন্য উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ ব্যাপারে আমায় আন্তরিক সাহায্য করেছেন তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমার এ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই শুনলাম সিন্ধী ভাষায় বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। গুজরাটী তেলেগু ও পাঞ্জাবি ভাষায় দ্রুত অনুবাদের কাজ চলছে। মারাঠী ও মলয়ালম ভাষাতেও অনুবাদের ব্যাপারে কথা বার্তা চলছে। হিন্দীতে দ্বিতীয় সংস্করণও সমাপ্তপ্রায়। বইটির জনপ্রিয়তা এখানেও বিবেচ্য। আমার কাজ অসম্পূর্ণ রইল ভেবে দুঃখ পেয়েছি। লেখক ও আমার মনে স্বাভাবিক ভাবেই এ ইচ্ছে ছিল যে, শরৎ শতবার্ষিকীতে বই-খানি প্রকাশিত হোক। তা যদি হত অবশ্যই আমি সবার চেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম কিন্তু কোন গবেষণামূলক কাজ তাড়াতাড়িতে করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনা। শুনেছিলাম আমি ছাড়াও কয়েকজন শরৎ অনুরাগী সুধী বই-খানির বাংলা অনুবাদে আগ্রহী। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে বই খানি অনূদিত বই না হয়ে মূল গ্রন্থ হিসাবে বাঙালী পাঠকের নিকট গ্রহণ যোগ্য হয়। শরৎচন্দ্রের জন্য সময় কোনদিনই পিছিয়ে থাকেনা, এই আমার বিশ্বাস। যাই হোক শেষ পর্যন্ত বইখানি যখন আমিই পাঠকদের হাতে তুলে দেবার সুযোগ পেলাম লেখককে মনের সবটুকু ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনি। তাঁর চোদ্দ বছরের সাধনাকে বছর দুয়েকে সঠিক রূপ দিতে গিয়ে খুব কি দেরি করে ফেলেছি?

লেখার প্রারম্ভে নানান অসুবিধার জন্যে মনের সে অনুরাগ আমি বজায় রাখতে পারিনি লিখে আর কী হবে ভেবে রাশ আলগা করে ঢিলে দিয়েছি। অনিবার্যভাবেই এড়ানো চলেনা এমন সব প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বেশ কিছুদিন হাত গুটিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু এ কাজে নিশ্চেষ্ট হয়ে যিনি আমায় থাকতে দেননি তিনি আমার স্বামী শ্রীওমপ্রকাশ কেজরিওয়াল। প্রতিদিন অনলসভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন—আজ কতটা লিখেছ? লিখিনি

শুনে চুপ করে গেলেও পরের দিন আবার সেই একই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের হাত থেকে অব্যাহতি পেলামনা। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে বইয়ের খোঁজে তিনি আমায় সাহায্য করেছেন। শেষের দিকে তাঁর আগ্রহ ও তাগিদের ভয়েই নয়, দুঃখ পাবেন ভেবেও তাড়াতাড়ি লেখা সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। আমি যখন বার বার নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েছি তখন তিনি বলেছেন এত বড় দায়িত্বের কাজে কোন পরিশ্রমকেই বাহুল্য মনে করতেই নেই। আজ যখন বই প্রকাশনের আয়োজন সম্পূর্ণ তখন মনে হচ্ছে এমন অকপট আনুকূল্য না পেলে লিখতে পারতাম না।

এই বইখানি অনুবাদের মূলে যিনি রয়েছেন তাঁকেও আমার শ্রদ্ধা জানাই। তিনি হলেন সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক আমাদের আপনার চেয়েও আপন শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ কেজরিওয়াল। এমন শরৎ অনুরাগী লোক আমি দেখিনি। তাঁরই আগ্রহে বিষ্ণু প্রভাকর নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অনুবাদের ভার নিশ্চিন্ত মনে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার বিরাট পাণ্ডুলিপি-খানি দেখে বলেছিলেন—কোন প্রকাশকের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ না করেও বইটি বাংলায় অনুবাদ করে যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছ তা ব্যর্থ হবার নয়। বাংলা বইখানি হাতে পেয়ে অবশ্যই তিনি খুশি হবেন, কিন্তু সে খুশির পরিমাণ আমার জানা নেই।

পাণ্ডুলিপি তৈরির পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশনের প্রশ্ন ওঠে। আমি বাংলার কোন প্রকাশককে জানিনা, কোথাও কোন পরিচয় নেই। এ ব্যাপারে সবার আগে উদ্যোগী হয়েছেন নিখিল ভারত মারওয়াড়ি সম্মেলনের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজ সেবী শ্রী ভঁওরমল সিংঘী। তাঁর সাথেও আমার পরিচয় গোবিন্দ প্রসাদজীর মাধ্যমে। বইটি তাড়াতাড়ি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রী সিংঘীর আগ্রহের সীমা ছিলনা। বেশ কিছু দিন হল শ্রী নিরঞ্জন হালদার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই বইখানি প্রকাশের কথা তোলেন। তখন অবাক হয়ে ভেবেছিলাম আমি তো তাঁকে চিনিনা। আমার মত প্রবাসীর এই প্রচেষ্টার খবর তিনি কেমন করে জানলেন? পরে জেনেছি এ কৃতিত্বও শ্রীসিংঘীর। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন হালদারের মাধ্যমে বই প্রকাশনের ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন। শ্রীসিংঘীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীনিরঞ্জন হালদারের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। বই প্রকাশন

সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের দায়িত্বে দেখেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরই মাধ্যমে আশা প্রকাশনীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়।

'আশা প্রকাশনী' আগ্রহ ও সততার সঙ্গে আমার এই প্রয়াসটুকুকে গ্রহণ করেছেন সেজন্যে তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমার সহোদরা তপশ্রী বন্দোপাধ্যায়ের কথা না বললে সবটুকু বলা হয় না। দিল্লীতে বাংলা টাইপের সুবিধা না থাকায় বেনারস থেকে এসে আমার লেখা ১৩০০ পৃষ্ঠার বিরাট পাণ্ডুলিপি অফুরান আগ্রহে সে তৈরি করে দেয়। নানান বই, পত্র-পত্রিকা থেকে সংশোধন ও সংযোজনার সূক্ষ্ম দায়িত্ব একটানা বিরামহীন ভাবে পালন করেছে। আমার পরিশ্রমকে সে সার্থকতায় পরিণত করেছে। চির স্নেহের ছোট বোনটির ঋণ আমি ভালবেসে স্বীকার করছি।

দিল্লীতে থেকে কলকাতার প্রেসে ছাপানো বইয়ের প্রুফ দেখে উঠতে পারিনি, তাই বইটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল। পরবর্তী সংস্করণে এই ভুলগুলি শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করব।

বাংলার বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের লেখা আমি হিন্দীভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছি। আজ হিন্দী ভাষার এক শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে বাঙালী পাঠকের হাতে পৌঁছে দিলাম। বাংলার শরৎকে বাংলার বাইরের ভালবাসার আঙ্গিনা থেকে বাংলার ঘরে আবার পাঠিয়ে দিলাম। আমার এ চেষ্টা কতখানি সার্থক হতে পেরেছে সে বিচারের ভার আজ আর আমার হাতে নেই।

প্রকাশকের কথা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবিষ্ণু প্রভাকরের লেখা শরৎচন্দ্রের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক জীবনী 'আওয়ারা মসীহা'র হিন্দী থেকে অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল।

নানা কারণে বইটি দু'টি খণ্ডে ছাপা হলো। দ্বিতীয় খণ্ডের ছাপার কাজও শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।

বইটি ছাপার কাজে শ্রীনিরঞ্জন হালদার ও শ্রীঅজয় গুপ্তের সহযোগিতার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি
শীলা ভট্টাচার্য

বিষয় সূচী

প্রথম পর্ব

দিশাহারা

দ্বিতীয় পর্ব

দিশান্বেষণ

চিত্রপরিচয়

সেদিন কোন কারণে অর্ধেক স্কুল হয়ে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। গাঙ্গুলীদের শরৎ বাড়ি ফিরেই সুরেন্দ্রকে বলল, 'চল পুরনো বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি।' সেবার খুব গরম পড়েছিল, ফলপাকুড়, ফুল, লতাপাতা সব শুকিয়ে গিয়েছিল, তবুও নিস্তব্ধতায় ঘেরা ছায়ার নীচে সময় কাটাতে বড় ভাল লাগত। কিন্তু এসব ছেড়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে একথা ভেবে মনটা কেমন ভার ভার লাগছিল শরতের, অথচ মনের কথা কাউকে বলতেও ইচ্ছে হত না।

সুরেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল। সম্পর্কে মামা অথচ বয়সে ছোট হওয়া সত্বেও দুজনের ভারি বন্ধুত্ব ছিল। বাগানে গিয়ে গাছ-পালার চারপাশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে সে যেন এদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছিল। হয়ত একথাও মনে হচ্ছিল, কি জানি আবার কখনও এখানে আসা হবে কি? হঠাৎই, যেমন তার স্বভাব, লাফ দিয়ে একটা গাছের ডালে চড়ে বসে গল্প আরম্ভ করে দিল। এ-গল্পের কোন আদি-অন্ত ছিল না। বিদায়ের দুঃখকে লুকোবার জন্যই শুধু কথার অবতারণা। বলল, 'তুই দুঃখ করিস না, মাঝে মাঝে তো আসবই—আবার দেখা হবে।'

'আসবি?'

'কেন আসব না। ভাগলপুর কি আমার কম ভাল লাগে নাকি? ঘাটের ভাঙা স্তূপের ওপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যা মজা! আর ওপারে ওই

ঝাউয়ের বন, ওকে কি ভোলা যায় ? আমায় ও ডাক দেবেই, আর আমিও ঠিক চলে আসব।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি এমন জায়গা এই ভাগলপুর, দেখিস আমি ঠিক আসব !'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ শরৎ বলে উঠল, 'গাছে চড়তে জানা বড্ড দরকারী। মনে কর কোন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিস, ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে এল। হিংস্র পশুর চিৎকার ভেসে আসছে, তখন যদি গাছে চড়তে না জানিস তো মহাবিপদ··· ।'

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'আর যদি পড়ে যাই ?'

শরৎ উত্তর দিল, 'পড়বি কেন রে ?' বলে তরতর করে গাছের মগডাল পর্যন্ত উঠে গিয়ে একটা কাপড় দিয়ে নিজের কোমরের সঙ্গে গাছের ডালটাকে কষে বেঁধে সটান শুয়ে পড়ে বলল, 'এমনিভাবে শুয়ে কিন্তু বেশ রাত কাটানো যায়।'

প্রায় তিন বছর হতে চলল শরৎ মামার বাড়িতেই আছে। এর আগে মার সঙ্গে বার কয়েক এসেছিল। প্রথম যেবার মার সঙ্গে আসে দাদু দিদিমা সোনা ও টাকা দিয়ে মুখ দেখেছিলেন। দাদামশায় কেদারনাথ কোমরে সোনার গোট পরিয়ে তবে কোলে তুলেছিলেন কারণ বংশে এ-পুরুষের এই তো প্রথম ছেলে। কিন্তু তিনবছর আগের সে-আসা তো সম্পূর্ণই আলাদা। শরতের বাবা যাযাবর প্রকৃতির স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। কোন জীবিকাতেই তিনি টিকে থাকতে পারেননি। কিন্তু সংসার তার প্রাপ্য চাইবেই। তাই চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছিত হয়ে তিনি কাজের চেষ্টায় হন্যে হয়ে বেড়াতে লাগলেন। চাকরি যদিও বা কখনও জুটত, তাঁর শিল্পী-মন দাসত্বের বাঁধনে বাঁধতে চাইত না। অতএব কিছুদিন কাজকর্ম করার পর হঠাৎই একদিন বড় সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে অথবা সেই অজুহাতে চাকরি ছেড়ে পড়াশুনো বা কবিতা রচনায় মেতে ওঠা—এই ছিল তাঁর স্বভাব। গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছবি-আঁকা একাধারে সব বিষয়েই তাঁর রুচি ছিল। সৌন্দর্যবোধও তাঁর কিছু কম ছিল না। নতুন নিবের সুন্দর কলম দিয়ে ভাল কাগজে মুক্তাক্ষরে লেখা শুরু করতেন। কিন্তু শুরু যত উল্লেখযোগ্য হত শেষ ঠিক ততই অর্থহীন হয়ে হয়ে পড়ত। অনিবার্য সমাপ্তিকে বোধ হয় তিনি কখনও স্বীকার করেননি। তাই মাঝপথে অসম্পূর্ণ লেখা ফেলে নতুন লেখা তাঁকে পেয়ে বসত। হয়ত তাঁর নিজস্ব বিরাট কোন এক আদর্শ ছিল নতুবা শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কোন লেখাই তিনি সম্পূর্ণ করেননি। একবার শিশুদের জন্য

ভারতবর্ষের মানচিত্র তৈরি করছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হয়, এই মানচিত্রে কি হিমালয়ের গরিমাকে যথাযথ ফোটাতে পারবেন? এই সংশয়ের দরুণ তিনি এই কাজ থেকে বিরত হন।

এইভাবেই মোতিলালের শিল্প-সাধনা ব্যর্থতার মধ্যে সার্থক হয়। সংসারের ভরণপোষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। শরতের মা ভুবনমোহিনী প্রথম প্রথম স্বামীকে বোঝাতেন, রাগ-ঝাঁঝও করতেন কিন্তু পরে বাধ্য হয়েই বাবা কেদারনাথের কাছে সবাইকে নিয়ে চলে আসেন। মোতিলাল ঘরজামাই হয়ে থাকতে এলেন।

২.

ভাগলপুরে আসার পর দুর্গাচরণ এম. ই স্কুলের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে শরৎকে ভর্তি করে দেওয়া হল। দাদামশায় স্কুলের কর্তাব্যক্তি ছিলেন, কাজেই ছাত্রের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কতদূর তা কেউ তেমন খোঁজ করেননি। বোধোদয় পর্যন্ত শরতের পড়া ছিল। এ স্কুলে তাকে 'সীতার বনবাস', 'চারুপাঠ' 'সদ্ভাব সদ্গুরু' আর প্রকাণ্ড ব্যাকরণ পড়তে হত, শুধু পড়াই নয় পণ্ডিতমশায়ের কাছে প্রতিদিনের পড়াও দিতে হত। অতএব অসঙ্কোচে একথা বলা যায় সাহিত্যের সঙ্গে শরতের প্রথম পরিচয় চোখের জলেই হয়েছিল। তাই মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে একথা সে ভাবতে পারেনি। কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারে ক্লাসে সে সবার পিছনে পড়ে আছে। এ গ্লানি তার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর ছিল, তাই খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশুনো আরম্ভ করে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অনেককে ডিঙিয়ে ভাল ছেলেদের মধ্যে গণ্য হল।

দাদামশায়রা, সব ভায়েরা একত্রেই ছিলেন। মামা-মাসীর সংখ্যাও ছিল অনেক। ছোট দাদামশাই অঘোরনাথের ছেলে মণীন্দ্র ছিল শরতের সহপাঠী।

দুজনকেই বাড়িতে পড়াবার জন্য অক্ষয় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়। অক্ষয় পণ্ডিতকে পণ্ডিত না বলে যমের সহোদর বললেও অত্যুক্তি হয় না। গুরুর যষ্টিতেই যে বিদ্যার নিবাস একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তাই মাঝে মাঝে তার সিংহনাদের সঙ্গে শিশুকণ্ঠের করুণ সুরও শোনা যেত।

পড়াশুনোর সময় দুষ্টুমিও কিছু কম হত না, শরৎ এখানেও অগ্রণী ছিল। সেদিন প্রদীপের আলোয় ছেলেরা সবাই পড়তে বসেছে। দালানে নেয়ারের খাটে দাদামশায় শুয়ে শুয়ে পড়া শুনছেন, বললেন, 'পুরনো পড়া কেন মুখস্থ করছ? নতুন পড়া নেই?'

'না।'

'কেন?'

'পণ্ডিত মশাই আসেননি, তাঁর অসুখ করেছে।'

তখুনি দাদামশাই চাকর মুশাইকে ডেকে বললেন—'লণ্ঠন জ্বালাও, পণ্ডিত মশাইয়ের জ্বর হয়েছে দেখতে যাব।'

তিনি শুধু স্কুলেরই কর্তাব্যক্তি ছিলেন না, সমাজপতিও ছিলেন। কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন আদর্শ। দাদা-মশাই বেরিয়ে যেতেই শরৎ বলে উঠল—

'ক্যাট ইজ আউট লেট মাউস প্লে।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমবেত কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

ডান্স লিট্‌ল বেবি ডান্স আপ হাই
নেভার মাইণ্ড বেবি মাদার ইজ নাই।
ক্রো এণ্ড কেপার, কেপার এণ্ড ক্রো—
দেয়ার লিটল বেবি, দেয়ার য়ু গো
আপ টু দি সিলিং, ডাউন টু দি গ্রাউণ্ড
ব্যাকওয়ার্ডস, এণ্ড ফরওয়ার্ডস রাউণ্ড এণ্ড রাউণ্ড
ডান্স লিটল বেবি, এণ্ড মাদার উইল সিং
মেরিলি মেরিলি ডিং ডিং ডিং।

একটি উদ্যমী ছেলে সঙ্গে সঙ্গে শেষের লাইনটির হিন্দী অনুবাদ করে ফেলল,

'খুশীমে খুশীমে তাক্ ধিনা ধিন।'

বর্ষা শেষের একটি দিনে কোথেকে একটা চামচিকে এসে বাচ্চাদের মাথার উপর ফরফর করে উড়ে বেড়াতে লাগল। ছোট মামা দেবী দাদামশায়ের

সঙ্গে শুয়ে পড়েছিল। অন্যরাই বা শুধু শুধু পড়বে কেন? চামচিকে দেখে মণি আর শরৎ উসখুস করতে লাগল, একটা লাঠি নিয়ে সেটাকে ধরতে ছুটল। সে এক এলাহি কাণ্ড। চামচিকে তো ফুরুৎ করে উড়ে পালাল কিন্তু লাঠির খোঁচায় প্রদীপ উল্টে নিভে তো গেলই, তেল পড়ে চাদরও নষ্ট হল। মণি আর শরৎ ঘটনাস্থল থেকে চুপচাপ কেটে পড়ল কিন্তু দাদামশায় ঘুম থেকে উঠে ডাকলেন, 'মুশাই, মুশাই।'

মুশাই ছুটে এসে বলল, 'আজ্ঞে।'

'আলো নিভে গেল কি করে?'

দেশলাই জেলে মুশাই দেখল মণি আর শরতের কোথাও চিহ্নমাত্র নেই শুধু দেবী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বলল—'মণি আর শরৎ খেতে গেছে, দেবী বাতি নিবিয়ে ফেলেছে।' এ অপরাধের কোন ক্ষমা ছিল না। কেদারনাথ দেবীকে কান ধরে তুলে মুশাইকে বললেন, 'একে আস্তাবলে বন্ধ করে রেখে এসো।'

পরদিন দেবীমামাকে খুশী করার জন্য বেশ ভালরকম ঘুষ দিতে হল। দেবীর উপর মা সরস্বতীর তেমন কৃপাদৃষ্টি ছিল না। শরতের বড়মামা ঠাকুর দাস ছোটদের পড়াশুনো দেখতেন। তিনি গাঙ্গুলী বংশের গোঁড়ামী ও কঠোরতার খাঁটি প্রতিনিধি ছিলেন। একদিন মোতিলাল বাড়ির সব ছোট ছেলেদের নিয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন হঠাৎ ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা। তাঁর চোখে ছোটদের এভাবে বেড়ানো অমার্জনীয় অপরাধ। তিনি তক্ষুনি তাদের পরীক্ষা নিতে তৎপর হলেন। মণি আর শরৎ কোনরকমে উৎরে গেল, কিন্তু দেবী জগন্নাথ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করল জগড়+নাথ।

এ অপরাধের শাস্তি বেত্রাঘাত কিংবা আস্তাবলে বন্ধ করে রাখা। শরৎ কিন্তু এসবে ভয় পেত না। সুযোগ পেলে স্কুলেও দুষ্টুমি করতে পেছ-পা হতো না। স্কুলের ঘড়িটি প্রায়ই ফাস্ট চলত। সময় মতো তাতে চাবি দেওয়া বা কাঁটা ঠিক করা অক্ষয় পণ্ডিতের কাজ ছিল। কিন্তু তাঁর এমনই অভ্যেস, ঘণ্টাদুয়েক মন দিয়ে কাজ করার পর তামাক না খেলে তাঁর চলত না। স্কুলের চাকর জগুয়ার পানের দোকানটিতে গিয়ে দাঁড়াতেন। এই সুযোগে শরতের প্ররোচনায় কেউ একজন ঘড়ির কাঁটাটাকে দশমিনিট এগিয়ে দিত। কয়েক দিন পর্যন্ত চুরি ধরা না পড়াতে সাহস বেড়ে গেল। ফলে কখনও আধঘণ্টা আবার কখনও একঘণ্টাও ঘড়ির কাঁটা এগুতে লাগল। কোন কোন দিন তিনটের জায়গায় চারটে বেজে গেল। অভিভাবকদের

মনেও সন্দেহ দেখা দিল কিন্তু পণ্ডিত মশাই বললেন, 'তা কি করে হয় ঘড়ি তো আমি নিজে দেখাশোনা করি।' জবাব তিনি দিলেন বটে কিন্তু তাঁর নিজের মনেও সন্দেহ হল। তাই চুপচাপ এই রহস্যোদ্ঘাটনে মন দিলেন। একদিন পানের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখেন যে একটি ছেলের কাঁধে আর একটি চড়ে ঘড়ির কাঁটাকে এগিয়ে দিচ্ছে। আর যায় কোথায়? রাগে ফেটে পড়লেন। নিমেষে ছেলেরা উধাও। শরৎ কিন্তু অতি ভাল মানুষের মতো চুপচাপ বসে রইল। পণ্ডিত মশাই ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না যে শরতের ব্যবস্থাপনায় এ নাটক রচিত হয়েছে, উপরন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের পা ছুঁয়ে বলল, 'আমি কিছু জানিনা পণ্ডিত মশায়। তখন থেকে তো আমি মন দিয়ে অঙ্ক কষছি।'

মুখের ভাব ভঙ্গি আর অভিনয়ে সে এমনই পটু যে, কে তাকে অবিশ্বাস করবে? দুর্দান্ত সাহস আর বুদ্ধির জোরে মামাদের দলে পাণ্ডা ছিল সে, আবার স্কুলের ছেলেদের নেতৃত্বের ভারও তার উপরেই ছিল। পশুপাখী পোষা বাগান তৈরী করা একরকম অনেক শখ ছিল তার; তার মধ্যে প্রজাপতি ও ফড়িং ধরার উদ্যোগ ছিল মুখ্য। নানা রংয়ের প্রজাপতি ধরে কাঠের বাক্সে রেখে যত্নের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা করত। তাদের রুচিমত খাবারের ব্যবস্থাও করত। প্রজাপতি আর ফড়িংয়ের লড়াইয়ের প্রদর্শনী করা হত, লড়াই দেখার লোভে অন্যান্য ছেলেরা তাকে সাহায্য করে নিজেদের ধন্য মনে করত। বাড়ির ছেলেরা ছাড়া এই দলে গণ্যমান্য লোকেদের ছেলেরাও যেমন ছিল, অপরদিকে তেমনি বাড়ির চাকর-বাকরদের ছেলেদেরও কোন ভেদাভেদ না রেখে দলে নেওয়া হয়েছিল। এরাও শরৎকে সাহায্য করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করত।

বাগানে শরৎ মনোমত নানান ধরনের ফুল লতা পাতার গাছ পুঁতেছিল। বেল, যুঁই, চন্দ্রমল্লিকা গাঁদা সবরকম ফুলই ঋতু অনুসারে ফুটত, তাই দেখে দলপতি ও দলের ছেলেরা সবাই আনন্দে ডগমগ করে উঠত। বাগানের একধারে মাটি খুঁড়ে একটা পুকুরও তৈরী করেছিল। একটা ভাঙা কাঁচে মাটি লেপে সেটা ঢেকে রাখত। কেউ দেখতে এলে ঢাকনা সরিয়ে পুকুরটিকে দেখিয়ে তাদের অবাক করে দিত। লুকিয়ে-চুরিয়েই তাকে এসব কাজ করতে হত কেননা দাদামশায়েরা কেউই এসব পছন্দ করতেন না। তাঁদের ধারণা, লেখাপড়া ছাড়া শিশুদের আর কোন কিছুর উপর দাবি থাকা উচিত

নয়। খেলাধুলো বা স্নেহ-ভালবাসায় শিশুদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। ভোরবেলায় স্কুল যাবার আগে জোরে জোরে পড়া মুখস্থ করা আবার সন্ধ্যেবেলায় স্কুল থেকে ফিরে রাতের খাওয়ার আগে পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপের আলোয় পড়া মুখস্থ কর, গুরুজনদের প্রীতিভাজন হওয়ার এই ছিল একমাত্র উপায়। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করত, বয়স হিসেবে তাকে শাস্তি দেওয়া হত। কেউ জানতে পারত না কখন কাকে একপায়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে হবে। এইরকম কঠোর অনুশাসনের ভিতর খেলার সময় পাওয়া ছিল দুষ্কর কিন্তু চোখে ধুলো দেওয়ার বিদ্যেতে শরতের জুড়ি ছিল না।

ছাত্রবৃত্তি[১] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শরৎ ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হল। গাঙ্গুলীবংশে ঘুড়ি ওড়ানো, শাস্ত্রে সমুদ্র যাত্রার মতই নিষিদ্ধ ছিল। আর শরতের প্রিয় খেলাই ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, লাট্টু নাচানো ও গুলি খেলা। নীলাকাশে শরতের ঘুড়ি যখন আনন্দে নাচত তাই দেখে দলের বন্ধুদের মনও খুশীতে উথলে উঠত। সুতোর মাঞ্জা ছিল তার বিশ্বজয়ী। এমন প্যাঁচে ফেলত যে প্রতিপক্ষের ঘুড়ি তখুনি কেটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। শূন্যে লাট্টু নাচিয়ে এমনভাবে হাতের তেলোয় এনে ফেলত যে বন্ধুরা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। বাগানের ফলপাকুড় চুরি করাতেও সে সিদ্ধহস্ত ছিল। যতই পেয়ারা গুনে রাখা হোক না কেন, শরৎ ঠিক ফাঁকি দিয়ে চুরি করবেই। সেই যে কথায় আছে না আছে না, 'তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়'—শরৎ সেইরকমই চালাকি আর ক্ষুরধার বুদ্ধির জোরে বাগান-মালিকের সব চেষ্টা ও সতর্কতা ব্যর্থ করে দিত। আর যদিবা কখনও ধরা পড়ত বীরের মতো মাথা পেতে শাস্তি সহ্য করত। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্রদের—যেমন, দেবদাস, শ্রীকান্ত, রাম এবং সব্যসাচী সবাইকেই প্রায় এ-সব বিদ্যায় দক্ষ দেখা যায়। জানিনা রামের মতো তাঁরও কোন নারায়ণী বৌদি ছিল কিনা। কিন্তু একথা সত্যি যে চুরির অভিযোগ শুনলে শরতের মা-ও পোড়ারমুখোটাকে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি দিতেন, আর শত আপত্তি সত্ত্বেও শরৎ এ-শাস্তি মাথা পেতে নিত। এক কথায় শরৎ অত্যন্ত খেলুড়ে, বিদ্রোহী প্রকৃতির ছেলে কিন্তু তা বলে তাকে বদ্‌মাইস

১—১৮৮৭ সাল। সেই সময় ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ক্লাশ সিক্স অবধিই হত। আজকের মতো নয়।

বলা যেতে পারে না, যদিও সেকালের মানদণ্ডে তাকে অবশ্য সেই পর্যায়েই ফেলা হয়েছে। বাবার মত তার মধ্যেও প্রচুর সৌন্দর্যবোধ ছিল। পড়ার ঘরটিকে সে খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। একটা তক্তপোষের উপর একটা সুন্দর তেপায়া টেবিল, একটা বক্স ডেস্ক ছিল, তাতে বই খাতা-পত্র, কলম, দোয়াত ইত্যাদি থাকত। বইপত্র একেবারে পরিষ্কার ঝকঝক করত। কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সুন্দর দেখবার মত খাতা তৈরী করত।

কোন জিনিসের প্রতিই তার আসক্তি ছিলনা। সারাদিন খেলাধুলো করে যতগুলো গুলি বা লাট্টু পেত বিকেল বেলায় সব ছোট ছোট ছেলেদের হাতে তুলে দিত। এই তার স্বভাব—দিয়ে সে আনন্দ পেত। এ-আনন্দ দানের অহঙ্কারের আনন্দ নয়, ভারমুক্তির আনন্দ। আহার নিদ্রার উপরেও তার অসীম সংযম ছিল। ছেলেবেলা থেকেই স্বল্পাহারী। পরবর্তীকালে কথাশিল্পীর 'বড় বৌ' এর তাই দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। ইংরেজী স্কুলে পড়ার সময়েই শরীর চর্চায় মন দেয়। মামার বাড়ির উত্তরে ঠিক গঙ্গার উপর একটা বিরাট বাড়ি ছিল কিন্তু খ্যাতি তার ছিল না একটুও। এককালে সেই বাড়িটায় বৃহৎ পরিবারের বাস ছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ পরপর কয়েকজন মারা যেতে বাড়ির লোকেরা সে বাড়ির বাস উঠিয়ে দেয়। অনেকদিন পর্যন্ত সে বাড়ি ভূতুড়ে বাড়ি বলে পড়ে ছিল। গুরুজনদের নজর এড়িয়ে শরৎ সেই বাড়ির উঠোনে কুস্তির আখড়া তৈরী করল। গঙ্গা থেকে লোফালুফি খেলার জন্য গোল পাথর তুলে নিয়ে এল, প্যারালাল বার তৈরী করবারও চেষ্টা করেছিল কিন্তু পয়সার অভাবে তা সম্ভবপর হল না। অনেক ভেবে চিন্তে শরৎ বাঁশের 'বার' তৈরী করবার নির্দেশ দিল।

সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটি ছেলে বাঁশ কাটতে বেরুল। বাঁশের ঝাড়ে ঘষা খেয়ে হাত-পা একেবারে রক্তারক্তি। কিন্তু দলপতির নির্দেশ, একরাতেই 'প্যারালাল বার' তৈরী করা চাই, কাজেই যে করেই হোক তৈরী করা হল। পরদিন দুপুরে ছেলেরা উৎফুল্ল হয়ে খেলায় মেতে উঠল। চেঁচামেচি করা একদম বারণ ছিল। বাড়ির লোকেরা যাতে জানতে না পারে সেইজন্য প্রাণরক্ষার মন্ত্র জপতে জপতে সবাই বাড়ি ফিরত। কিন্তু একদিন একটা ছেলে পড়ে গিয়ে বিপদ বাধালো। তার যথেষ্ট চোট লেগেছিল। তারপর এদের কপালে যা জুটেছিল তা বলে আর দরকার নেই। শরতের বিশ্বাস ছিল, সাঁতার কাটা শরীরের পক্ষে খুব উপকারী।

বাড়ির কাছেই গঙ্গা, কখনও কখনও গঙ্গা দূরেও সরে যেত। সে বছর বর্ষায় ছোট ছোট ডোবাগুলো লাল ঘোলাজলে ভরে উঠল। এই ঘোলাজলে চান করার লোভ শরৎ কি সামলাতে পারে? কাজে কাজেই মণিমামাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন ছোট দাদামশায় অঘোরনাথ অসময়ে বাড়ি ফিরে মণিকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মণি কোথায়?'—'মণি আর শরৎ পুকুরে স্নান করতে গেছে।'

একথা শোনার পর অঘোরনাথ এমন একটা হুঙ্কার ছাড়লেন যে সবার পিলে চমকে উঠল। স্নান সেরে দুজনে যখন হাসতে হাসতে বাড়ি এল তখন সবাই বাধা দেওয়া সত্ত্বেও অঘোরনাথ মণিকে এমন নির্দয়ভাবে মারলেন যে পাঁচসাত দিন পর্যন্ত তার গা থেকে ব্যথা গেল না। শরৎ কিন্তু তখুনি সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। দিনতিনেক পর দাদামশায় ঘোড়ায় চেপে কাজে বেরিয়ে যেতে তার দেখা পাওয়া গেল। মামারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কোথায় গিয়েছিলি রে?'

শরৎ জবাব দিল, 'আমি গুদাম ঘরে লুকিয়ে ছিলাম।'

'কি খেতিস সেখানে?'

'কেন! তোমরা যা খেতে তাই।'

'কে দিত?'

'ছোট দিদিমা!'

যখন ছোট দাদামশায় মণিকে বেদম প্রহার করছেন তখন ছোট দিদিমারই পরামর্শে শরৎ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনোর উপরেও তার তীব্র অনুরাগ ছিল। শুধু যে স্কুলের পাঠ্য বইই পড়ত তা নয়, বাবার লাইব্রেরী ঘরে যে সব বই ছিল, তার যখন সেটা হাতে পেত লুকিয়ে পড়ত। একদিন এমনি করেই একটা বই সে হাতে পেল যাতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল। বইটির নাম 'সংসার কোষ'। বিপদে-আপদে গুরুজনদের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার মন্ত্রও ছিল তাতে। শরৎ বন্ধুদের মন্ত্রটি লিখে নিতে বলল,—

'ওম্ হ্রীঃ হ্রীং হ্যাং হ্যাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা' শুধু গুরুজনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই নয়, সাপেদের কিভাবে বশ করতে হয় সে মন্ত্রও বইটাতে ছিল। শরৎ মন্ত্রটি পরীক্ষা করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল। কিছুদিন আগে তাকে একবার সাপে কামড়ায়, কোনরকমে বেঁচে গিয়েছিল। তাই সে জন্মেজয়ের

মতো সর্পযজ্ঞ করতে মনস্থ করল। বইটাতে লেখা ছিল যে, একহাত লম্বা বেল গাছের শেকড় যে-কোন বিষাক্ত সাপের ফণার সামনে ধরলে নিমেষের মধ্যে সে সাপ নেতিয়ে পড়ে। যথেষ্ট উৎসাহে একটা বেলদণ্ড যোগাড় করল। সাপের কোন অভাব ছিল না, তবে-সেদিন সাপেরা বোধহয় মন্ত্রের খবর আগেই পেয়ে গিয়ে থাকবে তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের কারুরই দেখা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত পেয়ারা গাছের তলায় আবর্জনার মধ্যে একটা গোখরো সাপের বাচ্চার খোঁজ পাওয়া গেল। আনন্দে শরৎ দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে খুঁচিয়ে সাপের বাচ্চাটাকে বাইরে আনার চেষ্টা করল। ছেলেদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে সাপের বাচ্চাটি ফণা তুলে ফোঁস করে উঠল। শরৎ তখুনি বেলগাছের গোড়াটি সাপের সামনে রেখে দিল। কিন্তু নির্জীব হওয়া তো দূরে থাক, সেই ক্ষুদে সাপটি বেলগাছের গোড়াটিতে বারবার ছোবল দিতে লাগল। এই দেখে ছোটরা খুব ভয় পেয়ে গেল। মণিমামা কোত্থেকে একটা লাঠি জোগাড় করে সনাতন পদ্ধতিতে সাপটির ইহলীলা শেষ করে দিল। মনে হয় তখনও পর্যন্ত 'বিলাসী'র মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে শরতের আলাপ হয়নি। সাপকে গাছের শেকড় দেখাবার আগে আরও একটা দরকারী কাজ করার ছিল। প্রথমে একটা গরম লোহার শিক দিয়ে সাপের মুখে ছেঁকা দিতে হবে, তারপর দাও বেলগাছের শেকড় বা সামান্য কোন কঞ্চি, সাপ প্রাণভয়ে পালাবে। পরবর্তীকালে 'শ্রীকান্ত' ও 'বিলাসী' উপন্যাসে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এই বিদ্যের ব্যাখ্যা খুব সরসভাবে করেছেন।

এইসব দুষ্টুমির মধ্যে হঠাৎই দেখা যেত দলের পাণ্ডা উধাও। কেউ হয়ত ডেকে উঠত,—'কোথায় গেলে শরৎদা ?'

'এই তো এখানে !'

'কোথায় ?'

খুঁজে খুঁজে সবাই যখন হয়রান তখন কোত্থেকে সে নিজেই এসে হাজির হত। বাচ্চারা সবাই তাকে ঘিরে জিজ্ঞেস করত, 'কোথায় গিয়েছিলে ?'

'তপোবনে !'

'তপোবন কোথায় ? আমাদেরও দেখাও।'

তপোবন যে কোথায় সেকথা শরৎ কাউকে কোনদিন বলেনি। সুরেন্দ্র মামার সঙ্গে শরতের খুব ভাব। বোধহয় সুরেন্দ্র ওর মায়ের দুধ খেয়েছিল বলেই। সুরেন্দ্রর মা সন্তানসম্ভবা ছিলেন। এদিকে শরতের একটি ছোট

ভাই বাচ্চা বয়সে মারা যায় তখন শরতের মা সুরেন্দ্রকে নিজের দুধ খাইয়ে পালন করেছিলেন। তাই যখন সুরেন্দ্র খুব কাকুতি-মিনতি করল তখন শরৎ না করতে পারল না। তপোবনে নিয়ে যাবার আগে সুরেন্দ্রকে বলল, 'আমি তোকে নিয়ে তো যাচ্ছি কিন্তু তুই সূর্য, গঙ্গা, ও হিমালয়কে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা কর যে এ জায়গার কথা আর কাউকে বলবি না?'

সুরেন্দ্র বলল, 'আমি সূর্যকে সাক্ষী রেখে বলছি এ জায়গার নাম কাউকে বলব না। আমি গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি কাউকে এ জায়গার কথা বলব না। আমি হিমালয়কে সাক্ষী রেখে বলছি, আর কাউকে এ জায়গার ঠিকানা দেব না।'

'তাহলে চল!'

ঘোষ বাড়ির উত্তরে গঙ্গার কাছ বরাবর একটা ঘরের তলায় নিম ও ও করমচার গাছগুলি জায়গাটাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। নানা-রকম লতাপাতায় জায়গাটা এমনভাবে ঢেকে গিয়েছিল যে সেখানে কারুর ঢোকা অসাধ্য। খুব সাবধানে এক দিকের লতাপাতা সরিয়ে শরৎ সেখানে গিয়ে ঢুকল। জায়গাটি বেশ পরিষ্কার, সবুজ সতেজ লতাপাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ এসে পড়ায় স্থানটিকে স্নিগ্ধ হরিৎ প্রকাশে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় এ যেন কোন স্বপ্নলোকে আসা। একটা বড় পাথর সেখানে ছিল তার উপর বসে পড়ে শরৎ সুরেন্দ্রকে ডাকল, —'আয়।' সুরেন্দ্র ভয়ে ভয়ে শরতের পাশে গিয়ে বসল। নীচে খরস্রোতা গঙ্গা, ওপারের দৃশ্য স্পষ্ট, মিঠেমন্দ হাওয়ার কাঁপন মনে পুলক জাগাচ্ছিল। সুরেন্দ্র মুগ্ধ হয়ে বলল,—'জায়গাটি তো ভারি সুন্দর।'

শরৎ বলল—'হ্যাঁ এখানে এসে বসে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে, কত কথাই না জানি ভাবি, অনেক বড় বড় চিন্তা মাথায় আসে।' সুরেন্দ্র বলল, 'সত্যি মনে হচ্ছে তপোবনে এসে পড়েছি। বুঝতে পেরেছি এবার অঙ্কে তুই একশোর মধ্যে একশো কি করে পেয়েছিস।' না জানি কতবার এই পবিত্র মৌন একান্ত জায়গায় শরৎ এসে বসেছিল। দূর থেকে শিশুদের কলকাকলি গঙ্গার স্রোতের কল কল ধ্বনির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে কেমন রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করত। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য তার ক্লান্ত দেহ মনে স্নেহের পরশ ছুঁইয়ে যেত, হয়ত তখনই সে মনে মনে শপথ করে থাকবে,—'আমি সূর্য গঙ্গা, হিমালয়কে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি সারাজীবন সৌন্দর্যের

উপাসনা করব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিরদিন লড়াই করব, কখনও কোন ছোট কাজ করব না।' হয়ত বাড়িতে সে মনোমত নির্জনতা পায়নি। সামান্য শব্দও সেখানে এমন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করত যে মাথায় যেটুকু চিন্তার ছবি ফুটে উঠত সব অস্পষ্ট হয়ে যেত।

শুধু অঙ্কে শরৎ ফার্স্ট হয়েছিল তা নয় ইংরেজী স্কুলের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় প্রথম স্থান পায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইংরেজী শিক্ষার জন্য তাকে এক ক্লাস নীচুতে ভর্তি হতে হয়, ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি তার পক্ষে খুব সহজ হয়ে পড়ে, তাই অনায়াসে ডবল প্রমোশন পেয়ে উঁচু ক্লাসে পৌঁছে যায়। পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ার দরুন বন্ধুদের মধ্যে তার প্রতিপত্তি বেশ বেড়ে যায় এবং গুরুজনেরাও আশ্বস্ত হন।

স্কুলে একটা ছোট লাইব্রেরী ছিল। শরৎ সে যুগের বিখ্যাত লেখকদের লেখা বইগুলি লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়ত। যুগসন্ধির সেই যুগে যখন কর্তাব্যক্তিরা চণ্ডীমণ্ডপের দালানে বসে চতুষ্পদী নিয়ে মেতে থাকতেন তখন কিশোর বয়সের এই ছেলের দল লুকিয়ে চুরিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বইগুলির পাতা ওলটাত। শরৎ শুধু পড়ত না, বোঝারও চেষ্টা করত। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সূক্ষ্ম অধ্যয়ন করার সহজ পদ্ধতি তার সহজাত। সব কিছু সে বড় নিকট থেকে দেখতে পেত।

একদিন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অঘোরনাথ অধিকারী গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, শরৎ তাঁর কাপড়চোপড় নিয়ে পেছন চলেছে। একটা ভাঙা ঘরের ভেতর থেকে একটি স্ত্রীলোকের করুণ কান্না ভেসে আসছিল। অধিকারী মশাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, কে কাঁদছে? কি হয়েছে ওর?'

শরৎ বলল, 'মাস্টারমশাই, এই স্ত্রীলোকটির স্বামী অন্ধ ছিল, লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঝি-গিরি করে সে তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কাল রাতে তার সেই অন্ধ স্বামী মারা গেছে। বড়ই দুঃখী বেচারী। দুঃখী লোকেরা বড়লোকদের মত লোকদেখানো কান্না কাঁদেনা। মাস্টারমশাই এদের বুকফাটা এ কান্না সত্যিকারের কান্না।' একটা ছোট ছেলের মুখে 'চোখের জলের এত গভীর সূক্ষ্ম বিবেচনা শুনে অঘোরবাবু অবাক হয়ে যান। তিনি কোলকাতায় থাকতেন। কোলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি নিজের এক বন্ধুকে এই ঘটনাটি শুনিয়েছিলেন। বন্ধু বলেছিলেন, 'যে-ছেলে কান্নার এত

বিভিন্ন রূপ চিনতে পারে, সে সাধারণ বালক হতে পারে না। বড় হয়ে সে নিশ্চই মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত হবে।'

কিন্তু শরতের সহজাত প্রতিভা বোঝার মতো লোক গাঙ্গুলীবাড়িতে ছিলনা। এই ভয়ঙ্কর গোঁড়া আদর্শবাদী বংশের শুধু একজনের উপরেই নতুন যুগের হাওয়া লেগেছিল, সে ছিল কেদারনাথের চতুর্থ ভাই অমরনাথ। সেইযুগে সৌখিন অমরনাথ পায়রা পোষা ছাড়া আয়না চিরুনী, চুলের ব্রাশ ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। বাড়ির ছেলেরা অমরনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। মুগ্ধ হওয়ার আর একটা কারণ ছিল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ছোটদের হাতে প্রতিদিন পিপারমেণ্ট বা ওই ধরনের কিছু-না-কিছু দিতেন। বড় ভায়েরা অমরনাথের এই রকম আচরণের জন্য বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং শেষ অবধি একদিন মাথার টিকি রেখে বাকী চুল কেটে ফেলে গাঙ্গুলী বংশের মান তাঁকে বজায় রাখতে হয়। খুব শখ করে অমরনাথের ইংরেজী ফ্যাসনের চুল রাখার পর্বের এখানেই ইতি।

পড়াশুনোয় অমরনাথের ভারি অনুরাগ ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' গাঙ্গুলীবাড়িতে ঢোকাবার সাহস করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচক। গাঙ্গুলীদের আদি বাড়ি হালিসহর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার দূরত্ব বেশী ছিল না। ওই গ্রামের একটি মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিল, কিন্তু যেহেতু গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এ বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের এতটুকুও সম্মান ছিল না। নবযুগের বার্তাবাহক রূপে বরং এই পরিবারে তাঁর অসম্মানই বেশী ছিল। তবুও অমরনাথ লুকিয়ে চুরিয়ে 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে আসতেন। তাঁর কাছ থেকে ভুবনমোহিনীর হাত দিয়ে সেখানি মোতিলালের হাতে পৌছত। আবার সেখান থেকে কুসুমকামিনীর হাতে গিয়ে পড়ত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ অমরনাথ বেশীদিন বাঁচেননি। ছোটদের মনে অপরিসীম বেদনা দিয়ে অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। তাঁর অভাব অনেকাংশে কুসুমকামিনী দেবী ও মোতিলাল পূর্ণ করেন। কুসুমকামিনী সব থেকে ছোট দাদামশাই অঘোরনাথের স্ত্রী। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাইয়ের হাত থেকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন। চিরদিন যা হয়ে এসেছে, সে সময়ও মেয়েদের একমাত্র কাজ ছিল রান্নাবান্না করা, ভাঁড়ার গোছানো ইত্যাদি। তারপরও যদি সময় থাকত তাহলে জীবনকে জীবন্ত করে তোলার জন্য কলহ করা বা ঘুমিয়ে সময় কাটান, আবার ঘুম ভাঙার পর

পরনিন্দা পরচর্চায় মেতে সময় নষ্ট করাই মেয়েদের একমাত্র কাজ ছিল। কুসুমকামিনী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। যেদিন তাঁর উপর রান্নাবান্নার ভার থাকত না, সেদিন তিনি বৈঠকখানায় বা ছাতের উপর একটি ছোটখাট গোষ্ঠীর আয়োজন করতেন। তিনি নিজে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া 'মৃণালিনী', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা', 'মেঘনাদবধ' ও 'নীলদর্পণ' পড়ে শোনাতেন। তাঁর গলার স্বর ও পড়ার কায়দা এমনই মর্মস্পর্শী ছিল যে সবাই তন্ময় হয়ে শুনত। ছোট্ট শরৎ অবাক হয়ে ভাবত লেখক না জানি কি অসাধারণ মানুষ। হয়ত তার মনে তখনও পর্যন্ত লেখক হওয়ার সাধ জাগেনি। বাড়ির ভিতরকার এই গোষ্ঠীতেই সাহিত্যের প্রথম পাঠ শিখেছিল শরৎ। তার বহুদিন পর 'বঙ্গদর্শনে' সে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পড়েছিল। 'চোখের বালি' পড়ে কিশোর শরতের মনে যে গভীর আনন্দ হয় তা সে কাউকে যেমন বলতে পারেনি তেমনই কোনদিন ভুলতেও পারেনি। এতদিন পর্যন্ত তার মন ভূতপ্রেতের গল্পে আতঙ্কিত থাকত। এই নতুন জীবনদর্শন, প্রকাশ ও সৌন্দর্যের যাদুর পরশ তাকে যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দিল। যেমন একদিন পুশকিনের রচনা পড়ে টলস্টয় বলেছিলেন, 'আমি পুশকিনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। তিনি আমার পিতা। তিনি আমার গুরু।' শরৎও নিশ্চই সেদিন বলে থাকবে, 'তাঁর কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। আজ থেকে রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু।' সত্য সত্যই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত শরৎ তাঁকে গুরুর মতই শ্রদ্ধা ও সম্মান করে গিয়েছিলেন।

আসলে মণি-শরতের শিক্ষার আদিপর্ব কুসুমকামিনীর পাঠশালায় হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তক পড়া হয়ে গেলে সাহিত্যের পালা আসত। শৈশব থেকে যৌবনের আরম্ভ পর্যন্ত এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি; অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের নির্মাণে কুসুমকামিনীর অবদান কোনদিন ভোলবার নয়।

এই সাহিত্যগোষ্ঠীতে হঠাৎই একদিন বিক্ষোভের সুর শোনা যায়। নতুন স্রোতে স্রোতী এ বাড়ির একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পড়ে শোনায়। বাইরে থেকে পড়াশুনো করলেও এ বাড়ির বর্জিত সঙ্গীত ও কাব্যে তার খুবই ঝোঁক ছিল। কবিতা শোনাবার জন্য বাড়ির সব মেয়েদের ডেকে পাঠায়। কবিতার মর্ম সেদিন কে কতখানি বুঝেছিল জানা যায়নি কিন্তু শরতের দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। চোখের জল গোপন করবার জন্য তাকে বাইরে উঠে যেতে হয়েছিল।

৩.

মামার বাড়িতে থাকা বেশীদিন শরতের হয়নি। তার বাবা শুধু স্বপ্নবিলাসীই ছিলেন না, আরো কয়েকটি দোষ তাঁর ছিল। তিনি তামাক খেতেন এবং ছোট বড় সবার সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন। সে যুগে বড়দের সামনে ছোটদের হাসিঠাট্টাকে বেয়াদপি মনে করা হত। মোতিলালের এসবে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ছোটদের দুষ্টুমিতে তিনি পরোক্ষে সাহায্যই করতেন। যদি কোন ছেলেকে গুদামঘরে বন্ধ করে রাখার শাস্তি দেওয়া হত তাহলে তিনি সুযোগ-সুবিধে মতো নীরবে তার খাবারটুকু পৌঁছে দিতেন। এবং যখন সে ছাড়া পেত, একটি ফুলের মালা পরিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর হাতের তৈরি নানারকম কাগজের খেলনা শিশুদের বিশেষ প্রিয় ছিল। শ্লেট পেন্সিলে সুন্দর করে অক্ষর পরিচয় করাতেন। ছোটদের গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাও করতেন। বাচ্চারা যখন হৈ হুল্লোড় করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিত, তখন অনুভূতিপ্রবণ মোতিলাল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতেন। একে তো ঘরজামাই, তার উপর এরকম আচরণের জন্য মোতিলালকে এই গোঁড়া প্রকৃতির সংসারে কেউ সুনজরে দেখতেন না। ফলে নিঃস্ব রিক্ত এই মানুষটি কেমন যেন ছন্নছাড়া ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে মনমরা হয়ে থাকতেন। 'কাশীনাথ'-এর কাশীনাথও তো ঘরজামাই। মানসিক সুখ বলতে তারও কিছু ছিল না। কখনও কখনও কাশীনাথের মনে হত হঠাৎ কেউ তাকে জোর করে গরম জলের কড়ায় ফেলে দিয়েছে। সবাই মিলে পরামর্শ করে তার দেহটাকেও কিনে ফেলেছে। তার নিজের বলতে কিছুই নেই, এমনকি শরীরটাও নয়।

এমনিভাবেই চলছিল, হঠাৎই একদিন একটি দুর্ঘটনা ঘটে। কেদারনাথের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী টাঙ্গায় চড়ে কোথাও যাওয়ার পথে পড়ে গিয়ে[১] গুরুতর আহত

১. ১৮৮৮ সাল

আহত হন। ভাগলপুরের চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতায় চিকিৎসা করানো মানে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন, অথচ পূর্বের মতো সংসারে আর্থিক সঙ্গতিও ছিল না। ভায়েরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। অমরনাথ আগেই দেহ রেখেছিলেন, তাঁর বিবাহযোগ্যা কন্যার সময়ে বিবাহ না দিলে আবার অপমানের ভয়ও আছে। কেদারনাথ ভেবে ভেবে কূলকিনারা না করতে পেরে মোতিলালকে ডেকে একদিন বললেন—'তোমাদের এখানে থাকা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। দেবানন্দপুরে গিয়ে কোন কাজের খোঁজ করো।'

নিরুপায় মোতিলাল এবং ভুবনমোহিনী দুজনেই একথা শুনলেন। কাকেই বা অভিযোগ অনুযোগ করবেন। তাই হঠাৎই শরৎ একদিন দেখল সে আবার দেবানন্দপুরে ফিরে এসেছে। দেবানন্দপুরে ফিরে আসার আগে ভাগলপুরে মামাদের প্রতিবেশী মজুমদারদের ছেলে রাজুর সঙ্গে পরিচয় হয়। এ পরিচয় শুধু সামান্য পরিচয় নয়, এর পিছনে লুকিয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাস। শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা, আজানুলম্বিত বাহু, মুখে অল্প বসন্তের দাগ, শরীরে যতখানি বল, মনে তার দ্বিগুণ সাহস এই রাজু অর্থাৎ রাজেন্দ্রনাথের। পিতা রামরতন মজুমদার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ভাগলপুরে আসেন। পরে অবশ্য কোন কারণে চাকরী ছেড়ে দেন। গাঙ্গুলীদের ঠিক পাশেই তাদের বাড়ি ছিল। এবং বাড়ি সংলগ্ন জমি-জায়গা নিয়ে দুটি পরিবারে তেমন বনিবনাও ছিল না। কিছু পোড়ো জমি জঙ্গল ও আগাছায় ভরে গিয়েছিল। মা বাপের কঠিন অনুশাসনে ব্যথিত ছেলেরা এই জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিত। ধূমপান, গাঁজা-চরস এবং চোরাই মোষের দুধ খেয়ে দেহ নির্মাণের পর্ব এখানে পূর্ণ উদ্যমে চলত। রামরতন মজুমদার নিজের সাত-ছেলের জন্য সাতটি বাড়ি তৈরী করেন। পুরাতন বাঙালী সমাজে তাঁর কোন আদর ছিল না, তাদের কাছে ক্ষমাও তিনি পাননি, কারণ তিনি চিনেমাটির পেয়ালা-পিরিচে চা-খাবার খেতেন, মুসলমান বাবুর্চির হাতের জল খেতেন। ছোট ভায়ের বিধবার সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা ছিল না। মোজা পরতেন, দাড়ি রাখতেন, ক্লাবে যাওয়া, দর্শন চর্চা করা ইত্যাদির জন্য তাঁকে কেউ ভালো নজরে দেখতেন না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পিতার স্বাধীন মনোবৃত্তি এবং খেয়ালখুশী মতো পথচলাকে রাজু চরমে পৌঁছে দিল। ঘুড়ি ওড়ানোর দ্বন্দ্বযুদ্ধে শরতের মতো রাজুও সিদ্ধহস্ত ছিল। কাজেই একে অপরকে

হারানোর খেলায় মেতে উঠত। ঘুড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় ভালো জিনিস যোগাড় করা ধনীপুত্র রাজুর অসুবিধে হত না, কিন্তু শরতের পয়সা কোথায়? তাই সে ও দলের ছেলেরা ভাঙা শিশি-বোতলের কাঁচ ময়দার মতো গুঁড়িয়ে তাতে আরো কিছু মিশেল দিয়ে সুতোর মাঞ্জা তৈরী করত। সেদিন শনিবার। সন্ধ্যেবেলা শরতের গোলাপী ঘুড়ি আপন খেয়ালী পথে উড়ে চলল। হঠাৎই একটা সাদা ঘুড়ি ক্রমশঃ গোলাপী ঘুড়িটার কাছাকাছি এসে পড়ল। এ ঘুড়ি রাজুর। দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্যাঁচের উপর প্যাঁচ। দুদলই জয়ের কামনায় উত্তেজিত। 'এই গ্যালো গ্যালো' 'কাটলো রে' 'ভো কাটা'র কানফাটা চিৎকার হাওয়ায় ভেসে ভেসে কাঁপতে লাগল। আর হঠাৎই সবাই দেখল সাদা ঘুড়িটা কেটে গিয়ে এলোমেলো ভাবে মাটিতে এসে লুটিয়ে পড়ল। দলের যখন আনন্দের শেষ নেই, রাজু ততক্ষণে ঘুড়ির সাজ-সরঞ্জাম গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে।

পরে অবশ্য এই দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসে। অসাধারণ প্রকৃতি, অপূর্ব প্রত্যুৎপন্নমতি বালক রাজুর সব রকম সাফল্যই যেন করতলগত। অপরদিকে শরতের স্থির, ধীর শান্ত বুদ্ধি অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে পরম আগ্রহে রাজুকে নিজের বন্ধুত্বের জন্য আকুল করে তুলত। অবশেষে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে দুটি কিশোর একাত্ম হয়ে উঠল। বয়সে বড় রাজু শরতের সকল প্রকার দুঃসাহসিক কর্মের মন্ত্রগুরু হয়ে উঠল। সঙ্গীত এবং অভিনয়প্রিয়তা দুজনকে বন্ধুত্বের আরো নিকটে পৌঁছে দিল। শরতের গলা ছিল অত্যন্ত মধুর। তৎকালীন সদাচার এবং অনুশাসনের খড়্গ বারবার এই মৈত্রীর বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে কিন্তু তবুও তাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন হতে পারেনি। সংসারে এমন কেউ ছিল না যে সান্ত্বনা ও সহানুভূতির দুটো কথা তাকে বলে। জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এই তো ছিল প্রশস্ত সময়, কাজেই স্বভাবতঃই মন ঘরের বাইরে প্রেরণার স্রোত খুঁজে বেড়াত। তাছাড়া শুরু থেকেই শরতের মধ্যে লুকিয়ে ছিল মহান হবার সম্ভাবনা।

৪.

মোতিলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন চব্বিশপরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকট মামুদপুরের নিবাসী। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবারের স্বাধীনচেতা নির্ভীক ব্যক্তি ছিলেন। যদিও সে-যুগ ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারদের অত্যাচার এবং অবিচারের যুগ, কিন্তু তাঁকে কেউ কোনদিন দাবিয়ে রাখতে পারেননি। চিরদিনই তিনি প্রজাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন। একদিন কোন-এক জমিদার কোর্টে মামলায় তাঁকে সাক্ষী দিতে বলেন। মোতিলাল অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিলেন,—'আমি কেমন করে সাক্ষী দিতে পারি বলুন? মামলার বিষয়ে তো আমি কিছুই জানি না।' জমিদার বলেছিলেন, 'সাক্ষী দেওয়ার মধ্যে জানার কিছু নেই।' মিথ্যে সাক্ষ্য তো আজও দেওয়া হয়। সেদিনও দেওয়া হত কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথ অনায়াসেই অস্বীকার করলেন, ফলে জমিদারের ক্রোধের ধকল তাঁকে সইতে হয়েছিল।

কারণ আর যাই হোক একদিন তাঁকে আর বাড়িতে ফিরে আসতে হয়নি। মোতিলাল তখন খুব ছোট। শিশুপুত্রকে কোলে করে বৈকুণ্ঠনাথের স্ত্রী সারারাত স্বামীর আসার পথ চেয়ে রইলেন, কিন্তু তিনি ফিরলেন না। সকালবেলায় একটি লোক এসে বলল, 'বৌমা···বৌমা···বড় অঘটন ঘটে গেছে। বৈকুণ্ঠনাথকে কেউ মেরে রেখে গেছে। তার শবদেহ শ্মশানঘাটে পড়ে রয়েছে।' বাক্‌হারা নিস্তব্ধ হতবুদ্ধি বিমূঢ়া বৌমা কোলের শিশু-সন্তানটিকে বুকের সঙ্গে আরো নিবিড় করে চেপে ধরলেন। ছিল না জ্ঞান-হারাবার সামর্থ্য। জমিদারের আতঙ্কে হাহাকার করে বুকফাটা কান্নাও সে কাঁদতে পারেনি, তাহলে যে ছেলেকেও হারাতে হয়। গ্রামের প্রবীণদের পরামর্শে স্বামীর শেষকৃত্য সেরে, শোকবিহ্বলা নারী রাতারাতি দেবানন্দপুরে

ভায়ের কাছে চলে আসে। একটু বড় হলে পর ভাগলপুরের কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে মোতিলালের বিয়ে হয়। বহু বাঙালীর মতো সে-সময় কেদারনাথের পিতা রামধন গঙ্গোপাধ্যায় ঘোর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবিকার খোঁজে শেষে হালিসহর থেকে এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন ও পরিশ্রমী হওয়ার দরুন উচ্চ সরকারী পদ পেতে তাঁর দেরি হয়নি। এরপর সম্পন্নতা এবং প্রতিষ্ঠা মুক্তহস্তে তাকে বরণ করে নেয়। তখনকার দিনে আর্থিক সম্পন্নতার চেয়ে কুলীনতা এবং বংশমর্যাদা বিবাহাদিতে উল্লেখনীয় ছিল। সদ্‌বংশ এবং কুলীন সন্তান হওয়ার জন্যই কেদারনাথ মোতিলালের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন। তাঁর কাছে থেকেই মোতিলাল ম্যাট্রিক পাস করেন।[১] ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজে পড়ার জন্য তিনি পাটনা চলে যান। খুড়শ্বশুর অঘোরনাথ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু দুজনের স্বভাবে কোন মিল ছিল না। মোতিলাল অভাব এবং দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন। মার অত্যন্ত আদরে ছোটবেলায় তার শিক্ষা-দীক্ষা ঠিক পথ ধরে এগুতে পারেনি। লেখাপড়ায় তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু তার থেকেও বেশী ছিল কল্পনায় ডুবে থাকা। 'আমায় কল্পনার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে দাও। আমি সেই বিশ্ব-সংসারকে দেখতে চাই এ-সংসার যার শুধুমাত্র প্রতিবিম্ব।' এই হল মোতিলালের পরিচয়। অঘোরনাথ ঠিক এর বিপরীত, অত্যন্ত কর্মঠ, স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এরকম ক্ষেত্রে কল্পনাপ্রিয় মোতিলালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব ছিল না। কলেজ জীবনেও তিনি বেশীদিন টিকে থাকতে পারেননি। দেবানন্দপুরে ফিরে চাকরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। তখনকার দিনে এণ্ট্রেন্স পাসের চাকরী পাওয়া খুব কঠিন ছিল না। মামা নিজের বাড়ির কাছেই কিছু জমি দিয়েছিলেন। কিছু টাকা যোগাড় করে একতলায় দুটি দক্ষিণমুখো ঘর ও বারান্দা তৈরী করেন। এবং এখানে থেকেই স্বাধীনভাবেই সংসার যাত্রা শুরু করেন। মোতিলালের মা সাহসী সুগৃহিণী ছিলেন। এবং তাঁর স্ত্রী শান্ত প্রকৃতি, নির্মল চরিত্র এবং উদারচিত্তের মহিলা ছিলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু বৈদূর্যমণির ন্যায় অন্তরের রূপে সত্যই রূপসী ছিলেন। তাঁর সাবলীল পতিব্রতা এবং প্রেমের ছায়ায় স্বপ্নবিলাসী যাযাবর স্বামীর ঘরকন্না নিরুদ্বেগে চলতে লাগল। এখানেই

---

১. :৮৭৩—তৃতীয় শ্রেণী

১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ অর্থাৎ ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩ বঙ্গাব্দ শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। মা-বাপের দ্বিতীয় সন্তান। চারবছর আগে একটি বোন, অনিলার জন্ম হয়। মা-বাবা বড় যত্ন ও আগ্রহে পুত্রের নাম রাখলেন 'শরৎচন্দ্র'।

দেবানন্দপুর বাংলার একটি সাধারণ গ্রাম। খাল, বিল, পুকুর, নারিকেল, কলাগাছ ও সবুজের প্রাণপ্রাচুর্য ভরা একটি গ্রাম। গ্রামে ম্যালেরিয়ার আধিক্য ছিল। নবাবী আমলে ফরাসী ভাষার এটি একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রায় দেড়শো বছর আগে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ফরাসী ভাষা শেখার জন্য কিশোর বয়সে এখানে আসেন। দেবানন্দপুরের গণনা প্রাচীন সাতটি গ্রামের মধ্যে করা হত। তখন এটি ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। ভারতচন্দ্রের সময় এই গ্রামে হরিরাম রায় এবং রামচন্দ্র দত্তমুন্সী পড়াতেন। এঁর কাছ থেকেই তিনি ফরাসী ভাষা শেখেন এবং দুটি পদ্য লিখে তাঁদের দুজনকে অমর করে গিয়েছেন।

—এ তিন জনার কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাথা।
বুদ্ধিরূপ কৈল নানা জনা ॥
দেবানন্দপুর গ্রাম দেবের আনন্দধাম।
হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী ॥
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গাথা
হয়ে মোর কৃপাদায় পড়াইল ফরাসী ॥

এই গ্রামেই শরতের বাল্যজীবন অত্যন্ত অভাবের মধ্যে আরম্ভ হয়। শরতের মা না-জানি কেমন করে সংসার চালাতেন। স্বামীকে তিনি চিনতেন, তাঁর কাছে অভিযোগ করা বৃথা। শুধু সংসারের শ্রী হয়ে তিনি থাকুন এটুকুই সার্থকতা। ভুবনমোহিনী জীবনে কোনদিন স্বামীর কাছে গহনা বা কাপড়-চোপড়ের দাবি করেননি। নিজেকে উৎসর্গ করাই যেন তাঁর পরম দায়। যখন তিনি ভাগলপুরে ছিলেন, বাবা-কাকাদের সেই বৃহৎ পরিবারের সবকটি ছেলেমেয়ের ভার তিনি স্বচ্ছন্দে তুলে নিয়েছিলেন। কে-কখন ফিরবে, কে-কখন যাবে, কে-কখন কি ধরনের খাবার খাবে, এরকম অসংখ্য কাজের

ভিড়ে নিঃশ্বাস নেবার ফুরসৎ পেতেন না। চারিদিক থেকে শোনা যেত—'ভুবন কোথায় রে? এই ভুবন, ওরে ও মেয়ে ভুবনমোহিনী।' মোতিলাল যেন একটি রঙিন ঘুড়ি। অনন্ত আকাশে শুধু দিশাহীন উড়তে চায়। আর ভুবনমোহিনী একটি বিরামহীন চক্র। সরলচিত্তের নারী বিশ্রামহীন কর্মে চরকির মতো ঘুরছেন। তাঁর কোমল মন সবার দুঃখেই কাতর। সবাই তাঁকে ভালোবাসত। বড়রা তার সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ ছিলেন। ছোটরা তাঁর স্নেহের কাঙাল ছিল। শরৎ-সাহিত্য খুঁজলে এরকম চরিত্র অনেক দেখা যাবে। কথা-শিল্পী শরৎ যখনই সুযোগ পেয়েছে অকৃপণভাবে মায়ের ঋণ শোধ করেছে। কিন্তু যতই সরল ও উদার নারী হোন না কেন স্বামীর অকর্মণ্যতা তাঁকে দগ্ধ করে। তাই ভুবনমোহিনী যখন মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, মোতিলাল চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়াতেন 'শুভদার' হারানবাবুর মতো।

৫.

পাঁচবছর বয়সে শরৎকে প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু অত্যন্ত খেলুড়ে ও দুষ্ট প্রকৃতির শরৎ প্রতিদিনই স্কুলে কোন-না-কোন কাণ্ড বাধিয়ে আসত। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমি কিছুমাত্র কমেনি। সেদিন মাদুরে বসে দেখল যে পণ্ডিতমশাই তামাকের ছিলিম সাজিয়ে কোথায় যেন গেছেন। তৎক্ষণাৎ শরৎ তামাক সরিয়ে তার জায়গায় ছোট ছোট ইটের টুকরো রেখে ভালো মানুষের মতো নিজের জায়গায় এসে বসল। পণ্ডিতমশাই ফিরে এসে ছিলিমে আগুন রেখে গড়গড়ায় টান দিলেন, কিন্তু কোথায় ধোঁয়া? কয়েকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে তিনি ছিলিম উল্টে-পাল্টে দেখেন যে তামাকের বদলে ইঁটের টুকরো। বুঝতে পারলেন এ কোন ছাত্রেরই কীর্তি। রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যি করে বলো এই ইটের টুকরো ছিলিমে কে রেখেছে?' কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু

পণ্ডিতমশাই যখন ক্রোধে পাগলের মতো বারবার চিৎকার করতে লাগলেন, তখন একটি ছেলে ভয়ে শরতের নাম বলে ফেলল। ব্যাস্ আর যায় কোথায়। পণ্ডিত মশাই বেত নিয়ে তেড়ে মারতে এলেন। শরৎ তো অবস্থা দেখে এক লাফে ছুট্। পালাবার সময় কিন্তু সেই ছেলেটিকে একটি ধাক্কা দিতে ভোলেনি। ধাক্কা খেয়ে ছেলেটি পড়ে যায়। পণ্ডিতমশাই তাকে ওঠাতে গেলেন, ইতিমধ্যে শরৎ উধাও। ক্রোধে উন্মত্ত পণ্ডিতমশাই শরতের বাড়ি গিয়ে তার মাকে সব কথা শোনালেন। বাড়ি ফিরে শরৎ মায়ের হাতে প্রচণ্ড মার খেল। মা মাঝে মাঝে নিজের কপাল চাপড়ে বলতে লাগলেন, 'কি করবে এই ছেলে বড় হয়ে? কেমন করে চলবে এর···?' শাশুড়ী বোঝালেন, 'বৌমা এত মার মেরো না ওকে। আমি বলছি একদিন ওর সুমতি হবে। এ ছেলে সত্যি খুব বড় হবে। সেদিন দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না। কিন্তু তুমি দেখো, আমার কথা মিথ্যা হবে না।' পণ্ডিতমশাইয়ের অভিযোগের উত্তরেও শরতের ঠাকুমা সেই একই উত্তর দিতেন, 'পণ্ডিতমশাই ন্যাড়া একটু দুষ্টু বটে, তবে বড় হয়ে ও ভালো লোকই হবে।' অনেক সময় শরতের অনেক দুষ্টুমি না-দেখার ভান করতেন, কারণ পড়াশুনায় শরৎ অত্যন্ত ভালো ছিল। দ্বিতীয়ত পুত্র কাশীনাথের পরম বন্ধুও ছিল শরৎ। সেই স্কুলেই কাশীনাথের বন্ধুর বোনও পড়ত। না-জানি কেমন করে দুজনের বন্ধুত্ব হয়। তারপর থেকে একসঙ্গে বেড়ানো, পুকুরে নদীতে মাছ ধরা, নৌকো করে বেড়ানো, বাগানের ফলপাকুড় চুরি করা, ঘুড়ির সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করা, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, সব রকম শিশুসুলভ কাজে সেই মেয়েটি শরতের সঙ্গিনী ছিল। তার আসল নামই বা কি ছিল কেউ জানত না কিন্তু সুবিধের জন্য তাকে সবাই ধীরু বলেই ডাকত। ধীরুর একটি শখ ছিল, করমচার সময় শরৎকে করমচার মালা তৈরি করে দিত। মাল্যদানের অর্থ সেই মেয়েটি তখনও পর্যন্ত জানত না। কিন্তু সময়ের দেবতা একদিন দুজনকে এ-রহস্য নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দুজনের সম্পর্কও তো কম রহস্যময় ছিল না। গরমের দিন। একদিন হল কি শরৎ দেবদাসের মতই পাঠশালার ঘরের একটি কোণে ছেঁড়া মাদুরে বসেছিল। হাতে শ্লেট নিয়ে একবার চোখ খুলে, একবার বন্ধ করে পা-ছড়িয়ে বসে হাই তুলছে। হঠাৎই তার মনে হল ঘুড়ি ওড়াবার এটাই উপযুক্ত সময়। ক্ষণিকের যুক্তি কাজে লেগে গেল। পাঠশালায় তখন জলপানের ছুটি। বাচ্চারা নানা খেলায় কলরবে মত্ত। শরৎ শাস্তি পেয়েছিল তাই তার ছুটি

ছিল না। একবার পাঠশালা থেকে বেরুলে আর সে ফিরত না। ক্লাসের মনিটার ভোলুর রক্ষণাবেক্ষণে পড়া তৈরীর নির্দেশ ছিল তার উপর। শরৎ দেখল পণ্ডিতমশাই ঘুমুচ্ছেন আর ভোলু ভাঙা বেঞ্চিতে এমন কায়দায় বসে যেন ঠিক পণ্ডিতমশাই। শ্লেট পেন্সিল নিয়ে শরৎ ভোলুর কাছে গিয়ে বলল, 'এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি না।' ভোলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'দেখি শ্লেট দেখি।' ভোলু অঙ্ক কষায় মন দিয়েছে, অমনি একটা অঘটন ঘটল। হঠাৎ ভোলু বেঞ্চের পাশে রাখা চুনের গাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর শরতের টিকিটুকুও ত্রিসীমানায় দেখা গেল না। ধীরু এইসব দেখে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। পণ্ডিতমশাইয়ের ঘুম ভেঙে গেল। ভোলুর চেহারার অবস্থা তথৈবচ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চুনকাম-করা ভূতের মতই তাকে লাগছিল। কান্নাও তার বন্ধ হচ্ছিল না। পণ্ডিত মশাইয়ের বুঝতে দেরি হল না। বললেন, 'ওই শরৎ হারামজাদাই ধাক্কা মেরে পালিয়েছে।' ভোলু কোনরকমে কেঁদে ককিয়ে বলল, 'হ্যাঁ'। এরপর যেভাবে শরতের খোঁজ করা হল, তা কোন ছোটখাট সৈন্য আক্রমণের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। নানা ধরনের আলোচনা করতে করতে বাচ্চারা তাকে খুঁজছিল, কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারছিল না। যে-কেউ তাকে ধরার চেষ্টা করছে তাকেই শরৎ ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। ধীরু সবকিছুই লক্ষ্য করছিল। সে একথাও জানত এ সময় শরৎ কোথায় থাকতে পারে। কিছুক্ষণ পর সে আঁচলে খানিকটা মুড়ি বেঁধে জমিদারদের আম-বাগানে ঢুকল। শরৎ যেখানে একটা বাঁশের মাচায় বসে তামাক খাচ্ছিল। ধীরুকে দেখেই বলল—'দে, কি এনেছিস?'

বলতে বলতে আঁচল থেকে মুড়ি তুলে খেতে শুরু করল। শরৎ খাচ্ছিল আর ধীরু পণ্ডিত-মশাইয়ের তর্জন-গর্জন শোনাচ্ছিল। হঠাৎই শরৎ বলে উঠল, 'জল এনেছিস?'

ধীরু বলল, 'না জল তো আনিনি।'

শরৎ রাগ করে বলল, 'তো যা এখন গিয়ে নিয়ে আয়।'

এভাবে কথা বলাতে ধীরুর ভাল লাগল না, তাই বলল—'আমি এখন আর যেতে পারব না, তুমি গিয়ে জল খেয়ে এসো।'

'আমি এখান থেকে যেতে পারব না, তুই গিয়ে নিয়ে আয়।'

ধীরু কিন্তু উঠল না।

রেগে গিয়ে শরৎ বলল,—'যা, আমি বলছি যা।'

ধীরু একথা শোনার পরও চুপ করে রইল। শরৎ ওর পিঠে একটা ঘুঁষি মেরে বলল,—'যাবি কি না?'

ধীরু কেঁদে ফেলল, ওঠবার সময় বলল, 'আমি তোমার মাকে গিয়ে এখুনি সব বলে আসছি। এ কথাও বলে দেব যে তুমি তামাক খাচ্ছিলে।'

'যা বল গিয়ে, মরগে যা।' সেদিন শরৎ মার হাতে প্রচণ্ড মার খেলো। আর ধীরুও শরতের হাতের বেদম প্রহার পেল।

তবুও দুজনের বন্ধুত্বে ছেদ পড়েনি, ক্রমশঃ তা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন পরে শৈশবের ওই সঙ্গিনীকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র নিজের কয়েকটি উপন্যাসের নায়িকা সৃজন করেন। 'দেবদাসের পারু', 'বড়দিদির মাধবী', এবং 'শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী' এসবই তো ধীরুরই পরিমার্জিত বিকশিত বিরাট রূপ। বিশেষ করে 'দেবদাসে' যেন নিজের শৈশবকেই মূর্ত করে তুলেছেন।

দিনের পর দিন কেটে যায়। এই দুটি বালক-বালিকার আমোদ আহ্লাদের যেন শেষ ছিল না। সারাদিন রোদে ঘুরে বেড়ানো, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে মার-খাওয়া আর রাতে নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়া। পরের দিন আবার সকাল থেকে বেড়িয়ে-বেড়ানো, সন্ধ্যায় তিরস্কার, রাতে শোওয়া। এমনি করে প্রতিদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। ওদের আর কোন সঙ্গী সাথী ছিল না, প্রয়োজনও বোধহয় ছিল না। সারা গ্রামে উপদ্রব করে বেড়ানোয় এই জুটি দুটিই যথেষ্ট ছিল। মাছধরা, নৌকো-চড়া ছাড়াও মাঝে-মাঝে শরৎ যাত্রাদলে গিয়ে ঠেকা দিত। মধুর গলার জন্য যাত্রাদলেরও উপকার হত। তাও যখন একঘেয়ে লাগত তখন একটা গামছা কাঁধে করে বেরিয়ে পড়ত। এই বেরিয়ে পড়া বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা ছিল না বরং একেবারেই অন্য ধরনের ছিল। তাও যখন শেষ হয়ে যেত তখন ক্লান্ত চরণে, শ্রান্ত দেহ ও অবসন্ন মন নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসত। আবার পাঠশালায় যেত, 'পদ্যপাঠ' ও 'বোধোদয়ে' মনোনিবেশ করত। আবার একদিন দুষ্টু সরস্বতী কাঁধে চাপত। আবার শুরু হত যাত্রাদলে ঘোরা ফেরা, আবার একদিন সবকিছু পিছনে ফেলে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা।

সেদিন সে সরস্বতী নদীর ঘাটের কাছে এসে দেখে যে একটা ডিঙ্গি রয়েছে। ব্যাস্ অমনি তাতে চড়ে বসে তিন চার মাইল দূরের কৃষ্ণপুর গাঁয়ে পৌছল। কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ বাবার প্রসিদ্ধ আখড়া ছিল। শরৎ সেখানে গিয়ে কীর্তন শুনত। শুনতে শুনতে রাত হয়ে যেত, বাড়ি ফেরা আর হয়ে উঠত না।

পরের দিন মোতিলাল খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আসতেন। শরতের এ যাত্রাভিযান শুধু একদিনের ছিল মনে হয় না, হয়ত কোন বড় যাত্রার এ-শুধু পূর্বাভাস। কখনও একা, কখনও বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ত।

এই সময়েই সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য গ্রামে একটি বাংলা স্কুল খোলেন। এখানে যদি মন লাগে, এই ভেবে শরৎকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শরতের কার্যপ্রণালীতে কিছু রকমফের দেখা গেল না। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। এদিকে এই সময়েই মোতিলাল ডিহরী-অন-শোনে চাকরি পান। বাবার সঙ্গে শরৎও কিছুদিন সেখানে ছিল। যদিও সারাটা সময় খেলাধুলো করেই কাটত। ডিহরী-অন-শোনে একটা খাল ছিল, তার ধারে ঘিরনী কুড়িয়ে বেড়াত বা ফাঁস লাগিয়ে গিরগিটি ধরে বেড়াত। কখনও আবার ঘাটের উপর চুপটি করে বসে কল্পনায় ডুবে যেত। সবরকম দুষ্টুমির মধ্যেও তার অন্তর্মুখী স্বভাব নিরন্তর বিকশিত হচ্ছিল। ডিহরী-অন-শোনের এই অল্পমেয়াদী প্রবাসের কথা তিনি কোনদিন ভুলতে পারেননি। তাই 'গৃহদাহ'-তে এই নগণ্য জায়গাটিকে অমর করে গেছেন।

দেবানন্দপুরে ফিরে শরৎ আর এক নতুন খেলায় মেতে উঠল। সরস্বতী নদী, ছোট্ট কূল-উপচানো নদী। ঘাটগুলোও তার চওড়া নয়। কোমর অবধি জলে শ্যাওলা জমে থাকত। যেখানে শ্যাওলা কম সেখানে ছোট ছোট মাছেরা খেলা করত। কঞ্চিতে আটার গুলি দিয়ে জলে ডুবিয়ে বসে থাকত। একদিন পাড়ার নয়ন বাগ্‌দী এসে ঠাকুমাকে বলল—'মা আমায় পাঁচটি টাকা দাও, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে সে আমি শোধ করে দেব। একটা ভালো গোরু কিনব। বসন্তপুরে সম্পর্কে এক ভাই থাকে সে বলে পাঠিয়েছে।' ঠাকুমা পাঁচটি টাকা দেওয়াতে নয়ন বাগ্‌দী প্রণাম করে যেতে হঠাৎই শরতের মনে পড়ল, যে বসন্তপুরে ছিপের জন্য ভাল বাঁশ পাওয়া যায়। ব্যাস্ অমনি নয়ন বাগদীর পিছু নিল। এক মাইল চলার পর নয়ন বাগদী শরৎকে দেখে রেগে গেল, আবার লোভও দেখাল, কিন্তু শরৎ কোন কথাই গ্রাহ্য করল না। বাধ্য হয়ে নয়ন বাগদী জোর করে শরৎকে ধরে ঠাকুমার কাছে দিয়ে বলল, 'রাস্তা ভালো নয়। বিপদের ঝুঁকি আছে। গোরু সামলাবো না একে সামলাবো।' ঠাকুমা বিপদের কথা জানতেন, তাই শরৎকে বললেন, 'তুই যাবি না। আর যদি গিয়েছিস শুনতে পেয়েছি তাহলে পণ্ডিত মশাইকে বলে দেব।' নয়ন চলে গেল। শরৎও পুকুরে নাইতে যাবে বলে ভালো

করে সারা গায়ে তেল মেখে কাঁধে গামছা ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধার দিয়ে বন জঙ্গল আম কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়ে প্রায় দু-আড়াই মাইল দৌড়ে চলে এল এবং যেখানে গ্রামের কাঁচা সড়ক গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক-রোডে গিয়ে মিলেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরই নয়ন এসে হঠাৎই শরৎকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভারি অবাক হল। কিন্তু এতদূর এসে আর ফেরা যায় না। হেসে বলল, 'বেশ দেবতা বেশ চলো এবার। ভাগ্যে যা আছে সে না হয় দেখা যাবে।' বসন্তপুরে নয়নের পিসি শরৎকে খুব আদর যত্ন করলেন। নয়ন পেল গোরু আর বালক শরৎ পেল বাঁশের কঞ্চি। টাকাও পিসি ফেরত দিল। ফেরার সময় সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। দু-ক্রোশ চলার পরই আকাশে চাঁদ দেখা গেল। রাস্তার দুপাশে বড় বড় অশ্বত্থ ও বটের গাছ অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করে রেখেছে। তারা যখন বড় রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল তখন ঝোপ-জঙ্গলগুলো আরো ঘন নিবিড় হয়ে পড়েছে। এই জঙ্গলেই ঠেঙেলরা মানুষ মেরে তার সবকিছু কেড়ে-কুড়ে পুঁতে রাখত। পুলিস এর ত্রিসীমানায় আসত না। গ্রামের কেউ পুলিসে খবরও দিত না কারণ তাতে বিপদ আরো বেশী। বাঘের সামনে পড়েও দৈবযোগে কেউ কেউ বেঁচে যায় কিন্তু পুলিসের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। যেতে যেতে হঠাৎই একটা চিৎকার ভেসে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে লাঠিবর্ষণ আর তারপর সব স্তব্ধ। নয়ন বলল, 'বেচারা শেষ হয়ে গেল। আমাদের এবার একটু সতর্ক হয়ে এগুতে হবে।' বালক শরৎ ভয়ে কাঁপতে লাগল। নিঃশ্বাস নিতেও ভয়। চারিদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন, ভালো করে কিছু দেখাও যায় না। নয়ন চিৎকার করে বলল, 'খবরদার বলছি বামুনের ছেলে রয়েছে আমার সঙ্গে, যদি লাঠি ছোঁড়ো তো তোমাদের কাউকেই আর বাঁচতে দেব না।' কোথাও থেকে কোন উত্তর এল না। কিছুদূর গিয়ে যে লোকটি চিৎকার করেছিল তার দেখা পাওয়া গেল। বেচারা একটি ভিখিরি। একতারা বাজিয়ে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াত। নয়ন আর থাকতে না পেরে বলল, 'নরকের কীট। তোরা শেষে একটা বৈষ্ণব ভিখিরির প্রাণ নিলি। ইচ্ছে করছে তোদেরও এমনি করে মেরে ফেলি।' এবার গাছের আড়াল থেকে জবাব এল, 'ধর্মের কথা রাখ! বাঁচতে চাস তো পালা এখান থেকে।'

'হারামজাদা, কাপুরুষ সব। আমি পালাব তোদের ভয়ে?' এই

না বলে নয়ন পকেট থেকে টাকা বার করে টনটন করে বাজিয়ে বলতে লাগল, 'দেখ আমার কাছে টাকা রয়েছে। সাহস থাকে তো কাছে আয়; নিয়ে যা। আমি নয়ন বাগদী।' কোন জবাব এল না। এবার নয়ন গালপেড়ে হেঁকে বলল, 'কিরে? আসবি, না আমি বাড়ি যাব?' তবুও কোন উত্তর নেই। রাস্তার উপর কয়েকটা লাঠি পড়ে ছিল। নয়ন সেগুলো তুলে নিল এবং কিছুদূর এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, 'না ভাই চোখের উপর বৈষ্ণব হত্যা দেখে এই হত্যাকারীদের শাস্তি না দিয়ে আমি যেতে পারব না।'

ছোট্ট শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কি করবে?'

নয়ন বলল, 'আমি কি ওদের একটাকেও ধরতে পারব না? তারপর দুজনে মিলে লাঠির ঘায়ে তাকে মেরে ফেলব।' মারতে মারতে মেরে ফেলার কথায় বালক শরতের মন প্রসন্ন হল। বলল, 'নয়নদাদা তুমি ওকে বেশ ভালো করে চেপে ধরে রেখো, আমি একলাই ওকে মেরে মেরে ফেলে দেবো কিন্তু যদি আমার ছিপ ভেঙে যায়, তাহলে?' নয়ন হেসে বলল, 'ছিপের মারে মরবে না ভাই। এই নাও সোঁটা।' এই বলে ভালো দেখে একটা লাঠি সে শরতের হাতে তুলে দিল। লেঠেলরা ভেবেছিল এরা এতক্ষণে চলে গিয়ে থাকবে তাই ভিখিরিটার কিছু আছে কিনা খোঁজ নিতে বেরিয়ে এল।

নয়ন গাছের পিছনে লুকিয়ে ছিল। একজন দেখে ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কে?' সেই লোকটির চিৎকারে আর সবাই তো পালিয়ে গেল, কিন্তু ধরা পড়ল সে নিজেই। নয়ন তাকে আচ্ছা করে বেঁধে বালক শরতের কাছে নিয়ে এল। লোকটি হাপুস নয়নে কাঁদছিল। মুখে কালো ভুষি মেখে কোন কোন জায়গায় চুনের ফোঁটা লাগিয়েছিল। রাস্তার উপর শুইয়ে তাকে টেনে কয়েকটা লাথি লাগাল তারপর শরতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাও এবার লাঠি মারো।' বালকের হাত-পা কাঁপছিল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আমার দ্বারা হবে না।'

নয়ন বলল, 'তোমার দ্বারা হবে না যখন দাও লাঠিখান্ আমিই শেষ করে দিই এরে।'

শরৎ মিনতির স্বরে বলল, 'না নয়নদাদা আর মেরো না।' ততক্ষণে সেই লোকটি, যে বোধ হয় দু তিনদিন ধরে অন্নের মুখ দেখেনি, রাস্তার মাঝে এমন ভাবে পড়েছিল যেন মরেই গেছে। নয়ন নিচু হয়ে ওর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখে বলল, 'না মরেনি, অজ্ঞান হয়ে গেছে। চল ভাই আমরাও চলি।'

৬.

তিনবছর মামারবাড়ি ভাগলপুরে থাকার পর শরৎকে দেবানন্দপুরে ফিরে আসতে হয়। বারবার স্থান বদলের দরুন পড়াশুনোর ক্ষতি হত। বাউণ্ডুলে-পনাও বাড়ত, শুধু লাভের মধ্যে অনুভূতির ঝোলা ভারি হত। ভাগলপুরে থাকাকালীন হাজার দুষ্টুমির মধ্যেও ভাল ছেলে হওয়ার উদ্যমও কিছু কম ছিল না তার। লেখাপড়ায় ভালই ছিল। গাঙ্গুলী পরিবারের কঠোর অনু-শাসনের বিরুদ্ধে অন্তরে বিদ্রোহ জাগত, মনে প্রচণ্ড ইচ্ছে হত আমি কারো চেয়ে ছোট হতে চাই না। এই ইচ্ছের জোরেই ভালো ছেলেদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হত। আত্মচিন্তন ও লেখার অভ্যেসও এই ইচ্ছের দাবিতেই করত। শরৎ সুন্দর সুপুরুষ ছিল না। চোখদুটি ছাড়াতার আর কোন বিশেষত্ব ছিল না। চোখের দিকে চাইলে আর কেউ মুখ ফেরাতে পারত না। শ্যাম রং, রুগ্ন শরীর কিন্তু দৌড়বার সময় শক্ত পা দুটো যেন হরিণের ক্ষিপ্রতা পেত। বেড়ালের মতো অনায়াসে গাছে চড়তেও পারত। তীক্ষ্ণ মেধা, কিন্তু কঠোর অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যে হাঁফিয়ে উঠে অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথ বেছে নিত। দেবানন্দপুরে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতায় নিজেকে সে মাতিয়ে রাখল। এখানে অনুশাসনের বালাই ছিল না। কোন রকমে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করা হল।[১] দুক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হত। কাঁচা সড়ক, গরমে ধুলোয় ধুলোময়, বর্ষায় কাদায় ভরপুর। অভাবের দরুন স্কুলের মাইনেও সময়ে যোগাড় করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। গয়না বিক্রি করে এবং বাড়ি বাঁধা দেওয়া সত্ত্বেও অভাব মেটেনি। পেটেও তো কিছু দিতে হবে। তবুও কোনরকমে সে প্রথম শ্রেণীতে পৌঁছল।[২] এদিকে

---

১. ১৮৮৯ বা ১৮৯০—বর্তমান সময়ে সপ্তম শ্রেণী।

২. বর্তমান সময়ে দশম শ্রেণী।

পিতা ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে পারলেন না। আর ফি না দিলে স্কুলেই বা যাবে কী করে? প্রথম প্রথম কোন বন্ধুর বাড়ী একমুঠো ভাত খেয়ে স্কুলে যাবার পথে গাছের ছায়ায় দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটাত। এমনি করেই সে ছেলেদের দলের দলপতি হয়। লেখাপড়া তো বন্ধ হলই পরিবর্তে হাতে এল দুমুখ-খোলা ছুরি। এই ছুরিখানা নিয়ে দিবারাত্র ঘুরে ঘুরে বেড়াত। শরতের ভয়ে দলের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। পরের বাগানের ফল চুরি করে তা সে গরীব দুঃখীদের মধ্যেই ভাগ করে দিত। অপরের পুকুর থেকে মাছ চুরি করার অভ্যেস আগেও ছিল, এখন তা আরো বাড়ল। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিবেশীরা শরতের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল কিন্তু তাকে ধরে শাস্তি দেওয়া ছিল তাদের ক্ষমতার বাইরে, অবশ্য ফল এবং মাছ চুরি ছাড়া আর কিছু সে করত না। দ্বিতীয়ত, তার চুরির সামগ্রীতে বহু গরীব দুবেলা দুটো যা হোক খেতে পেত। গ্রামে গরীবের সংখ্যাই বেশী। একটি অতি দরিদ্র রুগ্ন লোক ছিল গ্রামে। রোগের চিকিৎসা করা ছিল তার সাধ্যের বাইরে। তাই একদিন লোকটি এই দলটির শরণাপন্ন হল। তৎক্ষণাৎ এরা প্রচুর পরিমাণে মাছ চুরি করে তা বিক্রি করে লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। উপেক্ষিত অনাশ্রিত রুগীদের সে নিজেই দেখাশোনা করত। বহুবার অন্ধকার রাতে হাতে লণ্ঠন আর লম্বা লাঠিখানা নিয়ে শহর থেকে সে ওষুধ কিনে এনেছে, ডাক্তার ডেকে এনেছে। তাই কিছুলোক তাকে অপছন্দ করলেও বহুলোক সত্যিই মনে মনে তাকে ভালোবাসত।

তা বলে শরৎ চোর ছিল না। ঘরে নিদারুণ অভাব, তবুও কখনও সে নিজের চিন্তা করেনি। সত্যিই সে রবিনহুডের মতো দুঃসাহসী এবং পরোপকারী ছিল। মাঝরাতে নিবিড় অন্ধকারে যখন রাস্তায় কুকুরও বেরুতে ভয় পেত তখন শরৎ চুপচাপ পূর্বনির্দিষ্ট বাগানে বা পুকুরে গিয়ে নিজের কাজ করে যেত। এই শুভ কাজে ওর কয়েকটি সঙ্গী ছিল। সদানন্দ তাদের অন্যতম। পুকুরের ধারে বাগানের পাশে উঁচু টিলার আড়ালে একটা গভীর খাদ ছিল। লুটের সামগ্রী সব এখানে এনেই জড়ো করত। তামাক খাবার সরঞ্জামও এখানে ছিল। এই দলের উৎপাত যখন চরমে পৌঁছল তখন সদানন্দের অভিভাবকেরা তাকে শরতের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করলেন। মিলন কোনদিন নিষেধের বাঁধন মানে না। তাই সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙ্গে না

এমন একটা উপায় তারা খুঁজে বার করল। সদানন্দের বাড়ির ছাত ঘেঁষে একটা বড় গাছ ছিল। সেই গাছ বেয়ে শরৎ সদানন্দের ছাতে পেঁ ৗছে যেত আর দুজনে মিলে খুব করে পাশা খেলত। তারপর নৈশ অভিযানে বেরিয়ে পড়ত। প্রাণভরে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ভালো ছেলেটির মতো নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়ত। যখনই তারা যেটি ভাবত অমনি তা সমগ্র মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে পূরণ করত। মাঝে মাঝে কোন মাঝির নৌকো নিয়ে কখনও বা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ বাবাজীর আখড়ায় যেতে সে ভোলেনি। এখানেই কোথাও তার বন্ধু গহর থাকত। 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের সেই আধপাগলা কবি, কীর্তনও ভাল গাইত। জানিনা সেখানের কোন বৈষ্ণবীর নাম কমললতা ছিল কি না, কিন্তু একথা খুবই সত্যি যে, কিশোর বয়সের এই বন্ধুটির ছাপ তার হৃদয়ে চিরদিন আঁকা ছিল। সাহিত্য সৃজনে কতবার না জানি এ চরিত্রটিকে তিনি নিজের লেখায় বাঁচিয়ে তুলেছেন।

'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বে কথাশিল্পী লিখেছেন—

'সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বন-বাদাড়ের মধ্য দিয়া এপথ-ওপথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশন চলিয়াছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাবার মত। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পেঁ ৗছিলে যখন হউক গাড়ি একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এপথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলা বড়, এখন কি করিয়া যেন সংকীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গেছে ; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ের বাগান। তাই ত বটে। এ যে আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার শেষ প্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মত এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

'গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মত, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরো পাঁচটা তেঁতুলগাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে

একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহু বর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মত চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছ? ভয় করে না ত?

'কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়। সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল। বিদায় লইয়া বলিলাম, 'ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।'

এই কথাগুলো লেখার সময় শৈশব যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনানো শরতের জন্মগত প্রতিভা ছিল। পনেরো বছর বয়সে সে এ-বিদ্যেয় অত্যন্ত পটু হয়ে যায়। গ্রামে গ্রামে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এ জন্যই স্থানীয় জমিদার নন্দগোপাল মুন্সী শরৎকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর ছাত্র অতুলচন্দ্র সে সময় কলকাতায় এম. এ. পড়ছিল। শরতের গল্প বলার বিদ্যেয় সে-ও অত্যন্ত প্রসন্ন হত এবং ছোট ভায়ের মত তাকে স্নেহ করত। কখনও কখনও থিয়েটার দেখাতে কলকাতাতেও নিয়ে যেত। কখনও কখনও বলত 'তুমি যদি এরকম গল্প লিখতে পার তাহলে আমি তোমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে থিয়েটার দেখাব।'

থিয়েটার দেখাবার পর আবার বলত—'আচ্ছা তুমি এর গল্প লিখতে পারবে?'

শরৎ এমন গল্প লিখে নিয়ে আসত যে অতুল চমকে যেত।

এই বকম লিখতে লিখতে শরৎ একদিন মৌলিক লেখায় হাত দিল। সেদিন কোন তিথি ছিল? কোন সময় কোথায় বসে যে লেখা শুরু করেছিল সে কথা কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু সেই গল্পটির নাম ছিল 'কাশীনাথ'। কাশীনাথ শরতের গুরুভাই ছিল। তাকেই নায়ক খাড়া করে এই গল্প লেখা সে শুরু করে। কিন্তু সে নামেই শুধু নায়ক। নায়কোচিত রূপ গুণ তার ছিল না কিন্তু ঘরজামাই কেমন হয় তা সে নিজের পিতাকে শ্বশুরবাড়িতে থাকাকালীন দেখেছে। গল্পের শেষটুকুও মনে হয় কোন জানা বা দেখা ঘটনা। বোধহয় তখন গল্পটির কলেবর ছোট ছিল। পরে ভাগলপুরে গিয়ে গল্পটিকে নতুন করে লেখেন। 'কাকবাসা' ও 'কোরেলগ্রাম' এ দুটি গল্পও সে সময়ের লেখা। আরো কয়েকটি গল্প সে নিশ্চয়ই লিখেছিল

কিন্তু কালের ক্রূর দৃষ্টি এড়িয়ে এই দুটিই টিকে গিয়েছিল। ছোট থেকেই শরতের মননশীলতার পর্যবেক্ষণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছিল। সে যা দেখত তার গভীরে যাবার চেষ্টা করত। এই অভিজ্ঞতাই তার প্রেরণা ছিল। গ্রামে ছিল একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। বালবিধবা। নাম তার নীরু। বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অত্যন্ত পরোপকারী, ধর্মশীলা, কর্মিষ্ঠ। এই নারী রোগে সেবা, দুঃখে সান্ত্বনা, অভাবে সাহায্য, প্রয়োজনে ঝি-গিরি, যে কোন কাজেই ছিল দ্বিধা-হীন। গ্রামে বোধহয় এমন কোন ঘর ছিলনা যে তার সেবা ও সাহায্য নেয়নি বা পায়নি। শরৎ তাকে দিদি বলে ডাকত। দিদিও শরৎকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এ মিল শুধু বোধহয় দুঃখকাতর মনের মিল। এই দিদির যখন বত্রিশ বছর বয়স তখন হঠাৎ তার পদস্খলন হয়। গ্রামের বিদেশী স্টেশন মাস্টার তার জীবনকে কলঙ্কিত করে কোথাও পালিয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা কিন্তু তার সমস্ত সেবা উপকার ভুলে গেল। মর্মান্তিক হৃদয়হীনতায় নীরুকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এমন কি তার সঙ্গে কথা বলাও লোকে পাপ মনে করত। লজ্জা, অপমান, আত্মগ্লানির ধিক্কারে বেচারী অসহায় হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য তো ভেঙে গেলই, একেবারে মরণাপন্ন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছল। তার মুখে একফোঁটা জল দেবার জন্য কেউ এগিয়ে এলনা। কেউ উঁকি দিতেও এলনা। যেন নীরু বলে এই গাঁয়ে কেউ কোনদিন ছিলনা। শরতের উপরেও ওদিক না-মাড়াবার নির্দেশ ছিল, কিন্তু শরৎ জীবনে কোনদিন কারো নির্দেশ মেনে চলেনি। রাতে লুকিয়ে গিয়ে দেখে আসত। পায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা ও মমতার স্পর্শ রেখে আসত। কোথা থেকে একটা কি দুটো ফলও নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসত। গ্রামের লোকদের হাতে এভাবে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েও নীরুদিদি কারও বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। নিজের লজ্জাতেই তিনি মরমে মিশে গিয়েছিলেন। নিজেকে অপরাধী মেনে নিয়ে এ শাস্তি তিনি মাথা পেতে হাসিমুখে সইছিলেন। হয়ত এই-ই নিয়ম। শরতের অনুভূতিপ্রবণ মন বুঝতে পেরেছিল ভুলের মাশুল তিনি নিজেকে নিজেই দিচ্ছেন। গ্রামের লোকেরা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। তাই তাদের তিনি ক্ষমা করেছিলেন, নিজেকে নয়। যখন তিনি মারা গেলেন তার লাশও কেউ ছুঁলনা। ডোমে তার শবদেহটি বনে বাদাড়ে কোথায় ফেলে এল। শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেল তার নিষ্প্রাণ দেহটিকে। আর এখানেই শরৎ 'বিলাসী' গল্পের কায়স্থ মৃত্যুঞ্জয়কে সাপুড়ে

হতে দেখেছিল। তাদের স্কুলেই সে পড়ত কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পর আর সে পড়েনি। এক কাকা ছাড়া তার আর কেউ ছিলনা। অথচ সেই কাকাই ছিল তার পরম শত্রু। তার বড় বাগানটির প্রতি কাকার লোভ ছিল। মরে তো আপদ চোকে, এই ভেবে সে অসুস্থ অবস্থাতেও মৃত্যুঞ্জয়কে দেখেনি। বেচারা মরেই যেত, যদি না একটা বুড়ো ওঝা ও তার মেয়েটি দেখাশোনা করত। এই মেয়েটির নাম ছিল বিলাসী। এই সেবার মধ্যে দিয়েই সে মৃত্যুঞ্জয়ের অনেক কাছে এগিয়ে এসেছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিয়ে করে। কিন্তু সমাজ-বিদ্‌রা এ-অন্যায় কেমন করে সইবে? তাই তারা মৃত্যুঞ্জয়কে সমাজ-বহির্ভূত করেন। তাতেও সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। যথেষ্ট লাঞ্ছনা, অপমান এমনকি প্রহার পর্যন্ত করা হয়। তবুও সে প্রায়শ্চিত্ত করেনি বা বিলাসীকে ত্যাগও করেনি। দূরের জঙ্গলে গিয়ে থাকা শুরু করল। সেখান থেকেই সাপ ধরে খেলা দেখিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করত। মাথায় গেরুয়া রংয়ের পাগড়ি, বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের আর কাঁচের মালা। কিন্তু কে বলবে যে, এ সেই কায়স্থদের ছেলে মৃত্যুঞ্জয়।

শরৎ লুকিয়ে চুরিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যেত। সাপ ধরা বা সাপের বিষ নামানোর মন্ত্রও তার কাছ থেকে শিখে নেয়। একদিন একটা বিষাক্ত সাপ ধরার সময় সাপটি মৃত্যুঞ্জয়কে কামড়ে দেয়। শত চেষ্টাতেও তাকে বাঁচানো গেলনা। সাতদিন পর্যন্ত মৌন থেকে বিলাসী আত্মহত্যা করেছিল।

এর বহু বছর পর কথাশিল্পী শরৎ লিখেছিলেন, 'বিলাসীকে যাহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিনী—অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।............শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এই মাত্র বলিতে পারি।'[১]

এ ধরনের ঘটনার তো শেষ ছিল না। এ সব দেখেই তার মনে হয়েছিল

১. শরৎ সাহিত্য, পঞ্চম ভাগ। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২১ (বিলাসী গল্প)।

মানুষের অন্তরে যে দেবতা আছে—কেমন করে নিজেরাই তার এত অনাদর করে ? এই প্রশ্ন তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে দেয় তীব্রতা ও সংবেদনা আর এই সংবেদনাই তাকে গল্প-লেখকে পরিণত করে। গল্প লেখার প্রেরণা সে অন্য একটি পথ ধরেও পায়। লুকিয়ে লুকিয়ে বাবার ভাঙাআলমারি খুলে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর 'ভবানীপাঠ' ইত্যাদি বইও পড়ে। এগুলো স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছিল না। মন্দ ছেলেদের যোগ্য অপাঠ্য বই একথাই শরৎ জানত। তাই চৌর্যবৃত্তি করে বইগুলি তাকে পড়তে হয় এবং বন্ধুদেরও পড়ায়। তাছাড়া মনে মনে গল্প রচনা করে অপরকে শুনিয়ে যথেষ্ট খ্যাতিও সে লাভ করেছিল।

বাবার লেখা গল্পগুলির কোনটাই সম্পূর্ণ ছিল না। খুব উৎসাহ নিয়ে সেগুলি পড়ত কিন্তু গল্প শেষ হবার আগেই বাবা শেষ হয়ে সে পথ অবরুদ্ধ করে গিয়েছিলেন। অসন্তুষ্ট হয়ে ভাবত 'বাবা এ লেখাগুলো কেন অসম্পূর্ণ রাখলেন ? যদি শেষ পর্যন্ত লিখতেন তাহলে কেমন হত ?'

মনে মনে এগুলির শেষ চিন্তা করে ভাবত, 'যদি আমি এই গল্পটি লিখতে পারতাম !'

বাবার এই অসমাপ্ত লেখাই শরৎকে প্রেরণা যোগাত। অভিজ্ঞতা-লাভের পথ তো অশেষ। সুমধুর কণ্ঠস্বর, আবার বাঁশি বাজাতেও পারত খুব সুন্দর। একদিন বিখ্যাত সলিসিটার গণেশচন্দ্র মহাশয় কোথা থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন। দেখেন যে ফার্স্ট ক্লাস কামরায় একটি তের চোদ্দ বছরের ছেলে বসে রয়েছে। জামাকাপড় হতদরিদ্র। অত্যন্ত স্নেহে কাছে ডেকে কথাবার্তায় জানতে পারলেন যে, ছেলেটি তারই এক বন্ধুর নাতি। সন্ত্রাসবাদী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পিতা অক্ষয়নাথ তাঁর বন্ধু ছিলেন। সম্পর্কে শরতের দাদামশায়। কলকাতা পৌঁছে শরৎকে অক্ষয়নাথের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

দেবানন্দপুরে থাকাকালীন শরৎ একবার বেশ কিছুদিনের জন্য পুরী যায়। একটি পরিবারের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভদ্রমহিলাটি শরতের থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। শরৎকে স্নেহও করতেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বিদেশে চাকরি করতেন। একবার তিনি খুব অসুস্থ হন। তখন শরৎ তার সহজাত স্বভাব অনুযায়ী সেবা করে। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির দরুন নিদারুণ গ্লানি নিয়ে শরৎকে বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়। চলার ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে। না আছে খাওয়ার সংস্থান, না থাকার সুবিধে, ফলে ভয়ানক

জ্বরে পড়ে একটা গাছের তলায় তাকে অসহায় ভাবে আশ্রয় নিতে হয়। সে সময়ে এক বিধবা তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। বোধহয় আর্ত হয়ে একটু জল চেয়ে থাকবে বা তার গোঙানি শুনে মহিলাটি কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে চমকে ওঠেন। বলেন, 'হে ভগবান! তোর যে বড় জ্বর।' মহিলাটি শরৎকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। দিনকয়েক স্নেহপূর্ণ সেবা-শুশ্রূষার পর আরোগ্য লাভ করে শরৎ আবার জ্বরে পড়ে। বিধবা মহিলাটির এক ভগ্নীপতি ও একটি দেওর ছিল। একদিকে বৌদির উপর দেওরের ঝোঁক, অপরদিকে ভগ্নীপতি ভাবত শ্যালিকার উপর তারই একমাত্র অধিকাব। মহিলাটি কিন্তু কারও কাছেই থাকতে রাজী না। একদিন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শরৎকে বললেন, 'তুমি তো ভালো হয়ে গেছ। চলো তোমার সঙ্গে আমিও ঘুরে আসি।' দুজনে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ল। এই বেরিয়ে পড়ার মধ্যে ছিল শুধু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু যেই তারা কিছুদূর এগিয়েছে অমনি সেই বিধবার দুই প্রেমিক সেখানে পৌঁছে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে শরৎকে বেধড়ক মেরে ক্রন্দনরতা বিধবাটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। এরপর তার যে কী হল তা শরৎ কোনদিন জানতে পারেনি। কিন্তু একথা সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, একে অপরের প্রতিপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মন্দ লোকদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা ঐক্য থাকে কিন্তু সৎলোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন বিচ্ছিন্ন। কথাশিল্পীর বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীন'-এর আধার-টুকু বোধহয় এই ঘটনাগুলোই। এগুলোই উপন্যাসটি রচনার উপাদান যোগায়।

পুরীর পথে আবার তার যাত্রা শুরু হল। পথের আতিথ্যে এমন বিকৃত কুৎসিত চেহারা নিয়ে সে বাড়ি ফিরল যে তাকে চেনাই দায়। জনশ্রুতিতে শোনা, বিখ্যাত গণিতবিদ্ পি. বসুর বাড়িতে শরৎ আতিথ্য গ্রহণ করে। দু-একবার চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়ে। হয়ত অত্যন্ত দুঃসাহসী হওয়ার দরুনই নানা গুজব তার বিষয়ে শোনা যেত। মনের কথা কাউকে কোনদিন বলত না। অভিনয়ে তো দক্ষ ছিলই, মিথ্যে কথা সত্যি বলে চালিয়ে দিতে সমান পটু ছিল।

এদিকে বাড়িতে ঠাকুমা গত হয়েছিলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে সংসারের মান বজায় রাখতেন। এখন যেন বিরাট এক শূন্যতা। ধার পাওয়ার তো শেষ আছে! হয়ত 'শুভদা'র কৃষ্ণা

পিসির মতই কেউ বলেছিল 'তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বলো, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।'

এই ভাবেই অভাব, অপমান ও দারিদ্র্য সইবার শক্তিও ভুবনমোহিনী ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছিলেন। যাবারও কি ছাই কোন চুলো আছে? মা-বাবা তো কবেই স্বর্গে গেছেন।[১] সংসার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। ভায়েদের আর্থিক সঙ্গতিও উৎসাহজনক নয়। তবুও দেবানন্দপুরে থাকা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তখন ভয়ে ভয়ে ছোটকাকা অঘোরনাথকে একটি চিঠি লিখিয়ে পাঠালেন। অঘোরনাথ লিখলেন, 'চলে এসো'। এরপর শরৎ আর দেবানন্দপুরে ফিরে আসেনি। মা ও ঠাকুমার চোখের জল ও রক্তে ভেজা এ গ্রামের পথঘাট। দারিদ্র্যের যে মর্মান্তিক নিদারুণ ছবি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র 'শুভদা' উপন্যাসটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, মনে হয় এই অভিজ্ঞতার জোরেই তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সাহিত্য সাধনার বীজ এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই অঙ্কুরিত হয়। এই প্রথম সে সংগ্রাম ও কল্পনার একত্র পরিচয়লাভ করে। এ গ্রামের ঋণে সে চিরঋণী।

১ মা ৮৯১। পিতা ১লা জানুয়ারী ১৮৯২।

৭

শরৎ যখন আবার ভাগলপুরে ফিরে এল[১] ততদিনে তার বন্ধুরা সবাই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে ভর্তি হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাছাড়া দেবানন্দপুরের স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনানোর পয়সাও ছিল না। এদিকে ভর্তি না হলে এ-বছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারবে না, দারুণ দুশ্চিন্তা। সৌভাগ্যবশতঃ স্কুলের এক শিক্ষক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা শ্রীবেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শরতের দাদামশায়ের বন্ধু ছিলেন। এই সম্পর্কে সে পাঁচকড়িবাবুকে মামা বলে ডাকত। হেডমাস্টার শ্রীচারুচন্দ্র বসু বড়ই সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। এদের কৃপাতেই শেষপর্যন্ত শরৎ স্কুলে ভর্তি হয়। এখানে এসে সে যেন একেবারেই থেকে গেল। কারও থেকে ছোট ভাবা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল. হীনমন্যতা তাকে কষ্ট দিত। তাই পরীক্ষায় পাসের জন্য রাত জেগে পড়া তৈরী করতে লাগল। ঘুম না আসার জন্য অনেকবার করে কফি খাওয়া শুরু করল।

পুরনো বন্ধুরা আবার তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। রাজু এদের মধ্যে অন্যতম। নীলা নামে একটি নতুন বন্ধুও তাদের জুটল। রাজু চন্দন কাঠের একটা বাক্সকে কী ভাবে যেন বইয়ের আলমারী বানাল। তিনপায়ার একটা ভাঙা চেয়ার ও একটা ছোট টেবিল যোগাড় করে পড়াশোনার পরিপাটি ব্যবস্থা করা হল। তক্তপোষের উপর বিছানার দারিদ্র্য, গায়ে দেবার একটা চাদর দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখা হত। খাটের নীচে একটা গড়গড়াও থাকত। খাটের মধ্যে দিয়ে বালিশের পাশে গড়গড়ার নলটা বার করে লুকিয়ে টান দিত। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'জননী ভুবনমোহিনী সারারাত প্রদীপ

১. ১৮৯৩।

জালাবার তেল জুগিয়ে উঠতে পারেন না। বন্ধু-বান্ধবেরা মোমবাতি দিয়ে যায়। আর, এককোণে একটা ষ্টোভ, একটি ছোট টিনের কেৎলি, একটি ছোট সোরাই আর মুখঢাকা গেলাস একটি।' এগুলোই শরতের সম্পত্তি ছিল। এ দৈন্য শরতের মনকে সংকীর্ণ করতে পারেনি। তার বিদ্যা-অভিযান মহা-সমারোহে রাজপুত্রের মতই চলত। নীলা আসত। তামাক সাজিয়ে বলত 'খা'। তামাক খেতে খেতেই দুই বন্ধুর গল্প চলত। সেদিন খুব ভোরে নীলা এসে শরৎকে জানলা দিয়ে ডাকতে গিয়ে দেখলে যে শরৎ ঘুমিয়ে আছে আর চাদর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে সে ডাকল, 'শরৎ, এই শরৎ।'

ঘুম কাতর চোখ দুটি মেলে শুয়ে শুয়েই সে জবাব দিল, শুয়ে আছি। ভেতরে চলে আয়। নীলা জিজ্ঞেস করল, তোর অসুখ করেছে ?

হ্যাঁ।'

'রক্তবমি করেছিস।'

'দূর পাগল।'

'তাহলে চাদরে এত রক্তের দাগ কেন ?' চমকে উঠে শরৎ দেখে যে সত্যিই রক্ত। বলল, 'ব্যাটা বেজির কাণ্ড। আবার আজ ইঁদুর মেরেছে।' নীলা এদিক ওদিক তাকিয়ে চমকে উঠল, বলল—'খুব বেঁচে গেছিস রে শরৎ। তোমার বেজি ব্যাটা গোখরো সাপ মেরেছে।' সারা বাড়িতে হল্লা ছড়িয়ে পড়ল। ভুবনমোহিনী মা মনসার পুজো দিলেন। প্রসাদ নিয়ে শরৎ বলল, 'যার জন্য প্রাণ বাঁচলো তাকে তো মা তুমি কিছুই দিলেনা।'

মা বললেন, 'নীলাকে তো প্রসাদ দিয়েছি।'

'নীলা বুঝি সাপ মেরেছে !'

'হায়রে কপাল। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে মা দুধকলা মেখে বেজির খোঁজে চললেন।

শরৎ বলল, 'মা বেজি কি তোমার কলা খাবে ? ওর মাছ চাই।'

তৎক্ষণাৎ মা বেজির জন্য দুধ ও মাছের ব্যবস্থা করলেন। সময়ে ঘুম না ভাঙার জন্যও পড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হত শরতের। একদিন নীলা একটা টাইম-পিস নিয়ে এল। শরৎ সজল চোখে বলল, 'নীলা তুই আমায় এত ভালবাসিস কেনরে ?' 'সে তো আমি জানিনা ভাই। সবাই একথা জিজ্ঞেস করে। একজন কেন অন্যজনকে ভালবাসে আমি ঠিক বলতে পারব না।' শরৎ বলল, 'তোর মন বড় নরম। অপরের দুঃখকে তুই অন্তর দিয়ে বুঝিস। তুই সবার

মত নয়। সেদিন আমায় বাদাম পেস্তা এনে দিলি, আর কাউকে দিলিনা কেন? তোর মধ্যে নারীসুলভ একটা মন রয়েছে।'

নীলা কপট ক্রোধে বলল, 'পাজি কোথাকার, আমায় নারী বলছিস?'

দুজনেই হেসে উঠল। নীলাও ভাল গান গাইতে পারত। একটা ভাল এসরাজও ছিল তার। পরীক্ষার পর এসরাজটিকে শরৎ নিজের কাছে এনে রাখে। যে ঘরটিতে ছেলেবেলায় বাচ্চাদের আটকে রেখে শাস্তি দেওয়া হত, সে ঘরটিকেই শরৎ সঙ্গীতশালা বানালো। একদিন ভোর-বেলাতে ওর ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসাতে ছেলে-মেয়েরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ দরজার কড়া ধরে নাড়তে শরৎ বাইরে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে আয়। ছোট দাদামশাই জানলে আর রক্ষে নেই।' সুরেন্দ্র ঘরের ভেতর এসে বসল। শরৎ এসরাজ বাজিয়ে গাইতে লাগল,—'মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী।'

কিছুক্ষণ শোনার পর সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার শরৎ।'

'আমার'।

'কিনেছিস?'

'না'।

'তাহলে'।

'নীলা দিয়েছে।'

'একেবারেই দিয়ে দিয়েছে?'

'দেখবার জন্য দিয়েছে।'

এই বলে এসরাজটিকে শরৎ অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলল। বলল, 'কাউকে বলিসনি, তোকেও শিখিয়ে দেব।' 'নীলা শরৎকে সত্যিই খুব ভালবাসত। কিন্তু বেশীদিন সে বাঁচেনি। পুলিসে চাকরি করত। হঠাৎই কলেরা হয়ে মারা যায়। সেই প্রথম বন্ধুটির বিচ্ছেদ তার মনে একটা গভীর দাগ রেখে গিয়েছিল।'[২]

সামনে পরীক্ষা, বাধারও যেন আর শেষ নেই। বড়মামা ঠাকুরদাসের মেয়ের কালাজ্বর হয় আর স্বভাবদোষে শরৎ সব ভুলে সেবা শুশ্রূষায় মেতে উঠল, তবুও মেয়েটি বাঁচেনি। শরৎ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিল, মনে হয়েছিল পরীক্ষায় সে বুঝি আর উত্তীর্ণ হতে পারবে না। পরীক্ষার ফিসও যোগাড়

২. শরৎ পরিচয়। পৃঃ ১০৭—সুরেন্দ্রনাথ

করা হয়নি। ভুবনমোহিনীরও দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। বড়ভাই ঠাকুরদাসের উপর অফিসের তহবিল গোলমাল করার অভিযোগে মামলা চলছিল। পরে অবশ্য তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। খরচেরও আর শেষ ছিল না। ছোটভাই বিপ্রদাসের আয় অল্প, সংসারের ভার তার উপর। তবুও সাহস করে ভুবনমোহিনী তাঁকেই বললেন। উত্তরে তিনি বললেন, ঘরে তো পয়সা নেই। কোথাও থেকে ধার করতে হবে, সে সময়ে ধার নেওয়ার জায়গা ছিল খঞ্জরপুরের গুলজারিলালের বাড়ী। স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ সেই মহাজন ভাগলপুর শাইলক্ নামে বিখ্যাত ছিল। বিপ্রদাস সরকারী-চাকুরে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করা সহজ ব্যাপার। তবুও সুদ নিয়ে যথেষ্ট হৈ-হুজ্জত করে অবশেষে চার পয়সা মাসিক সুদের হারে বিপ্রদাস টাকা ধার পেলেন। এই টাকার জন্যই শরৎ পরীক্ষায় বসতে পায়।[৩] পরীক্ষার পর যেন সে মুক্ত বিহঙ্গ। রাজুর সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় কাটাত। রাজু তখন পড়ালেখা ছেড়ে কাঠের কারবার দেখত। তার যেমন সুন্দর হাতের লেখা ছিল, তেমনই সে সুন্দর কাঠের খেলনা তৈরী করতে পারত। অদ্ভুত চরিত্রের এই রাজু শক্তিমান, বংশীবাদনে দক্ষ, ভাল অভিনেতা, কিন্তু নানা জনে নানা কথা তার বিষয়ে বলে। প্রতিভাশালী বংশে তার জন্ম, তাই সর্বতোমুখী প্রতিভা অনায়াসেই তার আয়ত্তে আসে। এই প্রতিভাই আবার তাকে কোন জায়গায় কোন একটা বিষয়ে টিকে থাকতে দিত না। নতুন অনুভূতির পেছনে তার মন ছুটত—গাঁজা, মদ, বেশ্যালয় সব কিছুতে থাকা সত্ত্বেও তার অন্তঃকরণ গঙ্গাজলের মতই পবিত্র ছিল। বদমাশ সে ছিলনা, ছিল শুধু দুঃসাহসী। যোগ ও আনন্দে সে পূর্ণ থাকত—যেমন গঙ্গাজল সবকিছুকেই করে তোলে পবিত্র। নিজের একটা নৌকো ছিল, সেটাতে করেই রাজু ঘুরে বেড়াত। কখনও কখনও অন্ধকার রাতে, ভরা-গঙ্গায় শরৎকে বলত, 'চল নৌকো চড়ে বেড়িয়ে আসি।' শরৎ ভয় পেত কিন্তু রাজু যে তার গুরু, অমান্যই বা করে কেমন করে? গতবছর ফুটবল খেলার মাঠে হঠাৎ দাঙ্গা বেধে যায়। তখন লাঠির জোরে রাজুর দলই শরৎকে বাঁচায়। সাপের কামড়ে অচৈতন্য হয়ে যখন সে পড়েছিল, তখনও এই রাজুই খরস্রোতা গঙ্গায় উজান ঠেলে ওঝা ডাকতে ছুটে গিয়েছিল। রাজুর প্রতি শরতের কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই। ব্যাস—খরস্রোতা গঙ্গায় ছোট্ট নৌকাটি ছেড়ে দিত, আর নৌকোয়

৩. ১ এই পরীক্ষা সোমবার ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩ আরম্ভ হয়।

ভেসে ভেসে একটা দ্বীপে এসে পেঁছত। এখানে গঙ্গা পুব থেকে উত্তরে বয়ে গেছে। ছেলেরা এখানেই মাছ ধরত। তারা সব একত্রে থাকত, দেহেও তাদের অসীম শক্তি। একদিন রাজু বলল, 'চল আজ মাছ চুরি করি।'

'মার খাবি যে।'

জবাবে রাজু বলল—'সে চিন্তা তোকে করতে হবে না। দেখা যাবে চল।'

দুজনে সেই দ্বীপে পৌঁছে মাছধরার অজুহাতে বসে রইল। তারপর জেলেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়তেই প্রায় দশ বারো সের মাছ তুলে নিয়ে পালাল। জেলেরা টের পেয়ে তাড়া করতেই দুজনে ততক্ষণে অড়হর ডালের খেতের ভিতর ঢুকে পড়ল। জল কম ছিল, নৌকো থেকে নেমে দুজনে নৌকোটি টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। সেই জায়গায় বড় বড় সাপ ছিল। রাজু সহসা শিউরে উঠতেই শরৎ জিজ্ঞেস করল—

'কী হল দাদা?'

'কিছু নয়, সাপ।'

শরৎ ভয় পেয়ে বলল—'সাপ!'

রাজু হাসল। বলল, 'আরে ভয় কি? সাপ নিজেকে রক্ষা করবে, আর আমরা নিজেদের। পৃথিবীর নিয়মই এই।'

বস্তুত: অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল তার। কেউ অন্যায় করলে শাস্তিও নিজের হাতে দিত। সে সময় কলের জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। বৌ-ঝিরা সবাই গঙ্গা থেকে জল তুলে নিয়ে আসত। স্নান-পাঠও গঙ্গার ঘাটেই হত। মেয়েদের জন্য আলাদা ঘাট হওয়া সত্বেও কখনও কখনও অসভ্য লোকদের টিটকিরি ও কুৎসিত ইঙ্গিতের দরুন মেয়েরা অসুবিধেয় পড়ত। একদিন এইরকমই হাসি-মস্করা করতে করতে মেয়েদের গায়ে তারা জল ছিটোতে লাগল। রাজু কোত্থেকে এ দৃশ্য দেখে কোন কথা না বলে একটি লোককে তারই গামছা গলায় বেঁধে গঙ্গার জলে একবার ডোবায়, একবার ওঠায়। আবার ডোবায়, আবার তোলে। ক্রমাগত এই নিদারুণ শাস্তির ফলে বেচারী কেঁদে অনুনয় করে বলে, 'ক্ষমা করে দাও, এই হাত জোড় করে বলছি।'

'আর কখনও এদিকে আসবে?'

'না, না, আর কখনও এদিক মাড়াব না।'

'ভগবানের দিব্যি গেলে বল।'

'ঠাকুরের দিব্যি। আর কোনদিন এপথে আসব না।'

'যা, মাফ করলাম।'

মোক্ষদা স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। বড়ই অল্প বেতন পেতেন তাই শিক্ষকতা ছাড়াও কিছু কিছু অন্য কাজও করতেন। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে দূর থেকে গোরা সাহেবের ঘোড়ার গাড়ির খুরের শব্দ শুনতে পান। অন্ধকারে দূরত্ব ঠাহর করতে পারেননি। কিন্তু বুঝতে পারলেন পিঠের উপর চাবুকের বর্ষণ চলছে। চমকে মুখ তুলে চাইতে না চাইতেই সাহেবের গাড়ি বিলীন হয়ে গেল। রাজু এই কাহিনী শোনার পর বলল, 'মাষ্টার মশাই আপনি বাড়ি যান। আর কালকের জন্য স্কুল থেকে ছুটি নিন। পরশু যা হবে তা আপনি শুনতেই পাবেন।'

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় একটা বড় দড়ি নিয়ে রাজু ও শরৎ দলবল নিয়ে সেই ছায়া পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঐ পথ ধরেই সাহেব রোজ ক্লাবে যেতেন। কিছুক্ষণ পরেই টমটমের শব্দ পাওয়া গেল। রাজু সঙ্গীদের সাহায্যে সড়কের দুধারের গাছের গোড়ায় দড়ি বেঁধে দিল। সাহেবের এসব কল্পনা করার কথা নয়। রোজকার মত সেদিনও তেমনই বিক্রমে ঘোড়ায় চেপে আসছিলেন। ব্যাস—আর যায় কোথায়। ঘোড়া গেল দড়িতে জড়িয়ে আর সাহেব ছিটকে মাটিতে আছড়ে পড়ল। রাজু তো এই-ই চাইছিল। মনভরে সাহেবকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বলল—'আর কখনও নির্দোষ পথচারীকে মারবে?'

'কোনদিনও নয়।'

'বলো, আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা কর।'

'যাও, বাড়ি যাও।'

সাহেব চুপচাপ চলে গেল। কিন্তু এ-ঘটনার জন্য তিনি এতই লজ্জিত হয়েছিলেন যে ভাগলপুরে আর থাকেননি। বদলি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।[৪] মাঘ মাসে ভাগলপুরে খুব শীত পড়ত। এই শীতের সময় বাংলা পণ্ডিতের স্ত্রী মারা যান। পণ্ডিত মশাই নিজেও রুগ্ন ছিলেন। একটি ছেলে, সেও নিতান্ত ছোট। দাহ-সংস্কার কেমন করে হবে সমস্যা। কোন স্কুলের হেড মাষ্টার মশাই এসব ক্ষেত্রে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতেন। তাঁকে খবর দেওয়াতে

৪. এই ঘটনাটির নানান বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু মূলত এটিই সত্য ঘটনা।

তিনি নিজের অনুচরদের নিয়ে দাহ করার ব্যবস্থা করলেন। এই শ্মশান যাত্রীদের মধ্যে রাজু ও শরৎ অন্যতম। তাদের মাঘের শীতেরও ভয় ছিলনা, না ছিল অন্ধকারের। সেদিন ঘোর অমাবস্যা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শ্মশান ঘাটও প্রায় দু-ক্রোশ দূরে। শব যাত্রা শুরু করবে এমন সময় টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লণ্ঠন তেমন সুলভ ছিলনা। হাঁড়িতে ফুটো করে তার ভেতর তেলের প্রদীপ বসিয়ে পথ নির্দেশ করা হচ্ছিল। বড় বড় পা ফেলে মুখে 'হরিবোল' ধ্বনি দিতে দিতে তারা এগোচ্ছিল। কিন্তু বৃষ্টি আরো জোরে পড়াতে নিমেষে পথঘাট সব জলমগ্ন হয়ে গেল। লাশও জলে ভিজে ভারী হয়ে উঠল। সবাই ভাবল মৃতদেহটি তেঁতুল গাছের তলায় খানিকক্ষণ নামিয়ে রেখে একটু বিশ্রাম করা যাক। এদিকে শিলাবৃষ্টি হতে লাগল। বসে থাকাও আর যায়না। কিন্তু মৃতদেহটির কী ব্যবস্থা করা যায়; ফেলেই বা কী করে যাওয়া যায়? তখন রাজু বলল, 'আপনারা সবাই যেতে পারেন। আমি একাই থাকব।' বহুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলে সবাই ফিরে এসে দেখল, মৃত দেহটি ঠিক রাখাই আছে শুধু রাজুর পাত্তা নেই। সবাই ভাবল রাজু বেশ ধাপ্পা দিয়ে কেটে পড়ল। কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই সবাই দেখল যে মড়াটা ধীরে ধীরে নড়ে উঠল। লোকেরা ভয়ে চিৎকার করে ছুট লাগালো, কিছুদূর এগিয়ে হাতে পইতে নিয়ে রামনাম জপ করতে লাগল। এদিকে লাশ নড়তে নড়তে প্রায় দাঁড়াবার জোগাড়। রামনামের তীব্র স্বর আরও তীব্র হয়ে উঠল, আর মড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। 'পালা-পালা' চিৎকার করে তারা সব পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু অট্টহাসির শব্দে পেছন ফিরে দেখে, শবের কফিনের ভেতর থেকে রাজু হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

'বাঃ বেশ ছেলে। দীর্ঘজীবী হও। এই তো পুরুষের ধর্ম।' রাজুর এসব দুঃসাহসিক কাজের সঠিক বিবরণ কারও কাছে নেই কিন্তু এ কথা সত্যি যে, রবিন হুডের মত চরিত্রও তার কাছে ম্লান মনে হয়। তার অমিত সাহস বোধহয় তার অজস্র দয়া-মায়ার ভিত আঁকড়ে বেড়ে চলছিল। অভাবী লোকের সে বন্ধু ছিল, আর দুর্বৃত্তের সে ছিল যেন সাক্ষাৎ যম। মৃত্যু-ভয়ও তার ছিলনা। বংশীবাদন ও সন্ন্যাসবৃত্তি দুটিতেই তার সমান দক্ষতা ছিল।

ছোটদের জন্য যে গল্পগুলি শরৎচন্দ্র লেখেন তার পেছনে এমন ঘটনার অবদান অনেক। তাঁর বৈঠকী গল্পে এমন ঘটনার অনেক নমুনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—'রাজু বেশি লেখাপড়া করেনি বটে, কিন্তু তার গুণ ছিল

অশেষ। ঐ বয়সে ঐ ধরনের অতবড় একটা আদর্শ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।'[৫] শরৎও কম দুঃসাহসী ছিলনা। রাজুর সাহচর্যে সে আরও দুর্দমনীয় নির্ভীক হয়ে উঠেছিল। ভাগলপুরে সে সময়ে খুব চুরি ডাকাতি হত। রাতে অস্ত্র নিয়ে সবাই সতর্ক হয়ে থাকত। রাজুর এক ভাই মণীন্দ্রনাথ তখন কলেজে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছিল তাই রাত জেগে তাকে পড়াশোনা করতে হত। তাদের বাড়িটি গঙ্গার ধারে বটগাছের পাশে ছিল। পড়ার ঘরটি গাছ ঘেঁষে ছিল। আশে-পাশে আগাছা কাঁটাবন তাতে সাপ ও বিছের সংখ্যাও ছিল অগুণতি। একদিন পড়তে পড়তে মণীন্দ্রনাথ জানলায় কোন আওয়াজ শুনতে পান। সতর্ক হয়ে উঠে দেখেন জানলার কাছ বরাবর একটি মানুষের মাথা যেন লুকোতে চাইছে। বন্দুক হাতে নিয়ে বোতাম টিপতে যাবেন, এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'মণি মণি। করছ কী? বন্দুক চালিওনা। এই যে আমি।'

'আমি কে?'

'আমি শরৎ।'

মণি একেবারেই অপ্রস্তুত। একটু পরে মণি জিজ্ঞেস করল, 'হে ঈশ্বর! এই শেষ রাতে ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে তুই কী করছিস?' 'কিছুই নয়। তোমাকে ভয় দেখাতে এসেছিলাম।' রাত প্রায় দুটো বেজে গেছে। বিষাক্ত সাপ বিছের ভয় ছিল না তার। দুঃসাহসে রাজুরই সমগোত্রীয় কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত তার কোন শরিক ছিলনা। মাথার বড় বড় চুল দেখে কেউ কেউ টিপ্পনী কাটতো—শরৎ বড় চুল রেখে রবীন্দ্রনাথের মত কবি হতে চাইছে।

রবীন্দ্রনাথ ততদিনে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন, তাই নতুন কেউ সাহিত্যের ক্ষেত্রে পা দিলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের উপমা দেওয়া হত। 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী' শরতের পড়া ছিল। উপন্যাস বা সাহিত্যে এর পরও কিছু থাকতে পারে, একথা সেদিন সে ভাবতে পারেনি। 'বাসা' বা 'কাকবাসা' শরতের প্রথম উপন্যাস।[৬] মামা সুরেন্দ্রনাথ লুকিয়ে শরতের লেখা ধরে ফেলেছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখত শরৎ লিখে চলেছে। পরে অবশ্য গল্পটি শরতের পছন্দ হয়নি। বাপের মতই গল্পটি পড়বার পর মনে মনে

৫. শরৎচন্দ্র। পৃঃ ২৯৫। গোপালচন্দ্র রায়

৬. ১৮৯৪

ভেবেছিল, এটা কি রবীন্দ্রনাথের মত হয়েছে? না হয়নি। তবে আর লিখেই বা কী হবে? লিখি যদি তবে তাঁরই মতো লিখব, নইলে নয়।

তারপর একদিন গল্পটি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। 'কাশীনাথ' উপন্যাসটিকেও শরৎ যোগ্য মনে করেনি। দেবানন্দপুরে যাবার সময় কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছিল, ভাগলপুরে এসে সেগুলোই কেটেকুটে বাড়াচ্ছিল। 'কোরেল গ্রাম' গল্পটিও দেবানন্দপুরে শুরু করেছিল। কিন্তু এই নামে গল্পটি কোনদিন ছাপা হয়নি। লেখার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছিল, মনে মনে চিন্তা করত এ সংসারের যা কিছু দেখছি, শুনছি তাকে কি কোন রূপ দেওয়া যায় না? প্রথম প্রথম এ গল্প সে গল্প থেকে চুরি করে লিখত। কিন্তু জীবনের পাঠশালায় অভাবের অগ্নিযজ্ঞে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল; সেই অভিজ্ঞতাই তার লেখনীকে শক্তি যুগিয়েছিল। একবার সাধুদের দলে যোগ দেয়, সেও বোধহয় অভিজ্ঞতা লাভের নেশাতেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানা ধরনের গল্প শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেসও করত, 'কেমন লাগছে রে?' বেচারী বাচ্চারা সত্যিই কিছু বুঝতে পারত কি না কে জানে কিন্তু এই অদম্য সাহসী গল্প বিশারদকে অনায়াসে বলত—'খুব ভাল লাগছে দাদা।'

রাজলক্ষ্মীও তো 'শ্রীকান্তের' বিষয়ে সেই কথাই বলেছে 'আশ্চর্য কি আনন্দ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যের উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।'[৭]

৭. শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব।

৮.

এইভাবে সাহিত্য সৃজন এবং দুঃসাহসী ক্রিয়া-কলাপের মধ্যেই একদিন প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন এড়িয়ে শরৎ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়।[১] এবারে কলেজে পড়ার পালা। কিন্তু চিরদিনের সেই অভাব। ফিস দেবার টাকা কোথায়? প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিস দেবার ক্ষমতা যার ছিল না, কলেজে পড়বার সামর্থ্য তার কোথা থেকে আসবে। কিন্তু মার যে বড় সাধ, ছেলে আমার বড় হবে। কারো কাছেই তিনি নত হননি। শেষ পর্যন্ত ছোট দিদিমা কুসুমকামিনী শরৎকে রক্ষা করেন।

স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ির ছোট ছেলেদের পড়াবার ভার শরতের উপর দিলেন। পরিবর্তে সে পেত কলেজের মাইনে এবং বইপত্রের খরচ। মামাদের সবাইকে পড়াবার পর সে নিজে পড়তে বসত। রাত প্রায় একটা বেজে যেত। ঘুমে চোখ ঢুলে আসত। ভোরে ওঠা কোনদিনই তার ভাল লাগত না। মাঝে-মাঝে রাজুর সঙ্গে নৌকো করে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়ত। ফিরতে রাত হয়ে যেত। সকাল বেলাই আবার মামারা পড়তে আসত। শুয়ে শুয়েই গড়গড়ায় টান মেরে পড়াত। মাঝে-মাঝে ঘুমে চোখ বুজে আসত। তবুও এরকমভাবেই চলে যাচ্ছিল। সেদিন কলেজে প্রথম বর্ষের বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছিল। ছাত্রদের সবাইকে ডেকে শরৎ বলল, 'কাল আমার পরীক্ষা, আজ আমি পড়ব। আমায় কেউ বিরক্ত কোরনা। যা জিজ্ঞেস করবার, কাল সকালে জিজ্ঞেস কোর।' সবাই চলে যেতে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে মোটা-মোটা বিজ্ঞানের বই নিয়ে পড়তে বসল। সকালে ছাত্রের দল ঠিক সময়ে হাজির হয়ে দেখে যে ল্যাম্প জলছে আর শরৎ একমনে পড়ে চলেছে। এদের হট্টগোলে চমকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মানা করেছিলাম

১. ১৮৯৪ সালে

না আজ রাতে আমায় কেউ বিরক্ত কোরনা, কাল আমার পরীক্ষা, যাও আমি পড়াতে পারব না। কেউ যদি একটা কথা শোনে।'

বেচারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন এক মামা-ই সাহস করে বলল যে, সে তো কালকের কথা, ভোর হয়ে গেছে।

জানলা খুলতেই সোনালী রোদে ঘর ভরে গেল। পড়াশোনায় এমনই মগ্ন ছিল যে কোন হুঁশ ছিল না তার। তাই তো পরীক্ষার খাতা দেখে অধ্যাপক মশাই অবাক হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন শরৎ নিশ্চয় বই থেকে নকল করেছে। এজন্য নতুন করে প্রশ্নপত্র তৈরী করে শরৎকে দিয়ে বলেন, 'এই প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।' মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে শরৎ অধ্যাপক মহাশয়কে আরো অবাক করে দিয়েছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল তার। তবুও খেলাধুলো এবং রাজুর সঙ্গে অনির্দিষ্টভাবে বেড়িয়ে বেড়ানো, আতুর দুঃখীর সেবা ইত্যাদিতেই বেশিরভাগ সময় তার কাটত। পড়াশোনার সময় অতি অল্পই ছিল। এই সব দেখে-শুনে ভুবনমোহিনী বড়ই ব্যথা পেতেন কিন্তু কোন উপায়ই তাঁর জানা ছিল না। ক্রমশঃ ভাল ছেলেদের তালিকা থেকে শরতের নামটি ধূসর হতে থাকে।

এই সময়েই শরতের মায়ের মৃত্যু হয়।[২] নিদারুণ দারিদ্র্যে এই সরলপ্রাণা সতী-মা কেমন করে স্বপ্নবিলাসী অকর্মন্য স্বামী ও সংসারের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সম্পন্নপরিবারের মেয়ে হয়েও বধূরূপে কোনদিন এতটুকু সুখও পাননি। সারাজীবনটাই তাঁর সংসারের পেটভরানোর খেলাতেই হারিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত সংসারের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নিয়তিতাড়িতা যথার্থ হিন্দু পতিব্রতার মতই একে একে নিজের সব গহনাগুলি বিক্রি করে দেন। বারংবার বাবা ও কাকাদের কাছে আশ্রয় ও অন্নভিক্ষা করেছেন। হয়ত এই আশায় বুক বেঁধে যে বড়ছেলে শরৎ মানুষের মত মানুষ হবে। জানিনা কতবার তিনি অসীম স্নেহে পুত্রকে বুকে চেপে বলেছেন, 'শরৎ বাবা আমার। আমি জানি শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও তুই বড় ভাল ছেলে। তুই মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আমি তোকে সাহায্য করব।' কিন্তু জীবনের শেষ লগ্নে বোধহয় এ আশাও তাঁর ভেঙে গিয়েছিল। অসময়ের বার্ধক্য, চতুর্দিকের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা তাঁর প্রাণটুকুই শুষে নিল। জীবনের কোন এক তিক্ত মুহূর্তে যখন মন অত্যন্ত অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠত তখন স্বামীর উপরে

২. নভেম্বর, ১৮৯৫ সাল।

কটূ মন্তব্য করে ফেলতেন। তবুও আত্মভোলা কুঁড়ে স্বামীটিকে তো হিন্দুরমণীর ঐকান্তিক ভালবাসাই দিয়েছিলেন। 'শুভদা'ও তো তাই করেছিল। 'স্বামীসুখ সে একদিনের জন্যও পায় নাই, অন্তত তাহার মনে পড়ে না। সে স্বামীর মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না; আনন্দে চোখের কোণে জল আসে।'[৩]

আর 'শ্রীকান্তের'র অন্নদাদিদি, যদিও সে চরিত্র যতই স্বাভাবিক হোক, তবুও যতবারই সে অন্নদাদিদির সতীত্বের মহিমা বলতে চেয়েছে, ততবারই যেন মা তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছেন। শ্রীইলাচন্দ্র যোশীজীর প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'অন্নদা দিদির উপর সত্যিই আমার ভারি শ্রদ্ধা। আমার জন্মগত সংস্কার হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এটুকু অনায়াসে বলতে পারি তার একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি বরং তার প্রেম-প্লাবিত আত্মার মুক্ত প্রবাহ মুগ্ধ করেছে।' ভুবনমোহিনী এই প্রেম-প্লাবিত আত্মার সার্থক প্রতিচ্ছবি। সম্পূর্ণ শরৎ-সাহিত্যই তো এই প্রেমপূরিত আত্মার মুক্ত প্রবাহে সিঞ্চিত। মা ডাকে যে কমনীয়তা, ত্যাগ, বাৎসল্য ও বিরাট দায়িত্ব লুকিয়ে আছে—তাকেই লেখনীর মাধ্যমে মূর্ত করতে জীবনের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত খরচ করেছে না শরৎ। তাঁর বাৎসল্য, স্নেহ শুধু যে পেটের সন্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়—নারায়ণী, বিশ্বেশ্বরী, হেমাঙ্গিনী, বিন্দু সকলকেই শরৎ মাতৃত্বের মহৎ স্নেহধারায় মহিমান্বিত করেছেন, যাঁদের আপন কোন সন্তান ছিল না।

ভুবনমোহিনী পিত্রালয়ে আজীবন শুধু এই মাতৃস্নেহ নিয়েই সবাইকে কাছে টেনেছেন। বোধহয় সেই কারণেই শরৎ শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও মাকে গভীরভাবে ভালবাসত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হবার পর মা বলেছিলেন, 'তোকে তারকেশ্বরে যেতে হবে, তোর চুল দেব, মানত করেছিলাম।'

খুব শখ করে বড় বড় চুল রেখেছিল শরৎ। এগুলো কেটে ফেলতে হবে, কল্পনা করতেও কান্না পাচ্ছিল। কেমন দেখতে লাগবে তাকে ন্যাড়া মাথায়? 'না—না—এ চুল আমি কাটাব না, এত ভক্তি আমার নেই।' মা বললেন,—'কাটাস না! আমি অন্য ব্যবস্থা করব।'

'কি করবে মা।'

'নাপিত ডেকে নিজের চুলগুলো কাটিয়ে বাবা তারকেশ্বরে পাঠিয়ে দেব।'

৩. শুভদা

একটি কথাও না বলে সেই রাতেই শরৎ তারকেশ্বরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

ভুবনমোহিনী যদি মোতিলালের সহধর্মিণী না হতেন তাহলে বোধহয় বেশিদিন তাঁকে বাঁচতে হত না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। শরতের রোদ মিইয়ে এসেছে। সুতো বাঁধা চশমা চোখে দিয়ে মোতিলাল বহুক্ষণ ধরে একমনে বই পড়ে চলেছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মনেই তামাক সেজে নিয়ে এলে মোতিলাল কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'তুমি কেমন করে জানলে আমার তামাক খেতে খুব ইচ্ছে করছিল?'

ভুবনমোহিনী আদরভরা চোখদুটি স্বামীর দিকে মেলে বলতেন, 'কেমন করে যে বুঝতে পারি সে কি আমিই জানি।'

মোতিলাল খুশী হয়ে বলে উঠতেন, 'শুনছ, একটা বাতি দিয়ে যাও তো।'

ভুবনমোহিনী বলতেন, 'সারাদিন ধরে মাথা নিচু করে পড়ছ, যাও একটু বেড়িয়ে এসো।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোতিলালকে বেড়াতে যেতে হত। বাড়িতে শরৎ ছাড়া ছিল আরও ছোট দুটি ভাই প্রভাস ও প্রকাশ এবং একটি ছোট বোন সুশীলা। আদর করে সুশীলাকে সবাই মুনিয়া বলে ডাকত। বড়দিদি অনিলার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মারা যেতে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে মোতিলাল সত্যই যেন পঙ্গু হয়ে পড়লেন। অনেক কারণে শ্বশুরবাড়িতে থাকা আর সম্ভব হল না। 'দেবদাস'-এ শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'মাতুলের আশ্রয় সে অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে,—সেখানে তাহার কিছুতেই সুবিধা হইত না।'

শ্বশুরবাড়ি থেকে অনেক দূরে খঞ্জনপুরের কোন এক পাড়ায় গিয়ে মোতিলাল থাকতে লাগলেন। কিন্তু যিনি কোনদিন উপায় করতে শিখলেন না, তিনি কেমন করে সংসার প্রতিপালন করবেন? কাজেই হতাশা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ভুবনমোহিনীর অকালমৃত্যু শুধু যে মোতিলালকে ভেঙে দিয়ে গেল তা নয়, শরতের জীবনটাও যেন ভেঙে গেল। 'মা যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন, তা হলে আমাদের সংসার অনেক ভাল হতে পারত। আমার লেখাপড়া তাঁর আগ্রহ আর চেষ্টায় যা কিছু হয়েছে। আমাদের সংসার ভেঙ্গে গেল মার অকাল মৃত্যুতে।'[৪]

৪. শরৎ পরিচয়। পৃঃ ১৬৮ সুরেন্দ্রনাথ।

৯.

যে সময় শরৎ জন্মগ্রহণ করে সে-যুগ ছিল জাগৃতি ও প্রগতির যুগ। ১৮৫৭র স্বাধীনতা সংগ্রামের পরাজয় এবং সরকারের দমননীতির দরুন খানিকটা শিথিলতা এসে পড়ে কিন্তু সে যেন দারুন ঝড়ের পূর্ব-প্রশান্তি। সংগ্রাম আবার নতুন করে শুরু হল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' সংগ্রামেরই অভিব্যক্তি। এই উপন্যাসটি আধুনিক বাংলাকে নতুন করে জন্ম দিয়ে সারা দেশকে প্রেরণার শক্তি জুগিয়েছিল। অপরদিকে ১৮৫৭র সংগ্রাম অসফল হওয়ার দরুণ মানুষের দৃষ্টি রাজনৈতিক হট্টগোল থেকে সরে সামাজিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক আন্দোলন ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন কখনও সফলকাম হতে পারে না। সেজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে সারা দেশ সামাজিক আন্দোলনের ডাকে মুখর হয়ে উঠল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার প্রকট হল। তাঁরা মানসিক স্বাধীনতার এমনই বীজ বপন করলেন যাতে দেশের চেতনা যেন একটি নতুন পথ খুঁজে পেল। নানান রূপে নিজের অস্তিত্ব-প্রকাশে মেতে উঠল।

এ-বিষয়ে বাংলাদেশ আবার অগ্রণী। রামমোহন রায় রাষ্ট্রচেতনার জনক। তাঁরও দৃষ্টি প্রথমে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর কারণ বোধহয় সে-সময় পশ্চিমের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রসার দেশে ব্যাপকরূপে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসারে শাসক অপেক্ষা পাদরিরাই প্রত্যক্ষরূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ এই পাদরিদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাদের প্রভাবেই বাংলার সমাজচেতনার উত্থান এবং বিকাশ হয়। চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়তো রামমোহনের ছিল না কিন্তু ধর্ম প্রচারের জন্য শিক্ষা এবং সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার জন্য হিন্দু ধর্মের কু-রীতি ও প্রথা লোকের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বহু বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে ধর্ম সংস্কারের প্রশ্ন

জাগে। তখনকার যুগে ব্যক্তি ও সমাজের মূলাধার ছিল একমাত্র ধর্ম। ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজ সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে না। সেজন্য রামমোহন রায় ধর্ম সংস্কারের প্রতি সচেষ্ট হন। নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা, একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈত-বাদকে হিন্দু ধর্মেরই একটি শুদ্ধরূপ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়ে তিনি 'আত্মীয় সভা'র[১] স্থাপনা করেন। এই সভায় ধর্মচর্চা ছাড়া জাতিভেদ সমস্যা, সহমরণ, কুলীন প্রথা, পংক্তিভোজ, নিষিদ্ধ খাদ্য সমস্যা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক কু-প্রথার উপর বিচার করা হত। এইভাবে সমাজ সংস্কারের ধারা ক্রমশঃ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা-সমাজ, আর্য-সমাজ এবং থিয়োসফিকাল সোসাইটি ইত্যাদি সংস্থারও উদয় হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এগুলি সেই সময়েরই অবদান।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৪৩ বছর পর শরতের জন্ম। যখন সে দিশাহারা হয়ে পথের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং অন্তরে সাহিত্য প্রেমের তীব্র ব্যথা কুরে-কুরে খাচ্ছিল—তখনও অবশ্য সমাজ-সংস্কারকদের প্রদীপ্ত বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্য ও দেশপ্রেমে চতুর্দিক আলোকিত ছিল। এই মহামন্থনের প্রভাব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পড়ে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতীয় নারীর কষ্ট নিবারণ করার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর শ্রেয়স্কর কাজ হল, বিধবা বিবাহের সমর্থন। বহুবিবাহ এবং কুলীন প্রথাকেও তিনি উচ্ছেদ করেন। অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত শুধু বিচারোত্তেজনা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। পরে ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেন; তখন সামাজিক কুপ্রথাগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলেই সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট[২] অধিনিয়ম পাস হয়। স্ত্রী-জাতি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি পায়।

বাংলা দেশে এই নবচেতনায় হিন্দু কলেজের অবদান যথেষ্ট। যদিও এই কলেজটির স্থাপনা হয় শরতের জন্মের ৬০ বছর আগে।[৩] কিন্তু পরে এটি পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। এই কলেজের শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বেকন, রুশো, টম-পেন-এর মত নতুন

১. ১৮১৫ সাল।

২. ১৮৭২

২. ১৮১৬

যুগের মনীষীদের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় করানও 'একাডেমিক এসোসিয়েশনের' স্থাপনা করে দার্শনিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সংস্থার যাঁরা মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নিয়েই 'ইয়ং বেঙ্গল' তৈরী হয়। পুরাতনপন্থীরা এদের দেখলে আতঙ্কিত হতেন। এখানে একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে একদিকে যুবকদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিচার-ধারা এবং অগ্রগতির আলো জ্বলে উঠলেও, অপরদিকে পশ্চিমের কুসংস্কারগুলির প্রতিও তারা আকৃষ্ট হয়। কিছু লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। উত্তেজিত যুবকেরা মদ খাওয়া আরম্ভ করে এবং মা-বাপের কাছে উন্মুক্ত আচরণ করে এটাই দেখাতে চাইত, তারা তাঁদের থেকে কতটা আলাদা এবং প্রগতিশীল। মদ খাওয়ার এই প্রবৃত্তিকে বহুদিন পর্যন্ত প্রগতির লক্ষণ মনে করা হত। দেহে ভারতীয় এবং মনে ইংরাজ, এদের নিয়ে দেশে অসন্তোষও কিছু কম ছিল না। সে সময়ের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, হিন্দু কলেজে কিছু নতুন ধরনের মানুষ নির্মাণ করা হচ্ছে। এই কলেজের দরুন সমাজে ধার্মিক চিন্তাধারায় যে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তার একাংশও কি মিশনারীদের আন্দোলনের দ্বারা হয়েছে ?

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে নবোত্থানের হাওয়া ওঠে কিন্তু তাকে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ বলা যেতে পারে না। কলকাতা ইংরেজী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীরা ভাবুক হওয়ার দরুন ভাল বক্তা এবং লেখক হবার ক্ষমতা রাখতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কুমারী তরু দত্তের নাম এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কিন্তু এ-আন্দোলনে জনতার অন্তরের যোগ ছিল না। তাই প্রত্যক্ষরূপে শুধু সমাজের একটা ছোট্ট অংশ এই আন্দোলনে উদ্বেলিত হয় এবং বাকিরা পুরাতন গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রইলেন। যে সকল লোক এই সংস্কার দলে যোগ দিয়েছিলেন, পুরাতনপন্থীরা তাদের একঘরে করে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করেন। এই সমাজ সংস্কারের সুর বিহারে অনেক পরে ধ্বনিত হয়। সেখানের প্রবাসী বাঙালীদের একটি সংখ্যালঘু দল এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই সব বাঙালী ভদ্রলোকদের মেয়েদের পাঠশালায় পড়তে যেতে দেখে বিহারীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তারা সোচ্চারে বলত—বাঙালীদের কোন জাত নেই। মাছ মাংস খায়, মেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠায় ইত্যাদি। শুধু বিহারীরাই বা কেন ? এই সমাজ সংস্কারকে

বাঙালী সমাজও তো ভাল চোখে দেখেনি। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে তারা আচ্ছন্ন ছিল। বিধবা বিবাহ, জাতি বিচার, কৌলীন্য, ধর্মের বহ্বাড়ম্বর ইত্যাদিতে তাদের ভাবনা, চিন্তা বড়ই সংকুচিত ছিল। প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস গোস্বামীর কথায়, 'যে সংসারে বিধবা নাই, সে সংসারে সদাচার এবং দেবসেবা ইত্যাদি সুষ্টুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য গৃহে বিধবার একান্ত প্রয়োজন। ইহা ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টি এবং একটি বিশিষ্ট দান। একথা হৃদয়ঙ্গম করা সত্যিই বড় কঠিন।'

নব জাগরণে যারা বিশ্বাস করত তাদের কেউ সুনজরে দেখত না। মেয়েরা পদে পদে অপমানিতা হত। তারা ঘরের কোণে চুপটি করে পড়ে থাকত। পুরুষের ছায়া মাড়ালেও তারা কলঙ্কিতা হত। অপর দিকে কুলীন প্রথা তাদের জীবনকে আরো অভিশপ্ত করে তুলত। অনেক কারণে যে মেয়েদের বিয়ে হত না, কিছু টাকার বদলে কুলীন বামুন (পাচক) পিঁড়েয় বসে তাকে উদ্ধার করত। তারপর থেকে মাথায় সিঁদুর পরে এই সধবারা সারা জীবন স্বামীর প্রত্যাশাহীন প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিত। একদিকে সংস্কারের আতঙ্ক অপরদিকে ধর্মের দালালদের চাপে পড়ে সাধারণ মানুষ দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

সমুদ্র যাত্রা করা তখনকার দিনে পাপ মনে করা হত। ছোট ভায়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাও পাপ। নাচ, গান, নাটক-করা, ক্লাব-পার্টি সব কিছুকেই পাপের পর্যায়ে ফেলা হত। ভাগলপুরের প্রবাসী বাঙালী, বিহারের মুঙ্গের ইত্যাদি শহর অপেক্ষা বেশী গোঁড়া ছিল। আর এই পুরাতন দলের দলনেতা ছিলেন শরতের দাদামশাই কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শাস্ত্রসম্মত আচার বিচার তাঁর প্রিয় ছিল। অত্যন্ত নিয়মের সঙ্গে তিনি তা পালনও করতেন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে স্বাধীন চিন্তাধারার যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন আচার সংহিতা ক্রমশঃ প্রভাবহীন হয়ে পড়ছিল। নতুনের রূপও তেমন স্পষ্ট ছিল না। অরাজকতার এই আবহাওয়ায় বাঙালী সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়।

১০.

ভাগলপুরে শরৎ যখন দ্বিতীয়বার ফিরে এল, দলাদলি তখন চরমে। পুরাতন পন্থীদের বিরুদ্ধে যে দল গড়ে উঠেছিল, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর তার নেতা ছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তীক্ষ্ণমেধা এবং অধ্যবসায়ের জোরে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পনেরো কুড়ি বছর বয়সেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সরকার থেকে 'রাজা' উপাধি পান। তাঁর ফিটনের সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার হাতে ঘোড়-সওয়ারে সেপাই দৌড়ত। তিনি খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকটি শুভ কাজেই তাঁর সহযোগিতা পাওয়া যেত। শোনা যায় একবার তাঁর উন্মাদ রোগ হয়। স্বাস্থ্যলাভের আশায় তিনি ইওরোপে যান। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসার পর বাঙালী সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করে। এমন কি কারুর বাড়িতে যদি তাঁকে আমন্ত্রিত করা হত তাহলে অন্য নিমন্ত্রিতেরা সেখান থেকে বিদায় নিতেন। এই বহিষ্কার-আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে শরতের দাদামশায় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল যে রাজা শিবচন্দ্র বিদেশে গিয়ে নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। প্রথম প্রথম রাজা শিবচন্দ্র সমাজকে অবহেলা করতে চাননি। যে-কোন প্রায়শ্চিত্ত করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তবুও তাঁর ইচ্ছে কার্যকর হয়নি। এই ঘটনার পর হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়চিত্ত হন। দুটি দলই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলছিল এবং গোটা সমাজটাই যেন এই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার উপক্রম করছিল। গঙ্গোপাধ্যায়দের প্রতিবেশী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে থাকতেন। দুটি পরিবারে এরকম দলাদলির দরুন সমাজে নানান কথা উঠল। কেউ কেউ কেদারনাথের কাছে গিয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব গান করতে লাগল, অপরদিকে রাজা শিবচন্দ্রের দলে মিশে

অন্যদল পুরাতনপন্থীদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ করতে লাগল। গাঙ্গুলীবাড়ির তরুণ কিশোরদের ও-বাড়ি যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত এই নিষেধ কেউই মানছে না। অপরপক্ষ এদের বাড়ির ছেলেদের অবজ্ঞা না করে তাদের সবাইকে ভালোই বাসত। ছোট ছেলেদের মুড়ি কিনে দিত। তামাক বা চুরুট খাবার জন্য তরুণদের বেত্রাঘাত করা হত না। সামান্য কৌতুহলবশতঃ এ ধরনের অপরাধকে ক্ষমার চোখেই দেখা হত। সাপ খেলা, বাঁদর নাচ, পুতুল নাচ সবই শিশুদের দেখতে দেওয়া হত। সন্ধ্যেবেলায় যাত্রাদলের নাচগানের আওয়াজে বাচ্চারা বিচলিত হয়ে পড়ত। শাসনের লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলেরা অসহায় লোলুপ দৃষ্টিতে নীরবে চেয়ে থাকত। যাত্রা দেখার অধিকার তাদের ছিল না। এই যাত্রা দলটির নাম ছিল 'নব-হুল্লোড়'। এতে কেউ বেহালা শিখত, কেউ বা তবলায় চাঁটি বসাত, কেউ বাঁশিতে মিষ্টি সুর তুলত, কোথাও বা নূপুরের রিনিরিনি শোনা যেত। কোথাও গড়গড়ার ধোঁয়ার সঙ্গে শ্লোকের ধ্বনি শোনা যেত।—

'তাম্রকূটম্ মহাদ্রব্যম্ স্বেচ্ছয়াপীয়তে যদি,
টানে টানে মহাফলম মর্ত্যে দিব্য মহৎসুখম্'

অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনেও কোনরকম নিষেধ ছিল না। বৃদ্ধ, যুবক, বালক সবাই এই নব হুল্লোড়ে যোগ দিতে পারত। শরতের মন কিন্তু এই মৌনমধুর আমন্ত্রণকে বেশিদিন উপেক্ষা করতে পারল না। লুকিয়ে লুকিয়ে সেখানে যেতে আরম্ভ করল এবং যখন বেশ জানাজানি হয়ে গেল তখন বুক ফুলিয়েই যাওয়া শুরু করল। গাঙ্গুলীবাড়ির কঠোর অনুশাসনও তাকে বেঁধে রাখতে পারল না। নিষেধ অমান্য করায় সে আনন্দ পেত। বাঁশি, বেহালা হারমোনিয়াম, তবলা সবই সে বাজাতে পারত। 'চরিত্রহীনে'র সতীশকেও তো এই বিদ্যায় নিপুণ দেখা যায়। ক্রমশঃ শরৎ ওই দলের পাণ্ডায় পরিণত হয়। রাজুও এই দলটির ডান হাত ছিল।

যাত্রাদলের শখ তো শরতের ছোটবেলা থেকেই ছিল, কিন্তু অন্তর যেন এই স্থূল আনন্দে সায় দিত না। এতে যেন সূক্ষ্মরসের বিরাট অভাব। যাত্রা করাও কোন হাসি ঠাট্টার ব্যাপার ছিল না। দশ বারো ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করার পরই যাত্রা জমে। শুধু নির্বিকার হয়ে কাজ করাও সহজ নয়, নেশার দরকার হয়। অর্থের অভাবে ভাল মদের ব্যবস্থা না হওয়াতে গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হত।

ক্রমশঃ যাত্রার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যেতে লাগল। ভাগলপুরের বাঙালী সমাজে থিয়েটারের প্রচলন হয়। থিয়েটার দেখে সবাই আনন্দ পেত। ভালমন্দ যেমনই নাটক হোক না কেন দর্শকদের প্রচণ্ড ভীড় হ্ত। তবুও বাড়ীর ছেলেরা কেউ নাটকে যোগ দিত না। একদিন অভিনয়ে একটি নারীর ভূমিকায় এক যুবকের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতে দর্শক অভিভূত এমন সময়ে হঠাৎ যুবকটির পিতা দর্শকদের ভীড় ঠেলে তর্জন গর্জন করে মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়াতে, অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নে তৈরী মোমবাতির আলোদান কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ল। ফরাশে আগুন লেগে মঞ্চ জ্বলে উঠল আর সেই আগুনে দর্শকেরা দেখলেন পিতা পুত্রকে নির্মমভাবে প্রহার করছেন। থিয়েটারের আর শেষ রক্ষা হল না। এই আর্য থিয়েটার ছিল বয়স্কদের। রাজু আর শরৎ নিজেদের চেষ্টায় আর একটা নতুন থিয়েটার-দল তৈরী করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে মৃণালিনীর ভূমিকায় শরৎ অভিনয় করেছিল। যদিও অভিনয়ের হাতেখড়ি রাজুর হাতেই হয় তবুও দর্শকেরা সেদিন মৃণালিনীর ভূমিকায় শরতের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়;কিন্তু অভিভাবকদের প্রবল বিরোধিতার দরুন অভিনয় করা তাকে ছাড়তে হয়। কয়েক বছর আগে 'আদমপুর ক্লাবে' নতুন করে আবার ওই দলটি গড়ে ওঠে। রাজা শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র এই দলটির প্রাণ ছিল। সঙ্গীত এবং নাটকে তাদের অসাধারণ রুচি ছিল। রাজু ও শরৎ ছিল এই দলের উৎসাহী সদস্য। এরা সদলবলে কলকাতায় গিয়ে নাটক ইত্যাদি দেখে আসত, পরে সেই অনুযায়ী নিজেদের সংশোধন করত। সতীশচন্দ্রের পুত্রের অন্নপ্রাশনোৎসবে কলকাতার বিখ্যাত 'মিনার্ভা' থিয়েটারের অভিনেতারা ভাগলপুরে এসে রাজবাড়ীর রঙ্গ-মঞ্চে 'আলিবাবা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। শরৎ এই নাটকে মুস্তাফার ভূমিকায় এমন অভিনয় করে যে দর্শকেরা তাকে চিনতে পারেনি। এই সময়ে সম্পর্কে রাজা শিবচন্দ্রের শালা বাংলা স্কুলের অধ্যাপক কান্তিচন্দ্রের মৃত্যু হয়। প্রতি-শোধের এতবড় সুযোগ পুরাতনপন্থীরা ছাড়লেন না। তারা শবযাত্রায় যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। শেষ পর্যন্ত আদমপুর ক্লাবের সদস্যেরা মিলে শেষ-কৃত্য সম্পন্ন করে। যারা এই শবযাত্রায় অংশ নিয়েছিল তাদের সবাইকেই জাতিচ্যুত করা হয়। সারা শহরে এমনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যে ফলে প্রতিটি সংসারে দলাদলি শুরু হয়ে যায়। যারা দুর্বল অভাবী তারা মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু শরতের বাবা এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন রইলেন,

কাজেই সে সময় শরৎ ছাড়া পেলেও পরে তাকে অশেষ লাঞ্ছনা সইতে হয়। গাঙ্গুলীবাড়িতে খুব জাঁকজমক করে জগদ্ধাত্রী পুজো হত। প্রবাসী বাঙালী সবাই এই পুজোয় যোগ দিত; কিন্তু এই দলাদলি ও রেষারেষির ফলে রাজা শিবচন্দ্রের লোকদের আর এই পুজোয় নেমন্তন্ন করা হত না। শরৎকে লোকে আনন্দোৎসবেও যেমন আদর করে ডাকত, আপদ বিপদেও তেমনি তাকে আশা নিয়ে ডাকা হত। রাত জেগে রুগীর সেবা করা, সময়ে অসময়ে শ্মশানে গিয়ে দাহ-সংস্কার করা, বিবাহ বা পুজোয় আগন্তুকদের দেখা শোনা অভ্যর্থনা করা—সব কাজেই সে সমান পটু ছিল। পাড়ার বারোয়ারী পুজো এবং মামার বাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোয় ভোগ খাওয়াবার ভার তার উপরেই ছিল। কিন্তু এবার জগদ্ধাত্রী পুজোয় মামার বাড়ি থেকে তার ডাক এল না।[১] ডাকের প্রয়োজনও ছিল না, শরৎ নিজে থেকে গিয়েই সেখানে কাজেকর্মে লেগে গেল। ব্রাহ্মণ ভোজন হচ্ছিল। খাবার পরিবেশন করতে করতে সবাই ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু শরৎকে দেখামাত্রই দলপতি গর্জন করে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। মেজ দাদামশাই মহেন্দ্রনাথ দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল দাদা?' দলপতি চিৎকার বলে উঠলেন, 'কি হল? বলি কি হয়নি? এই শরৎ হারামজাদা কান্তির দাহ সংস্কার করে এসেছে। এখন আবার আমাদের খাবার পরিবেশন করছে। আমাদের জাত মারতে চায়,—পাজী-হারামজাদা।' সকলে হায় হায় করে উঠল। মহেন্দ্রনাথ এসে শরৎকে বললেন, শরৎ তোমার পরিবেশন করা চলবে না। রাগ দুঃখ অপমান ও অভিমানে শরতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। হাতের পাত্রটি মাটিতে নামিয়ে রেখে সেখান থেকে চলে গেল। মর্মাহত শরৎ কয়েকদিন বাড়িও ফেরেনি, না জানি কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

১. ১৩ই নভেম্বর ১৮৯৯।

১১.

সে বছর শরৎ পরীক্ষাতে[১] ও বসতে পারেনি। টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ফাইনাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাওয়া যেত। টেস্ট পরীক্ষার সময় একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানে শরৎ বরাবরই ভাল ছিল। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে আধঘণ্টার ভিতরে উত্তরপত্র তৈরী করে তারপর বন্ধুদের সাহায্যে লেগে গেল। প্রশ্নের উত্তর কাগজে লিখে দারোয়ানের হাত দিয়ে বন্ধুদের কাছে পাঠাতে লাগল। জল খাওয়ানোর অজুহাতে দারোয়ান বার বার ছেলেদের কাছে ঘুরঘুর করতে লাগল। পরীক্ষকের কেমন সন্দেহ হতেই দারোয়ানের পিছু পিছু শরৎকে হাতে নাতে ধরে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যান। শাস্তিস্বরূপ প্রিন্সিপাল শরৎকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন না। এ অপরাধের এই-ই উপযুক্ত শাস্তি।

যখন পরীক্ষার ফল বেরুল তখন শরতের নাম তাতে পাওয়া গেল না। কিই বা করবে শরৎ, অপরাধী তাই সে অসহায়। কিন্তু পড়াশোনায় ভাল হওয়ার দরুন অন্যান্য অধ্যাপকেরা প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে মিনতি করেন শরৎকে পরীক্ষায় বসতে দেবার জন্য। প্রিন্সিপাল মহাশয় নিজে এর জন্য কম দুঃখিত ছিলেন না। তাই তিনি ফিস জমা দেবার একদিন আগে শরৎকে ডেকে বললেন, 'কাল কলেজে গিয়ে পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে আসবে।'

কিন্তু একদিনে পরীক্ষার ফিস জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, পিতা চিরদিনের যাযাবর। পয়সা রোজগার করতে কোনদিনই শিখলেন না। অন্যদিকে নিজের মামা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। সম্পর্কে যাঁরা মামা হন, তাঁরাও হয়তো সাহায্য দিতে পারেন, না দিলেও দোষ দেওয়া যায় না। উপরন্তু শরৎ তাঁদের দলের বিরুদ্ধে রাজা শিবচন্দ্রের দলে যোগ দিয়েছিল। তৎকালীন মানদণ্ডে তার চরিত্রও ভাল ছিল না। সেইজন্য মামাদের সংসারে তার কোন দাবিই ছিল না। এইভাবেই পয়সার অভাবে শরতের

---

১. ১৮৯৩ সাল।

পড়াশোনা এখানেই শেষ হল। নাটক, থিয়েটার, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদিতেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখল। রাজুর সঙ্গে বেপরোয়া ঘুরে বেড়ানো আরও বাড়ল। এমনকি বেশ্যালয়ে যেতেও দ্বিধা করেনি। মন্সুরগঞ্জে কালিদাসী নামে এক ধনী নর্তকী থাকত। নিজের দোতলা বাড়ি ছিল। ধর্মে তার খুব মতি ছিল, মিষ্টি সুরে ভালো কীর্তনও গাইতে পারত। কীর্তনের লোভেই রাজু রোজ সেখানে যেত। শরতের কলেজ যাবার পথ এদিকেই ছিল, কাজেই দুজনের একজোটে যাবার বেশ সুবিধে ছিল। শোনা যায় কালিদাসী এদের দুজনকেই খুব স্নেহ করত। আজ মীমাংসা করা দুঃসাধ্য যে উনিশ বছরের শরৎ কালিদাসীর সঙ্গে বর্জিত নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ পেয়েছিল কি না। কিন্তু একথাও সত্য যে কণ্ঠের মাধুর্য আর বাক্‌পটুতার জন্য মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হত। তথাকথিত কুকর্মের ফলে কুলীন সমাজে দিনদিন শরতের মর্যাদা কমে আসছিল, কাজেই অকুলীনদের মাঝেই তাকে শরণ নিতে হয়। আর যথার্থ মানুষের খোঁজও সে এখানেই পায়। বিরাট এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে অনুভূতি হল, মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে অনেক বড়।

'দেবদাস' লেখা সে লুকিয়ে আরম্ভ করেছিল। মনে হয় 'দেবদাস'এ সে নিজের প্রেমের বেদনাকেই স্পষ্ট করতে চেয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও 'দেবদাস' শরতের অসফল এবং সরলপ্রেমেরই আত্মস্বীকৃতি। এর সবকটি চরিত্রই বাস্তব। ছেলেবেলায় যাকে সে খুব ভালবাসত, সে স্কুলের বন্ধু ধীরু, সেই তো দেবদাসের পার্বতী, ধর্মদাসের চরিত্র যেন মামার বাড়ির সেবক মুশাইকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চন্দ্রমুখীর উপাদান জুটিয়েছে একটি নর্তকী। শরৎচন্দ্র স্বয়ং নর্তকীটির ঋণ স্বীকার করেছেন। বয়সকালে গল্পটি তিনি নানান বন্ধুদের নানান রূপে শুনিয়েছেন। কিন্তু শরতের অনন্য অনুরাগী বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায়কে বলেছিলেন, যে এটি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। শরৎ স্বয়ং একটি বন্ধুর সঙ্গে সেখানে গান শুনতে গিয়েছিল। বন্ধুটি জমিদারদের বাড়ি কাজ করত। তার কাছে সেদিন প্রায় কয়েক হাজার টাকা ছিল। বহুক্ষণ নাচ গান হবার পর মদের ফোয়ারা চলল। ক্রমশঃ মদ খাওয়ার মাত্রা এমনই বেড়ে চলল যে শেষ পর্যন্ত অনেকে মাতাল অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। বন্ধুটি বারবার টাকা বার করে নর্তকীকে দেয় আর বলে, 'আরো নাচো, আরো মদ দাও।' পরে বন্ধুটি মদে চুর হয়ে

অচৈতন্য হয়ে পড়ে। শরৎও জ্ঞান হারায়। পরের দিন সকালে বন্ধুটির চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে যায়। বন্ধু হাহাকার করছিল, 'হায় আমার এখন কি হবে? আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।' শরৎ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার চেঁচাচ্ছ কেন?'

জবাবে বন্ধু বলে—'আমার কাছে তিন হাজার টাকা ছিল, খুঁজে পাচ্ছি না। তুই কি লুকিয়ে রেখেছিস?'

শরৎ বলল—'আমি কেমন করে লুকোব। আমিও তো তখন থেকে বেহুঁশ, তোর চেঁচানিতে এই মাত্র ঘুম ভেঙে গেল।' বন্ধু কেঁদে ফেলল, বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে। এ টাকা তো জমিদারের। এ টাকা ফেরৎ না দিলে চাকরি তো যাবেই উপরন্তু জেলে যেতে হবে। ভেবেছিলাম শ' দুই তিন খরচ হবে, সে না হয় ক্রমশঃ শোধ দিয়ে দেব। কিন্তু এত টাকা এখন আমায় ধারই বা কে দেবে? এ আমি কি করলাম?'

এই বলে সে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল? কিন্তু কাঁদলে কি আর টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়। দুজনে মিলে যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি করেও টাকার হদিশ পেল না। মনে সন্দেহ হল, নর্তকীটি টাকা সরায়নি তো? বলার সঙ্গে সঙ্গেই নর্তকীটি ঘরে ঢোকে। তাকে দেখা মাত্রই বন্ধুটি আরো জোরে কেঁদে উঠল। সব ঘটনা তাকে শোনাল। নর্তকী অত্যন্ত শান্তস্বরে বলল, 'তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছিল যে বেশ্যাবাড়ি এত টাকা নিয়ে ঢুকেছিলে। এখানে দু-চার টাকার জন্য লোকে প্রাণে মেরে ফেলে আর তোমার কাছে তো হাজার হাজার টাকা ছিল। বারবার সবার সমানে টাকা বার করে আমায় দিচ্ছিলে··· এ কি কাণ্ড? সকলের লক্ষ্য তোমার পকেটের উপর ছিল। সবাইকে বিদায় দিয়ে নেশায় মত্ত শরীরটাকে তুলে মাথার নীচে যখন বালিশ দিলাম তখন আমাকে বলতে কিছু বাকি রাখনি। থাক সে সব তো আমায় রোজই শুনতে হয়। তোমাদের শুইয়ে যেই উঠতে যাচ্ছি দেখি টাকাগুলো পড়ে রয়েছে। আমি আঁচলে বেঁধে কোমরে জড়িয়ে নিলাম। কি জানি যদি আমারই কু-দৃষ্টি পড়ে। এ পাড়ার কত দুর্নাম। কত রকমের বদমাশ গুণ্ডা আসে। তারা তো সবাই জেনে গিয়েছিল যে তোমাদের কাছে টাকা আছে। বাড়ির আশে পাশে সারা রাত ঘুরে বেড়িয়েছে। কখন এখান থেকে বেরুবে আর তারা সব কেড়েকুড়ে নেবে। ভয়ে সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি। আগুন জ্বালিয়ে ঝি-এর সঙ্গে গল্প করে রাত কাটিয়েছি।' এই বলে টাকাগুলো বার

করে বন্ধুটিকে দিয়ে বলল, 'দেখ! সব ঠিক আছে তো? ভাল করে গুনে গেঁথে নাও। আর কখনও এমন বোকামী কোরনা।'

টাকা দিয়ে চলে যেতেই, শরৎ তার যাওয়ার পথের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। ভাবল, অনায়াসেই এ-টাকা সে হজম করতে পারত। তার কাছ থেকে টাকা ফিরিয়ে নেবার দুঃসাহস কার হত। কিন্তু কত বিরাট মহৎ এই রমণী। পথভ্রষ্টা হয়েও অন্তরের সদবৃত্তিগুলি তার নষ্ট হয়নি। বাইরের রূপটাই মানুষের আসল পরিচয় নয়। অনেক সতীনারীর দ্বারাও অনেক কুকর্ম হয়। চুরি, জাল-জোচ্চুরী, মিথ্যে-সাক্ষী কোন কিছুতেই তারা পিছু হঠে না কিন্তু এই দ্বি-চারিণীরা শত প্রতিকূল আবহাওয়াতেও হৃদয়ের দয়া, মায়া, মমতাকে শুকিয়ে ফেলেনি।

এই নর্তকীই তো কালিদাসী। 'দেবদাস' লেখার সময় এর কাছেই তো শরৎ যেত। চন্দ্রমুখীর চরিত্রের সঙ্গে কালিদাসীর চরিত্রের কি ভয়ঙ্কর মিল। সব কিছু দান করে শেষে সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়। পূজো-পার্বণে কারুর কারুর বাড়িতে গান শোনাতেও যেত। কেউ যদি তাকে কিছু দিতে চাইত তখন সে বলত, 'ভগবান আমায় এত দিয়েছিলেন তাই আমি রাখতে পারিনি। আর আমার কিছুই চাই না।

কালিদাসীই যে চন্দ্রমুখী এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেও নেই। চুনিলাল বলেছিল, 'না-না, নোট-ফোটের লোক আলাদা—সে তুমি নও।' (দেবদাস)। যতই ধর্মপ্রাণা নারীই হোক না কেন আসলে তো সে একটি নর্তকী।

শরতের মামার বাড়ির কেউই এ আচরণ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁদের চোখে সে ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন হয়ে পড়ছিল। তাই মামার বাড়ি যাওয়া তার পক্ষে আগের মত আর সহজ ছিল না। অন্দর মহলে ঢোকবার সময় গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকতে হত—বয়স্কা বোনেরা তার সামনে আর বেরুত না। মামার বাড়ির লোকেদের প্রসন্ন করার জন্য নিজের আচরণকে সে সংযত করেনি। একদিন ছোট দাদামশায় আদেশ দিলেন, 'শরৎ যেন এ বাড়িতে আর না ঢোকে।' যারা প্রতিভাশালী তাদের পক্ষে এ ধরনের অবহেলা ও তিরস্কার বোধহয় কতকটা প্রাপ্য রূপেই ধরা হয়। ইংরেজ কবি শেলীর বিদ্রোহী বিচারের দরুন তাঁর মা তার বোনেদের বলেছিলেন, শেলীর সঙ্গে তোমরা বেশী কথাবার্তা বোল না। সে ধর্মেও বিশ্বাস করে না, বিবাহেও তার বিশ্বাস নেই।

১২.

হঠাৎ একদিন দেখা গেল রাজু কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।[১] কোনদিন আর সে ফিরে আসেনি। বহুবছর পর শ্রীকান্তের রচয়িতা লিখেছেন,—'আজ সে বাঁচিয়া আছে কিনা জানিনা। কারণ বহু বৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যুষে ঘরবাড়ি বিষয় আশয়, আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে।' শরতের জীবন যেন বিরাট এক শূন্যতায় ভরে গেল। এই শূন্যতাই ছিল তার জীবনের প্রেরণা।

'মৃণালিনীর' পর আদমপুর ক্লাবে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'জনা' নামক নাটক দুটি মঞ্চস্থ করা হয়। 'বিল্বমঙ্গলের' চিন্তামণি এবং 'জনায়' জনার ভূমিকায় শরৎ অভিনয় করে। শরতের অভিনয়ে গাম্ভীর্য, সংযম, তেজস্বিতা ও শোক প্রকাশের এমনই হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিমা ছিল যে কলকাতার ক্ষমতাময়ী অভিনেত্রী-দের অভিনয়ও এত হৃদয়গ্রাহী হত না। পাগলিনী ও গিরিজার অভিনয় করে রাজু প্রসংশিত হয়। পাগলিনীর ভূমিকায় রাজুর অভিনয় স্মরণ করে যাট বছর[২] পরও কেউ কেউ রোমাঞ্চ অনুভব করত। এ ভূমিকায় সে যেন সত্যই পাগল হয়ে উঠত। একদিন নিজের শিশু ভাইপোকে কোলে নিয়ে গাছের ডালে বসে পাগলীর অভিনয় শুরু করে দেয়। দেখতে পেয়ে লোকেরা ভয় পেয়ে যায়, না জানি কখন বাচ্চাটি কোল থেকে ছিটকে পড়ে। রাতে বাবার হাতে রাজু বেদম প্রহার খেল, আর ভোররাতেই রাজু চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। শোনা যায় সে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সন্ন্যাসবৃত্তির উপর ইদানীং সে আকর্ষণ অনুভব করত। বহির্জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে যেন অন্তর্জগতে লীন

১. ১৮৯৭ সাল।

২. ১৯৫৯।

হয়ে গিয়েছিল সে। গঙ্গার ঘাটের কাছে ছোটদের শ্মশানের কাছে বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের উপর একটা কাঠের ধ্যানঘর তৈরী করেছিল। শরৎ ছাড়া আর সকলেরই এ-জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে অতি সাবধানে সেই ঘরটাতে ঢুকতে হত। অত্যন্ত সংকীর্ণ সেই জায়গাটুকুতে বসে ঈশ্বরদর্শনের চিন্তায় রাজু থাকত বিভোর হয়ে। ক্রমশঃ কথা বলা ছেড়ে মৌন হয়ে থাকত। অনশনে তার দিন কাটত। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও মেলামেশা বন্ধ করে দিল, শুধু বাচ্চাদের খুব ভালবাসত। তাদের কাউকে নিয়ে গাছের উপরে চড়ে বসত। পিতা নিজের সন্তানকে কোনদিনও চিনতে পারেনি, তাই সন্তানও চিরদিনের মত অসীম বিশ্বে কোথায় হারিয়ে গেল।

পরে অবশ্য অনেকে বলত, হরিদ্বারে নাকি তাকে দেখতে পাওয়া গেছে। উদাসীপন্থীদের আখড়ায় একবার এক সাধুকে বাংলায় গান গাইতে দেখে এক মহিলার[৩] সন্দেহ হয়। গলার স্বর কেমন যেন চেনা মনে হওয়াতে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন যে সাধুটির পিঠে জড়ুলের চিহ্ন। তা দেখে তিনি নিশ্চিত হন যে, এ রাজু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ভিতরে গিয়ে তিনি বললেন, আরে রাজু? তুই এখানে সাধু সেজে বসে আছিস আর ওদিকে তোর মা-র পাগলের মত অবস্থা।

রাজু তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর না দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। খবর পেয়ে মা হরিদ্বারে এলেন কিন্তু ততক্ষণে রাজু সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। সব খোঁজাই ব্যর্থ হল। রাজু চলে যাওয়াতে শরতের মনে বেদনার শেষ ছিল না। যখনই তার কথা মনে পড়ত, বুকটা মুচড়ে উঠত। রাজু যে তার বড় প্রিয় বন্ধু। তার কাছেই তো শেখে, সংসারে সবেরই মূল্য হয়ত মিথ্যে হতে পারে কিন্তু মানবীয় করুণা কোন অবস্থাতেই মিথ্যে ও ব্যর্থ হতে পারে না।

সেবার জগদ্ধাত্রী পুজোর আগের দিন মামার বাড়িতে যাত্রার আয়োজন হয়েছিল। কলকাতা থেকে বেশ নামকরা দল এসেছিল। পাড়া-প্রতিবেশী দল বেঁধে যাত্রা দেখতে এল। শরৎও এককোণে মগ্ন হয়ে যাত্রা দেখছিল, হঠাৎ রাজু এসে হাজির। খুব ব্যস্ত হয়ে শরতের কানে কানে বলল, 'চল ওঠ।'

গুরুর আদেশ। শরৎকে উঠতে হল। বাইরে এসে বলল, 'ওই পাড়ার তারাপদর ছেলেটা এই মাত্র কলেরায় মরে গেল, তিন বছরের ছেলে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। মা-বাপ তো পাগলের মত কান্নাকাটি করছে। একটি মাত্র

৩. ১৯৫৯ সালে লেখক উক্ত মহিলার ছেলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

সন্তান। কিন্তু এ-রোগের মড়া বেশীক্ষণ ফেলে রাখা চলবে না এখুনি শ্মশানে যেতে হবে। পাড়ার সবাই যাত্রা দেখতে ব্যস্ত। এখন তুই-ই চল আমার সঙ্গে।"

দুজনে তারাপদর বাড়ি পৌঁছে মা-বাপ দুজনকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রায় অর্ধেক রাতে মড়া নিয়ে শ্মশানে চলল। কিছুদূর এগিয়ে শরৎ বলল, 'সঙ্গে বাতি নিলে ভাল হত।' রাজু উত্তর দিল, 'ভাল তো হত। কিন্তু এখন পাই কোত্থেকে। আর দেবেই বা কে? আমার কাছে দেশলাই আছে, দরকার পড়লে ওতেই কাজ চলবে।' গঙ্গার ধারেই শ্মশান। যেমন বড় তেমনই ভয়াবহ। বহুদূর পর্যন্ত মানুষের কোন বসতি ছিল না। চতুর্দিকে বালি আর বালি, দূরে কোথাও এক-আধটা খেজুর গাছ বা কাঁটা বন। শ্মশানের ঠিক মাঝখানে একটা খড়ের ঘর ছিল। ঝড় জলে বা বিশ্রামের দরকার হলে লোকে এর ব্যবহার করত। অনেকের ধারণা ছিল এতে ভূত আছে। দিনের বেলাতেও কেউ সে ঘরে ঢুকত না। রাজুর এসবে ভ্রূক্ষেপ ছিল না কোনদিন, তাই সোজা ঘরটার ভেতরে ঢুকে পড়ল। শরৎও পিছু পিছু এল কিন্তু ভয়ে তার থরহরি-কম্প অবস্থা। রাজু লাশটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে বলল, 'বহুক্ষণ বিড়ি খাওয়া হয়নি, আগে একটা বিড়ি খেয়ে নি।'

শরৎ কিছু বলবার আগেই অন্ধকারে শোনা গেল 'আমাকেও একটা বিড়ি দিবি।' ভয়ে শরতের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। রাজু জিজ্ঞেস করল, 'কে'? সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইটি জেলে দেখল ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে একটা লোক পড়ে আছে। রাজু এমনই ধাতুতে গড়া, ভয় না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি একজন গঙ্গাযাত্রী।'

এবার লক্ষ্য করে দেখা গেল ছেঁড়া কাথার ভেতর প্রায় আশি বছরের এক বৃদ্ধ শুয়ে আছে। রাজু তাকে একটা বিড়ি দিতে তাতে তৃপ্তির সঙ্গে এমন একটা টান দিল যেন অমৃত। বলল—'বাবা বাঁচালে তুমি আমায়। কদিন থেকে পড়ে আছি এখানে তবুও মৃত্যু নেই। সঙ্গে আমার দু'নাতি আর পাড়ার এক প্রতিবেশী এসেছে। আমি মরছি না দেখে বড় বিরক্ত হয়ে উঠেছে আমার উপর। আজ তারা যাত্রা দেখতে গেছে। বলছে, ভেবেছিলাম বুড়ো তাড়াতাড়ি মরবে কিন্তু গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বুড়ো তো আরো চাঙ্গা হয়ে উঠল। জানি না আমার কি গতি হবে। গঙ্গাযাত্রী হয়ে বেরিয়ে এসেছি, এখন তো আর বাড়ি ফেরাও যাবে না।'

রাজু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—'কেন বাড়ি ফিরতে পারবেন না? আপনি বেশ সুস্থ আছেন। বলুন আপনার বাড়ি কোথায়? আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি নইলে সঙ্গীরা গলা টিপে মেরে ফেলবে।'

মৃত্যু-পথযাত্রী ককিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ বাবা ওরা বার বার সেই কথাই বলে ভয় দেখাচ্ছে। কি জানি কখন সত্যি গলা টিপে দেয়।' রাজু প্রথমে মৃত-শিশুটিকে মাটিতে পুঁতে স্নান করে নিল, তারপর শরৎকে বলল, 'আমি এই বুড়োকে কাঁধে নিচ্ছি, তুই ওর ছেঁড়া কাঁথাপত্তর নিয়ে চল।'

সেই ওস্তাদ সাপুড়ে আর অন্নদাদিদি যেন রাজুর পুজোর জিনিস। সমাজ বহিষ্কৃতা কে সেই নারী? কেউ কি সঠিক জানত? কিন্তু এ কথা সত্যি যে তার স্বামী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। সমাজের নির্দেশ অমান্য করেও অন্নদাদিদি স্বামীকে ছাড়তে পারে নি। সাপের খেলা দেখিয়ে কত আর আয় হত, পেট ভরে অন্নও জুটত না। রাজু আর শরৎ নিজেদের স্বভাবে সাধ্যমত সাহায্য করত। একদিন এই দিদিকে অপমান করার দরুন ওস্তাদকে ধরে পিটিয়ে ছিল।

এ গল্পের কোন আদি অন্ত ছিল না।

১৩.

এদিকে শরৎ লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতই খেয়াল খুশীর পথ ধরে দিন কাটাত। অন্যদিকে বাপ যাযাবর বৃত্তির শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছেন। বাড়িতে আরও তিনটি সন্তান, তাদের সামান্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার মত ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। পুরোন ধারকর্জ শোধ দিতে পারেননি। গাঁয়ের বাড়িখানা বাঁধা রেখেছিলেন তারও সময় পেরিয়ে যখন ডিক্রী জারী হল তখন বাধ্য হয়ে মাত্র দুশো-পঁচিশ টাকায় ছোটমামাকে বাড়িটি বিক্রি করে দেন।[1] উপোস

১. ৯ নভেম্বর ১৮৯৬। (দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র) দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী। ভারতবর্ষ, ১৯.৮—চৈত্র ১৩৪৪।

করে মরা ছাড়া তাঁদের জন্য আর কোন পথ খোলা ছিল না। শরৎ তখন শিশু নয়, একুশ বছরের পূর্ণ যুবক। দোষেগুণে লোকেদের সে প্রিয়ই ছিল। বাড়ির এই দুর্দশা তার মনকে অবশেষে বিচলিত করে, শেষ পর্যন্ত সত্যিই সে চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

সে সময় সাঁওতাল পরগনায় সেট্‌লমেণ্টের কাজ হচ্ছিল। বেনেলি এস্টেটের তরফ থেকে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এস্টেটের দেখা শোনা করত। এরই সহকারী-পদে শরৎ নিযুক্ত হয়। কাজটি তার রুচিমাফিকই ছিল, প্রায়ই বাইরে যেতে হত। তাঁবুতে থাকা আর গান বাজনা শিকার করা ইত্যাদি বড় কর্মচারীদের প্রধান কাজ ছিল। কখনও কখনও সেখানকার রাজকুমার মজলিশে যোগ দিতেন। দুঃসাহসী শরৎ ক্রমশঃ বন্দুক চালাতে শিখল। উড়ন্ত পাখিকে গুলি করে মারতে তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভাল গল্প শোনাবার ক্ষমতা, মধুর কণ্ঠে গান গাওয়া, ভাল বন্দুক চালানো, এসব গুণের জন্য সবাই তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। বেড়াতে তার চিরদিনই ভাল লাগত। বেড়াতে বেড়াতে কখনও কখনও বক্রেশ্বরের শ্মশানে গিয়ে পোঁছত। জায়গাটি তার বড় প্রিয়ই ছিল। শিব-মন্দিরের কাছেই কি সুন্দর মনোরম নির্জন শ্মশানটি। তার উদাসী মনকে এই নির্জনতা যেন কাছে টানত। চতুর্দিকে নরমুণ্ড, গাছের ডালে অসংখ্য উল্টোমুখো বাদুড় ঝুলছে। তারই মাঝে সেই বিরাট নিস্তব্ধতা ভেদ করে বাদুড় ছানার কান্না তার উদাসী মনটাকে কিছুতেই ভীত ও বিচলিত করতে পারত না।

সেদিন রাজকুমারের উপস্থিতিতে মজলিস যেন আরো জমে উঠেছে। সেট্‌লমেণ্টের বড় বড় অফিসারেরা এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। অনেক টাকার আর্জিতে খুশী হয়ে পাটনা থেকে এক বাঈজী এসেছে। ভারি সুন্দর এই বাঈজীটি আর তেমনই মিষ্টি তার গানের গলা। শরৎও নিমন্ত্রিত। যদিও সে কোন উঁচু পদে কাজ করত না। তার মিষ্টস্বরের জন্য রাজকুমার তাকে ডেকে বললেন, 'আজ তোমাকে গাইতে হবে শরৎ।'

সঙ্গীতশাস্ত্রের বিচারে তার গান হয়ত নির্ভুল না হতে পারে, কিন্তু গলার মাধুর্য মনকে স্পর্শ করল। বাঈজী পর্যন্ত তার গানের প্রশংসা করল। নাচে, গানে বাঈজী খুবই পটু ছিল। মনের সবটুকু মমতা ও মাধুর্য নিয়ে মজলিসে বীণ বাজাল কিন্তু তার মর্ম এ মজলিসে কেই বা বুঝবে? শরৎই কেবল

রাগিণীর মর্ম বুঝতে পারল। মুক্তকণ্ঠে সে বাঈজীর বীণাবাদনের প্রশংসা করল। বাঈজী প্রশংসায় বিহ্বল হয়ে পড়ল। দিশাহারা এই গুণী যুবকটির উপর সহানুভূতি ও মমতায় তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। অল্পকালের পরিচয় পরস্পরকে কাছে টেনে আনে। কথাপ্রসঙ্গে বাঈজী বলল, 'আমি টাকার জন্য গাই, গানই আমার পেশা, কিন্তু আপনি কেন এদের মোসাহেবি করেন? আপনি গুণী লোক, আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।'

শরৎ চাকরি ছেড়ে দেয়। শুধু বাঈজীর আগ্রহেই যে চাকরি ছাড়ে এ কথা সত্য নয়। উত্তরাধিকার সূত্রে বাপের কাছ থেকে যে চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতি পেয়েছিল, তারই তাড়নায় কোথাও সে বেশিদিন স্থির থাকতে পারেনি। চাকরি ছাড়ার একটা কারণ এই ছিল যে একজন জ্যোতিষী তাকে বলেছিল, চল্লিশ বছর বয়সে সে রাজার মত খ্যাতি লাভ করবে। আর ষাট বছরের পরে যদি বেঁচে থাকে তাহলে দীর্ঘায়ু হবে।

এছাড়াও হয়তো অন্য কোন কারণ থাকতে পারে। বস্তুত ছোট থেকেই সে নিজের চতুর্দিকে একটা রহস্যের বেড়াজাল বিছিয়ে রাখত। নিজের সম্বন্ধেও নানাধরনের গল্প রচে বেড়াত। চাকরি ছাড়ার প্রতি বাঈজীর আগ্রহ বানানো গল্পও হতে পারে। তবুও কুসঙ্গ স্বেচ্ছাচারিতা দুঃসাহসপূর্ণ প্রবৃত্তির তাড়না সত্ত্বেও তার সাহিত্য সাধনা মৌন মন্থর গতিতে এগুচ্ছিল। সারাদিন বেড়িয়ে রাতের অন্ধকারে লেখায় ডুবে যেত, এমনকি চাকরিরত অবস্থাতেও লেখার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম প্রথম কবিতা লিখত কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখার ধৈর্য তার রইল না। নিজের রুচি ও পছন্দমত গল্প লিখত। বারবার কাটত, আবার লিখত। নতুন শব্দ ও নতুন কথা সংযোজনের প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ লেখা সে কোনদিনই ছাড়েনি। কবিতার ছন্দ মেলাবার ব্যর্থ হয়রানি তাকে কবিতা লেখা থেকে বিমুখ করে। কোন কবিতাই সে সম্পূর্ণ করেনি। 'অমিত্রাক্ষরে' একটি ছোট কবিতা লিখেছিল, যার প্রথম লাইনটি হল—'ফুলবনে লেগেছে আগুন।' কবিতাটিতে সে সুপ্রভা এবং ইন্দ্রা নামে দুই নায়িকার মনোভাবে বিশ্লেষণ করেছিল। সুপ্রভার বিষপানে মৃত্যু হয় এবং এই পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই তার জয় হয়। সে যুগে শরতের মত দিশাহারা ভাবুক যুবকের কাছে এর বেশী আর কি আশা করা যায়? সে যুগ তো রবীন্দ্রযুগ। তাই যুগোপযোগী কবিতাই রচনা করতে চেয়েছিল। শরতের মতই আনাতোলে ফ্রাঁসের মত বিশ্বের অনেক সাহিত্যিক প্রথম প্রথম কবিতা

লিখতে প্রয়াসী হন। শেষ পর্যন্ত শরৎ কবি হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু গদ্য রচনার ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে যেন তার কবি-মনই কথা কয়েছে।

সে সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে ইংরেজীর প্রতি এমন অনুরাগ ছিল যেমন একদিন ল্যাটিনের প্রতি ইংলণ্ডের ছিল। সে সময়ের বাঙ্গালীরা চিঠি-পত্রও ইংরেজীতে লিখত। শরৎ এ প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে। ইংরেজীতে চিঠি লেখা যেমন পছন্দ করত না তেমনি অন্য কাউকে লেখার উৎসাহ জোগাত না। তরুণ মামাদের মনে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ শরতের জন্যই জন্মায়। এরা সবাই মিলে বাংলাভাষায় হস্তলিখিত 'শিশু' নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের করে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিল দশবছরের শিশুমামা গিরীন্দ্রনাথ। এর প্রধান লেখক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিল স্বয়ং শরৎ। গিরীন্দ্রনাথের হাতের লেখা বড়ই সুন্দর ও স্পষ্ট ছিল। পত্রিকাটির বাংলা ও ইংরেজী কবিতাগুলি শিশুদের অনুরূপই ছিল। বাঁদরের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চাদরের তুলনা ছিল তার চরম উপলব্ধি।

বাঁদর বাঁদর
ছিঁড়ল কেন চাদর।
বাঁদর রুপি রুপি
পরেছিস কেন টুপি।
বাঁদর বাঁদর কেন
খেয়েছিস ফেন।
রামসিংহ ছটকে
পড়ল ডোবায় পটকে।
লোক রতনে
করলে যতনে
রাম সিংহ গেল মরে॥

ইংরেজী কবিতাও প্রায় এরকমই ছিল।

এ লায়ন কিল্ড এ মাউস
দেন ওয়েণ্ট টু হিজ হাউস।
নাউ ক্রাইড হিজ মাদার
এণ্ড দেয়ারফোর ক্রাইড হিজ সিস্টার।

এধরনের কাজে তখনকার দিনে কেউ উৎসাহ দিতেন না। 'শিশু' পত্রিকাটির কয়েকটা সংখ্যা যথাক্রমে ছাপা হল কিন্তু গাঙ্গুলী পরিবারে সাহিত্য-প্রেম তবুও জাগল না। অধ্যাপকেরাও বিরক্ত হয়ে বললেন 'এসব করে কি হবে? এর চেয়ে ভাল করে ইংরেজীটা শিখে নাও।' 'শিশু' পত্রিকাটিতে শরতের কয়েকটি রচনা ছাপা হয়। 'বোঝা' গল্পটি শরৎ তার প্রিয় মামা সুরেন্দ্রনাথের নামে ছাপে। সে সময় সে ভাগলপুরে ছিলনা[২]। ফিরে এসে শোনে যে সে নাকি ভাল গল্প লিখতে পারে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি গল্প লিখতে পারি!' বন্ধুরা বলল 'বাঃ তোর 'বোঝা' গল্পটি তো ভারি চমৎকার সুরেন্দ্রও 'বোঝা' গল্পটি পড়ে বুঝল এ শরতেরই কীর্তি। তবুও জিজ্ঞেস করল, 'এ সব কি? নিজের গল্প আমার নামে কেন ছাপিয়েছিস?'

শরৎ হেসে জবাব দিল—'ছাপিয়েছি তাতে তোর কোন ক্ষতি হয়েছে?'

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবৃত্তি শরতের কতখানি ছিল। পড়াশোনাও লুকিয়ে সবার চোখ এড়িয়ে করতে ভাল-বাসত। উপন্যাস ছাড়াও বহু বিজ্ঞান বিষয়ক বই তার পড়া ছিল। ডিকেন্স, থ্যাকারে ও শ্রীমতী হেনরি উড তার প্রিয় লেখক ছিল। এই সময়েই 'শুভদা'[৩] উপন্যাসটি লুকিয়ে লিখেছিল। উপন্যাসখানিতে নিজের বাড়ির চরম দারিদ্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, দৈন্য হতাশা 'শুভদা'তে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া এ ধরনের উপন্যাস লেখা সম্ভবপর নয়।

শরৎ একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে তোলে[৪]। কিন্তু কোন কারণে গোষ্ঠীর সাহিত্যিক কর্মতৎপরতা শিথিল হয়ে পড়ে। শরৎ এই গোষ্ঠীর পুনর্জন্ম দেয়। প্রধান পদে শরৎ নিযুক্ত হয়, আর প্রমুখ সদস্যগণের মধ্যে মামা সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও বন্ধু যোগেশ মজুমদার ও বিভূতিভূষণ ভট্ট। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য বাইরে থাকার জন্য পরে এই গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। বিভূতিভূষণের বোন নিরুপমা দেবীও এই গোষ্ঠীর সদস্যা ছিল। বাল্যবিধবা নিরুপমা তখনকার দিনে সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামির জন্য প্রত্যক্ষরূপে এই সভায় যোগ দেবার অধিকারী ছিল না। যে যুগে ছেলেরাই লুকিয়ে চুরিয়ে সাহিত্য করত সে

২. ১৮৯৮ সাল।

৩. রচনাকাল ২০ জুন ১৮৯৮ থেকে থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সাল।

৪. ৪ঠা আগষ্ট, ১৯০০ শনিবার।

যুগে মেয়েদের যোগদানের প্রশ্ন তো অবান্তর। কিন্তু তবুও নিরুপমা লিখত এবং ভায়ের সাহায্যে তার লেখা বিচারার্থে গোষ্ঠীতে পাঠাত। সেদিন হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে এই ছোট্ট সাহিত্যিক গোষ্ঠী থেকে ভবিষ্যতের অনেক সার্থক সাহিত্যিক জন্ম নেবে। যে সময় সাহিত্যাকাশে রবীন্দ্রনাথ সূর্যের মত প্রকাশমান, সে সময় এরা লুকিয়ে চুরিয়ে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেক বছর পরে শরৎ গিরীন্দ্র মামাকে লিখেছিল, '—আমার দুঃখপূর্ণ জীবনের সুখের স্মৃতি শুধু এই সাহিত্যসভা। বাড়ির সবাই যখন তোমাকে খুঁজতেন, রাগে অগ্নি-শর্মা হয়ে যেতেন তখন কিন্তু আমি লুকিয়ে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকতুম। কি জানি কেন সে দিনগুলোর কথা একদম ভুলতে পারিনি।'

বিভূতি ও নিরুপমা সাবজজ শ্রীনথার ভট্টের সন্তান ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত এই পরিবারের সঙ্গে শরতের পরিচয় হয় নিরুপমার মেজভাই ইন্দুভূষণের মাধ্যমে। কলেজে এক সঙ্গেই পড়ত। ইন্দুভূষণের সাহায্যে বিভূতি আর নিরুপমার লেখা শরতের কাছে পৌঁছত আবার শরতের লেখাও এবাড়িতে এসে পৌঁছত।

ভট্ট পরিবারের বাড়ির কাছে পশ্চিমদিকে বিরাট একটা গোরস্থান ছিল। কোন কোন দিন গভীর রাতে গোরস্থান থেকে গানের মূর্ছনা হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে এবাড়িতে এসে পৌঁছত—

'আমি দুদিন আসিনি দুদিন দেখিনি
অমনি মুদিনি আঁখি।'

কখনও কখনও নদীর ধার থেকে বাঁশির মিষ্টি সুর শোনা যেত। 'চরিত্রহীনে' সতীশ যখন রেলগাড়িতে বসে বাজাচ্ছিল তখন যেন পৃথিবীর বুকে ঘুমিয়ে পড়া জ্যোৎস্নার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর উপেন্দ্রও হাই তুলে ঘুম জড়ানো স্বরে বলেছিল—'নাঃ, যদি শিখতে হয় তো সানাই বাজাতে শিখব।' ইন্দুভূষণও গান ভালবাসত তাই শরতের সঙ্গে সৌহার্দ্য বেড়ে ওঠে। প্রায়ই সে শরতের কাছে গান শুনত। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের এই গানটি তার বড়ই প্রিয় ছিল— 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন।' ভট্টপরিবারে সম্পন্নতা ও আভিজাত্যের অহংকার ছিল না তাই অনায়াসে এ বাড়ির প্রত্যেকের কাছ থেকে শরৎ অত্যন্ত আদর ও ভালবাসা পায়।

বাড়ির বাইরে যতই শিথিলতা থাকুক অন্দরমহলে কিন্তু কঠোর নিয়মানু—

৫. ১৮ই মার্চ ১৯১৩ সাল।

বর্তিতা ছিল।৮ এ বাড়িতে দাবাখেলার বেশ রেওয়াজ ছিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে চা, পান, তামাক সবই চলত। ইন্দুভূষণ ও শরৎ এই খেলায় বেশ পটু ছিল। বিভূতি বয়সে এদের থেকে ছোট ছিল। শরতের সঙ্গে বিভূতির বন্ধুত্বের কাহিনীটি বেশ রুচিকর। বড় ভাই বিভূতির কবিতার খাতাখানি শরৎকে পড়তে দিয়েছিল। একদিন বিভূতির সামনেই শরৎ কবিতার খাতা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'কি লেখ এসব? খালি অনুবাদ তাও এত ভুল? নিজের লেখা কিছু নেই তোমার কাছে?'

বিভূতি খানিকটা অবাক, দুঃখিত হয়েছিল এ কথায়; কিন্তু তখন যে বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় মৃত্যু পর্যন্ত তা ভঙ্গ করতে পারেনি। শরতের মত বিভূতিরও পড়াশোনার শখ ছিল। পাশ্চাত্য দর্শন পড়ে বিভূতির মনে হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বলে যদি কিছু থাকে তবে তা প্রোটোপ্লাজম। তখনকার দিনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যুবকদের মদ্যপানের মতই প্রগতির সূচক মনে করা হত। শরৎ নিজেও এপথেরই পথিক। বিভূতি যেমন মেধাবী তেমনই বন্ধুবৎসল ছিল। হয়ত এ কারণেই শরৎ ও বিভূতির মধ্যে ছিল এত ভাব।

তখনকার দিনে সাহিত্যচর্চা আজকালকার মত খোলাখুলিভাবে হত না। অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে একাজ তাদের করতে হত। সপ্তাহে একদিন কোন নির্জন স্থানে তারা সবাই এক হত। তারপর হয়ত সরকারী স্কুলের পাশের বড় নালাটায় পা ঝুলিয়ে বসে প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা করত, অথবা কোনদিন কোন মঠে বা গাছতলায় বসে বা উঁচু কোন মাটির ঢিবির উপর বসে এই তরুণেরা অন্তরের বিদ্রোহ প্রকাশ করত। গোরস্থানও এ থেকে বাদ পড়েনি। শরতের নেতৃত্বে না জানি কতবার অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাতে সবাই মিলে এই গোরস্থানে বসে তার গান শুনত। ভট্টপরিবারের বাড়ির পাশে যে গোরস্থান ছিল তাতে বেশ বড় একটা মকবরা ছিল। মাঠের মত বিরাট তার ছাত। একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে পৃথিবীর চোখে তারা অদৃশ্য হয়ে পড়ত। আড্ডা জমাবার উৎকৃষ্ট জায়গা ছিল এটি।

একবার সুরেন্দ্র ছাতে উঠে একেবারে অবাক হয়ে যায়। বসন্তকাল। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যারাতে গোরস্থানের বিরাট ছাত জ্যোৎস্নায় আলোকিত। গঙ্গার উত্তরে হাওয়া বয়ে আসছিল। তারই মধ্যে মাদুর বিছিয়ে এক এক দল এক এক কাজে ব্যস্ত। কেউ নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে, কেউ হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গীতচর্চায় ব্যস্ত। কেউ আবার সাহিত্য সাধনায় বিভোর। এরই মধ্যে

চা ও জল খাবার আসত। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তামাকের গুড় গুড় আওয়াজ ও সিগারেটের ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠত।

এই সাহিত্য-গোষ্ঠী পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শরতের উপর ছিল। কোন রচনা নির্বাচনের ভারও ছিল তার উপরেই। সদস্যেরা সাত দিনের ভেতর নিজেদের লেখা এনে সভায় শোনাত। প্রত্যেকটি রচনা সম্বন্ধে বিচার পরামর্শ সভাপতি শরৎ স্বয়ং করত। লেখার ভুল সংশোধন করে নম্বর দিত। কবিতা লেখায় সবার প্রথম ছিল নিরুপমা। অনেকে তাকে হিংসে করত। লোকেরা কানাকানি করত যে নিরুপমার প্রতি শরতের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে। অথচ নিরুপমার সঙ্গে শরতের কোন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। নিরুপমাও দাদার বন্ধু হিসেবেই শরৎকে শ্রদ্ধা করত। শরৎ কিন্তু খুব উৎসাহ নিয়ে নিরুপমার কবিতাগুলি দেখত এবং ভাব ও আবেগের যে কৃপণতা বা অভাব সে কথা বিভূতিকে বলেছিল, 'একই ভাব বারবার না লিখে বুড়ি যদি চিন্তা করে অন্য ধরনের কবিতা লেখে তাহলে উন্নতি করতে পারে।' শরতের এই অভিযোগকে বিভূতি কবিতায় বদল করে নিরুপমাকে শোনাল,

'আরো যাও, আরো যাও দূরে
থামিওনা আপনার সুরে।'

নিরুপমা অবশ্য এরকম অভিযোগে প্রেরণা ও উৎসাহই পেয়েছিল। শরৎকে খুশী করার জন্য সে আরও পরিশ্রম সহকারে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করে। শরৎ কবিতগুলির চতুর্দিকে কাটাকাটি করে অনেক কিছু বদলে দিত। একদিন শরৎ বিভূতিকে বলল, 'বুড়ি যদি চেষ্টা করে তাহলে গদ্যও লিখতে পারবে।'

নিরুপমার অবশ্য বিশ্বাস হয়নি যে, সে কোনদিন গল্পও লিখতে পারবে। শরতের সব লেখাই সে অভিভূত হয়ে পড়ত, এবং দু-তিন বছরের ভেতর সে শরতের লেখা 'বাসা,'[৬] 'বোঝা,' 'কোরেলগ্রাম,'[৭] 'অনুপমার প্রেম,' 'কাশীনাথ,' 'চন্দ্রনাথ,' 'শিশু' (বড়দিদি), 'হরিচরণ,' 'বাল্যস্মৃতি,' 'শুভদা' এবং 'দেবদাস' সব পড়ে ফেলেছিল। কিছুদিন আগে মেজবৌদি তাকে একটা বড় খাতা দিয়েছিলেন। খাতাটিতে অতিসুন্দর হরফে লেখা ছিল 'অভিমান'।[৮]

৬. শরৎ এটি স্বয়ং নষ্ট করে দেয়।
৭. পরবর্তীকালে এটি আবার লেখা হয় এবং 'ছবি' নামে প্রকাশিত হয়।
৮. এটি শরতের বাল্যসখা কেদারনাথের কাছে ছিল। রচনাকাল—১৮৯৮-৯৯ সাল।

এটি শরৎকৃত মিসেস হেনরি উডের 'ইস্টলীনে'র ছায়ানুবাদ। শরতের মনে মনে অভিমানের যে ঝড় তাকে ক্ষতবিক্ষত করছিল, সেই আবেগেই সে এটি অনুবাদ করে। বইখানি পড়ে নিরুপমা মুগ্ধ হয়ে যায়।

ঠিক এই সময়েই শরৎ মেরী কোরেলির উপন্যাস 'মাইটি এ্যাটম'-এর অনুবাদ 'পাষাণ' নামে শুরু করেছিল। এ বইখানিও নিরুপমা পড়ে। বইটিতে একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যে যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা নিরুপমাকে অভিভূত করে তোলে। এভাবে শরতের লেখার প্রভাব অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাকে গদ্য রচনার প্রতি প্রেরণা জোগায়।

১৪.

এই সময় নিরুপমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী, সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুপমার সম্পর্কীয় ভাই সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে পড়তে আসত। সৌরীন্দ্র ছিল বিভূতির সহপাঠী, দুজনে ভাবও খুব। প্রায়ই পরস্পরের বাড়ি যাওয়া-আসা চলত। ক্রিকেট খেলাও পুরোদমে চলত। একদিন[১] সৌরীন্দ্রর হাতে চোট লাগে। খেলা তার পক্ষে অসম্ভব। বিভূতি তার হাতে একটা খাতা দিয়ে বলল, নে তুই বরং বসে বসে এই গল্পগুলো পড়। খাতাখানি খুলে সৌরীন্দ্র অবাক হয়ে দেখে যে, প্রথম পাতায় মুক্তাক্ষরে লেখা 'বাগান' আর অন্য পাতাতে ইংরেজীতে লেখা নামের প্রথমাক্ষর, এস, টি, সি, লারা। এস, টি মানে শরৎচন্দ্র, সি. মানে চট্টোপাধ্যায় আর লারা মানে ন্যাড়া। খাতার লেখা গল্পগুলি পড়ে নিরুপমার মত সৌরীন্দ্রও মুগ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শরতের সঙ্গে তখনও তার পরিচয় হয়নি। প্রায় একমাস বাদে নিরুপমার কোন ব্রত উপলক্ষে বাড়িতে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সৌরীন্দ্রও সেখানে নিমন্ত্রিত। গিয়ে দেখে যে বৈঠকখানায় একটা বড় টেবিলের সামনের

১. ১৮৯৯-এর শেষ দিকে।

একটা চেয়ারে অতি ক্ষীণকায় একজন বসে। যেন বহুদিনের রুগী। মাথায় অবিন্যস্ত রুক্ষ স্বল্প লম্বা চুল, এলোমেলো একটু দাড়ি। সামনে মোটা একটা বই খুলে তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আবার মাথায় হাত বুলিয়ে কি জানি ভাবছে।

সৌরীন্দ্র অবাক হয়ে বসলে পরে বিভূতি ডাকল 'শরৎদা'। হঠাৎ শরৎ বিভূতির দিকে চাইলে, বিভূতি বলল, 'শরৎদা এই আমার বন্ধু সৌরীন্দ্র। দারুন রৈবিক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তোমার গল্প পড়ে সেদিন কিন্তু সৌরীন্দ্র সমালোচনা করেছিল।' সৌরীন্দ্রর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল শরৎ। দীপ্তিময় তীক্ষ্ণ সে দৃষ্টির প্রতি মানুষ সহজেই আকৃষ্ট হয়। সৌরীন্দ্র সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হল।

শরৎ সৌরীন্দ্রকে জিজ্ঞেস করল—'তুমি গল্প লেখ ?'

সৌরীন্দ্র বলল–'না।'

বিভূতি বলল—'সৌরীন্দ্র কিন্তু বেশ ভাল কবিতা লেখে।'

শরতের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে বসে সৌরীন্দ্র অস্বস্তি বোধ করছিল, একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি গল্প লেখ না কেন ?'

সৌরীন্দ্র বলল, 'লিখতে পারি না তাই লিখি না।'

শরৎ বলল—'এ কেমন করে হয়। পদ্য লিখতে পারো আর গল্প লিখতে পার না। একটু চেষ্টা করেই দেখ না। গল্প কেমন হয় বা কাকে গল্প বলা হয় এ জ্ঞান তো তোমার আছে। বিভূতির কাছে আমার গল্পের যে সমালোচনা তুমি করেছ সে আমি শুনেছি এবং এও বুঝেছি যে গল্প সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বেশ গভীর। তুমি গল্প লেখ। অন্তত চেষ্টা কর।'

নিমেষের মধ্যে সৌরীন্দ্রর সকল লজ্জা, সংকোচ কেটে গেল, বলল,— 'লিখব।' ক্রমশ দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি হত। শরৎচন্দ্র 'শিশু' (বড়দিদি) গল্পের শেষের দুলাইন এ ভাবে লিখেছিল,—'পরলোকে সুরেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে মাধবীকে একটু স্থান দিও ভগবান।' সৌরীন্দ্রমোহন আপত্তি করে বলেছিলেন,—'তুমি লেখক, কোন চরিত্রের উপর তোমার এতখানি মমতা থাকা উচিত নয়।'

এই কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে ভারি তর্ক হয়। শরৎ কিছুতেই সৌরীন্দ্র-মোহনের কথা মানতে রাজি হয়নি। কিন্তু সে ঘটনার প্রায় দু মাস পরে সে

বলেছিল, 'তুমি শুনে খুশী হবে সৌরীন্দ্র, শেষের ওই দুটো লাইন আমি কেটে দিয়েছি।'

ভাগলপুরে বেশিদিন সৌরীন্দ্রমোহনের থাকা হয়নি। পরের বছরেই সে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল,[২] যাবার সময়ে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সেই রচনাগুলি ক্রমশ ছাত্র সমিতিতে পড়া হয়। ছাত্র সমিতির সদস্যরা একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া এত সুন্দর গল্প আর কেউ লিখতে পারে না।' এই সাহিত্য-গোষ্ঠীর আর একজন সদস্য ছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র। একদিন একটি বাঁধানো খাতার (মাসিক পত্রিকা আকারে) উপর নাম দেন তিনি 'আলো'। তার নীচে সম্পাদকের স্থানে লেখেন, সতীশচন্দ্র মিত্র ও যোগেশচন্দ্র মজুমদার। এ পরামর্শ যেহেতু শরৎ দিয়েছিল, তাই খাতার পাতাগুলি ভরার ভার তার উপরেই পড়ে। তার বিশ্বাস ছিল যে, সাহিত্যরসিক বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহ পেয়ে এই পত্রিকাখানি দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তার সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। প্রায় পনেরো দিনের মাথায় সতীশচন্দ্র মারা যান। তার এই অকালমৃত্যুতে বন্ধুরা খুবই বেদনা পেয়েছিল, তার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা কিছু করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। গিরীন্দ্র প্রস্তাব দেয় যে, এই পত্রিকাখানিই 'ছায়া' নাম দিয়ে আবার ছাপা হোক। গিরীন্দ্রের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়।[৩] সম্পাদক হন যোগেশচন্দ্র মজুমদার। কিন্তু তাকে তুষ্ট করা খুব শক্ত ব্যাপার। বিভূতিভূষণ তার সম্বন্ধে কবিতা লিখে ফেলল,

> এই কুঞ্চিত কেশ, মার্জিত বেশ, ক্রিটিক যোগেশ ক্রুদ্ধ
> বলে দীনতার ছবি এই সব কবি কারাগারে হবি বদ্ধ।

এ-পত্রিকার জন্য শরৎ কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছিল। 'ক্ষুদ্রের গৌরব'[৪] নামে একটি প্রবন্ধ এবং 'আলো ও ছায়া' নামে একটি লঘু উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

লেখক বেশ-কয়েকজন ছিল কিন্তু লেখিকা কেবল একজনই ছিল, অন্তঃপুর-চারিণী বিধবা নিরুপমা। তার লেখা এই পত্রিকায় 'শ্রী দেবী'র নামে প্রকাশিত

২. ১৯০১ সাল।

৩. ২৩এপ্রিল, সোমবার ১৯০০ সাল।

৪. এতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ছাপ আছে। জুলাই ১৯০১ সাল।

হয়। সে-সময় কবিতা ছাড়াও সে গল্প লিখতে আরম্ভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে সৌরীন্দ্র কলকাতায় 'তরণী' নামে একটি পত্রিকা বের করে। সম্পর্কে শরতের মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার বন্ধু ছিল। দুটি পত্রিকার মধ্যে ডাকযোগে আদান-প্রদান হত। একে অপরের খুব সমালোচনা করত। 'ছায়া' দলের সদস্যরা একটি বোর্ড তৈরী করেছিল, যাদের কাজ ছিল 'তরণীর' সব লেখা পড়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা লেখা। তারপর সম্পাদক মশাই এমন কৌশলে তার সম্পাদনা করতেন যে গল্প বা প্রবন্ধের মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু বিষটুকু থেকে যেত। অবশ্য 'তরণীর' তরফ থেকেও সেরকমই তেতো জবাব আসত। কেউ কাউকে এতটুকু খাতির করত না। কিন্তু শরৎ এসব ব্যাপারে রস পেত না, ক্রমাগত লেখাই তার মুখ্য কাজ ছিল।

১৫

একটা সময় এমন আসে যখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভীপ্সা মূর্ত রূপ নিতে শুরু করে। যদি কোনরকম বাধা পথরোধ করে দাঁড়ায় তাহলে অভি-ব্যক্তির অন্য পথ সে খুঁজে নেয়। ঠিক এইরকমই এক পরিস্থিতিতে শরতের জীবন চরম উপেক্ষা ও অনন্ত আশার আলোছায়ায় কাটছিল। না ছিল সাধ্য, না ছিল স্নেহময় হাতের বরাভয়। সহানুভূতি ও প্রেরণার অমৃত বাণী শোনাবারও কেউ ছিল না, মায়ের মৃত্যুর পর জীবনে মধুর বলতে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু শরতের নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যার ফলে অতিশয় ভাবপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও জীবনে কোথাও তাকে হার মানতে দেয়নি। নিজের রাগ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, অভাব ও আদর্শের অভিব্যক্তির পথ সে খুঁজে পেয়েছিল এবং সেটুকুই তার মনে জুগিয়েছিল বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। সৃষ্টিকার্যের এই দিনগুলিতে সে প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। এ-বয়সে প্রায় সক

তরুণদের মনই প্রেমের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। নানান ধরনের ভাবনা চিন্তায় মন ও মস্তিষ্কে আলোড়ন ওঠে। কত বৈচিত্র্য ও কতই না বিরোধাভাস। রক্ত-মাংসের প্রেমিক না থাকলেও কাল্পনিক প্রেমিকার সঙ্গেও সে ভূমিকা পালন করা যায়। একদিন সুরেন্দ্রমামার সঙ্গে শরৎ তার বাড়ি গিয়েছিল, কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে এ বাড়িরই একজন ছিল, সবই চেনা, গল্প আর শেষ হয় না। বেশ রাত হয়ে গেলে সুরেন্দ্র বলেছিল—চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। পথ চলতে চলতে আবার গল্পে মেতে উঠল, শেষ পর্যন্ত শরৎ বলল, চল মামা আমি তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আর সেদিন সেই রাত দুজনের পথে পথেই কেটে যায়। সেদিন যেন সরস্বতী শরতের জিহ্বায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। কথায় কথায় শরৎ বলেছিল, —'সত্যি আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি।' সুরেন্দ্র অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,—'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, তোমার কাছে কোনদিন কিছু লুকিয়েছি নাকি ?'

'সে কে ?'

'না, না, সে কথা বলব না।'

'বেশ—তার নাম কি তাই বল ?'

'তার নাম, নীরদা।'

শরৎ সেদিন এ-ও বলেছিল যে একবার কোন কাজে বেনিলি রাজ্যে তাকে যেতে হয়। পথেই সে নীরদার প্রেমে পড়ে। এ গল্প যেন সেই 'ঠাকুরমার ঝুলির' রাজকুমারের। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে শরৎ রাতের অন্ধকারে সাঁওতাল পরগণার দিকে পাড়ি দিত, তার প্রেমিকা যে সেখানে থাকে। তার মনে সর্বদা একটাই চিন্তা নীরদা রাত জেগে তার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। হঠাৎ সে ঘোড়াসুদ্ধ নদীতে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা বলে কি সে থেমেছিল নাকি ? ভিজে কাপড়ে বায়ুবেগে সে উড়ে গিয়েছিল।

সুরেন্দ্র ভারি অবাক্ হয়ে এই গল্প শুনছিল। নীরদাকে সে কোনদিন দেখেনি। কেউ তাকে দেখেনি। তবে এ নিয়ে অনেকেই বলাবলি করত। কেউ কেউ বলত শরৎ নাকি একটি ইহুদি মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে। অনেকে নাকি নানান জায়গায় সেই মেয়েটির সঙ্গে তাকে একান্তে কথা বলতে, ও বাঁশি বাজাতে দেখেছে। কিন্তু বড় আশ্চর্যের কথা যে, এ দৃশ্য একে অন্যকে কোনদিনই দেখাতে পারেনি। তার প্রেম এত মৌন, এত রহস্যময় ছিল যে, তার তাপটুকু

অঙ্গে স্পর্শ করতে পারত কিন্তু তার রূপ কোনদিন চোখে দেখা যেত না। কল্পনার রাজ্যে অতি সংগোপনে নীরদা এমনভাবে তার কাছে আসত, যেন ঘুমের ঘোরে চলছে। শরৎ লিখত সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখত, বলত না কিছুই। এ নীরবতা যখন শরতের অসহ্য হয়ে উঠত তখন হঠাৎ নীরদা কাছে এসে বসে বলত,—'কি লিখেছ শোনাও তো?' শরৎ তাকে পড়ে পড়ে শোনাত, জোরে জোরে তার নিঃশ্বাস ওঠা-পড়া করত। নীরদা মৃদু হেসে অভাগার কাঁধে নিজের মাথাটি রাখত। তখন তাকে তন্ময় হয়ে বাঁশি শুনিয়ে সে মুগ্ধ করে দিত। কখনও কখনও বা তার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যেত। নীরদা তাকে খুঁজতে বেরুত। খুঁজে পেতে ধরে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সবচেয়ে ভাল বিছানায় শোবার ব্যবস্থা করে দিত। তার জন্য নিজের হাতে তামাক সেজে দিত, সন্দেশ তৈরী করে খাওয়াতো। তারপর খাটের পাশেই মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে তার কথা শুনত, অন্তহীন কল্পনা রাজ্যের কথা…। কখনও বা অভিমান করে নীরদা উঠে চলে যেত। বলত—'তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তুমি তো কিছুই করো না।'

'আমি…আমি…স্রষ্টা। একদিন…'

'স্রষ্টা'! সে হেসে ফেলত, 'স্রষ্টা খিদের যন্ত্রণায় মরে। বখাটে, চরিত্রহীন, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে কেমন করে হতে পারে? বংশ মর্যাদার কথাও তো…।'

'বংশ মর্যাদা? বংশ মর্যাদায় আমি বিশ্বাসী নই। লোক-দেখানো বংশ মর্যাদার দোহাই দিয়ে দুটো প্রাণ তুমি নষ্ট করতে পার না।' তারপর রেগে গিয়ে বলত, 'তুমি একথা কেমন করে বলতে পারলে? তুমি এত আত্মাভি-মানী তা তো জানতাম না। আমি তোমায় চাই না, একেবারেই চাই না, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো…।' 'রাগ করলে? আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস না, আমি চাইও না যে কেউ আমায় ভালবাসুক। শুধু আমিই তোমায় ভালবাসতে চাই…।' নীরদার সঙ্গে এইরকমভাবে তার মান অভিমানের পালা চলত। কিন্তু কবে ও কখন তা কেউ জানত না। সবাই শুধু একটা কথাই জানত যে শরৎ দুশ্চরিত্র। এই নীরদা ছেলেবেলার বন্ধু ধীরুও হতে পারে। কত গল্পই না এই নামটির সঙ্গে যোগ হয়ে গিয়েছে। শোনা যায় শরৎকে বিয়ে করার জন্য সে পাগল ছিল। আবার একথাও শোনা যায় যে, বিধবা হওয়ার পর শরতের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

গল্প আর গল্প, আসল সত্য কোনদিনই ধরা পড়েনি। কিন্তু ধীরুর কথা থাক, নীরদার আর একটা নাম রাজলক্ষ্মীও হতে পারে, আবার নিরুপমাও নীরদা হতে পারে। সেও-তো শরতের লেখা পড়ে অভিভূত হয়ে যেত, শরৎও তার লেখা কবিতার প্রশংসা করত। এই প্রশংসার মাধ্যমে মনে মনে প্রেমের অঙ্কুর সব বাধা বিঘ্ন ঠেলে হয়তো জেগে উঠেছিল। একদিন বাড়িতে সে একাই ছিল। বাইরের বৈঠকখানায় শরৎ বসে ছিল। প্রায়ই সে সেখানে বসে পড়ত বা লিখত। সারাদিনে বেশিরভাগ সময়ই সেখানে তার কাটত। সেদিন হঠাৎ সে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'এই কেমন আছ?'

অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা বিধবা মেয়েটি হঠাৎ শরৎকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সেই একটি ক্ষণে যেন সহস্র যুগ একসঙ্গে সমাহিত হয়ে গিয়েছিল। কোন-রকমে সাহস সঞ্চয় করে বলেছিল, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও। এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি।'

'বুড়ি..................'

'......................'

'......................'

'যাও, তা না হলে............'

শরৎ মাথা নীচু করে সেখান থেকে চলে এসেছিল। এ ঘটনার দরুন নিরুপমা তাকে ক্ষমা করেনি। নিজের দাদার কাছে অভিযোগ করে বলেছিল —'তোমার বন্ধু কেমন লোক? বাড়িতে কেউ নেই, তবু সে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এসেছিল।'

দাদা শরতের সতীর্থ। সে ভেবেছিল, দরিদ্র নিরীহ ও তৎকালীন মানদণ্ডে দুঃসাহসী, অমিতাচারী শরতের এ সাহস কেমন করে কোথা থেকে এল? কি হবে তাহলে নীতিপরায়ণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই বিধবা মেয়েটির...? কিন্তু এদের দুজনের কি বিবাহ হতে পারে না? না, না, না, এ বড়ই দুঃসাহসের কাজ। সে-যুগে যদিও বিধবা-বিবাহের জন্য প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু সমাজ তা স্বীকার করেনি। তা হলে এ-প্রস্তাব কেমনভাবে স্বীকৃত হবে। হয়ত এ কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। সব কিছুই উর্বর কল্পনালোকে ঘটেছিল, অথবা...সে যাই হোক যৌবনের সেই প্রথম প্রেম তার ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে তার অন্তরে লীন হয়ে গিয়েছিল

চিরদিনের জন্য।

যদিও নিরুপমা তার লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিল কিন্তু তৎকালীন সামাজিক কঠোরতার মধ্যে তার মনের কথা জানার কোন উপায় ছিল না। জানার চেষ্টাও হয়ত অপমানজনক মনে করা যেতে পারত। সমাজপতিরা মাথা উঁচু করে নির্মম স্বরে হয়ত বলত,—'তুমি উচ্চকুলের বিধবাকে অসম্মান করতে চাও। যে মেয়ে পর-পুরুষের ছায়া পর্যন্ত দেখেনি, সে কেমন করে প্রেম করতে পারে ? এ কথা ভাবাও যে পাপ।'

কিন্তু একতরফা প্রেম, সে-ও তো কম শক্তিশালী নয়। আপনার মাঝেই সে চিরমধুর। সফলতাই প্রেমের একমাত্র পরিচয় নয়। মনে মনে কারুর জন্য নিজেকে বিসর্জন দেওয়া যায় না কি ? এই বেদনাকে স্নেহ বল, প্রেম বল, বয়সের দোষ বা, যাই বল না কেন, প্রেমের অস্তিত্বকে, এ কথা বলে অস্বীকার করা যায় না। তাতে প্রেমের প্রচণ্ড তৃষ্ণা, কিন্তু তৃপ্তির কোন পথ খোলা নেই। এই অতৃপ্তি বেদনা হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শরতের অন্তরে সমাহিত হয়ে গিয়েছিল। তার অভিব্যক্তি 'দেবদাস' বড়দিদি'তে দেখতে পাই। এই উপন্যাস দুটিতে অসফল প্রেমের সেই ব্যথাই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। নীরদা হোক বা নিরুপমা, 'দেবদাসে'র পারু হোক বা 'বড়দিদি'র মাধবী, সবাই এক ব্যর্থ প্রেমের প্রতিমা। নিরুপমা তাকে চলে যেতে বলেছিল, সুরেন্দ্রনাথ আসতে মাধবীও ছোটবোন প্রমীলাকে বলেছিল,—'প্রমীলা, মাস্টার মশাইকে বাহিরে যাইতে বলো।'

মাধবী কিন্তু নিরুপমার মত অত নির্মম নয়। সে যেতে বলেছে কিন্তু মিষ্ট ভাবে মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে ঘরের এককোনে সরে গিয়ে। পরে লজ্জা পেয়ে সুরেন্দ্রনাথের আদর যত্ন একটু আলগা করে দিয়েছিল।

এ-সব উপন্যাসের কথা হলেও ভিত্তিহীন নয়। শরতের অভিজ্ঞতার যথার্থতায় আধারিত।

অনেক বছর পর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সুপ্রসিদ্ধা কবি রাধারাণী দেবীকে লিখেছিলেন,—'যদি কোনদিন সম্ভব হয় তোমায় একটা গল্প শোনাব। শুনে গল্পের মতই অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বাস্তব সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই।'

এই গল্প কি নিরুপমার গল্প নয় ? এর যথার্থতা জানার কোন পথই আজ আর খোলা নেই কিন্তু এটুকু সবাই জানে, প্রেমে অকৃতকার্য হয়ে শরৎ

আত্মহত্যাও করতে পারেনি, সন্ন্যাসী হতেও পারেনি কিন্তু স্রষ্টা হবার পথ নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়েছিল। জীবনের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করার পথ তার সামনে উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। নীরদা বা নিরুপমার সঙ্গে মিলন তার ব্যক্তিগত তৃপ্তির কারণ হয়ত হতে পারত, কিন্তু সেই বিরহ, এক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীর জন্ম দিয়েছিল। বিরহবোধ জীবন ও যৌবনের আবেগ— বুদ্ধি তার থই পায় না, হৃদয় দিয়েই তার স্বরূপ চেনা যায়। শরৎ সাহিত্যে সেই বিরহবোধ মুখরিত হয়েছে। আদর্শ ও যথার্থ সমস্যা ও সমাধান সবকিছুই হৃদয়রসের সঞ্জীবনীতে ডুবে রয়েছে।

আর একদিক দিয়ে তার এ প্রবৃত্তি বল পায়। 'বঙ্গদর্শন'-এ 'চোখের বালি' পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজের যুগান্তকারী এই রচনায় বিধবার ভালবাসাকে ভাষা দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত আদর্শরক্ষার জন্য তাকে হত্যা করেননি। স্পষ্টভাবে তিনি বলেছিলেন—কোন বিশেষ অবস্থায় কোন বিধবা নারী যদি কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় তাতে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিনীর প্রণয়কে সার্থক না করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে হত্যা করিয়েছিলেন। সেজন্য শরৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনদিন ক্ষমা করেননি। রবীন্দ্রনাথের সংস্কার মুক্ত মননের জন্য তাঁকে সারাজীবন ধরে গুরুর আসনে বসিয়ে এসেছেন।

শরতের অন্তরের সংগ্রামের মূলে এই দুই সাহিত্যস্রষ্টা প্রথম থেকেই আসন পেতে বসেছিলেন।

১৬.

সংসারের প্রতি শরতের কোনদিনই কোন রকম আসক্তি ছিল না। যখন চাকরি করত তখনও নয়, যখন চাকরি ছেড়ে দিয়েছে তখনও নয়। সংসারের কুৎসিত রূপের থেকে মুখ ফিরিয়ে কল্পনার জগতে সে বাঁচতে চেয়েছিল। দুর্দান্ত অভাবের মধ্যেও তার সৌন্দর্য পিপাসা ম্লান হয় যায়নি। জীবনে সে যে পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল ছিল তার ঘরখানি সেই পরিমাণেই ছিল সাজানো-গোছানো। ঘরে দড়ির একটা খাট, একটা ফোল্ডিং টেবিল ছিল। জিনিস দুটো পেয়েছিল নিজের মামা ঠাকুরদাসের কাছ থেকে। চেয়ার রাজু নিজের হাতে তৈরী করে দিয়েছিল। টেবিলে তার প্রিয় লেখক হেনরি উড, মেরী কোরেলি, লিটন ও ডিকেন্সের বই সাজানো থাকত। লেখার সব সাজ-সরঞ্জাম সাজানো-গোছানো থাকত। কিন্তু সৌন্দর্যবোধের সাহায্যে পেটের আগুন নেভানো যায় না, সংসার কল্পনার সাহায্যে চলে না, সে চায় বৈষয়িক সামগ্রী। কিন্তু সে ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা তার ছিল না। কিন্তু তা নিয়ে তার ও তার বাপের মনে কোন উদ্বেগ বা ভাবনা ছিল না।

বিক্রয়-যোগ্য যাবতীয় জিনিস বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আত্মীয় ও বন্ধুরা কতদিন আর সাহায্য করতে পারে। ধার চাওয়ারও একটা শেষ আছে। আর যে শ্রেণীর লোক ছিলেন তারা তাতে, ভিক্ষা দেওয়ারও সাহস কারুর ছিল না। বাগান থেকে তরি-তরকারী সংগ্রহ করে আনলেই তো পেট ভরবে না। তাই কখনও কখনও তাকে ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতে হত— 'হে ভগবান, কিছুদিনের জন্য আমার জ্বর করে দাও, যাতে দু-বেলা খাওয়ার চিন্তা না করতে হয়।'

নিজের অকর্মণ্যতা লুকোবার জন্য ভগবানের আড়াল দিয়ে দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। পিতা-পুত্র দুজনেই দায়িত্বহীন, জ্ঞানহীন হয়ে

শুধু সৌন্দর্য সাধনায় ডুবে থেকে অসহ্য ক্ষুধার দাবি অস্বীকার করতে চাইত। ছেলে সাহিত্য-সাধনায় ব্যস্ত, ওদিকে কল্পনাবিলাসী বাপ এই অবস্থাতেও নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর পাথর সঞ্চয় করে রাখত। শরৎ জানতো যে বাবা তার শখের জিনিসগুলি সর্বদা তালা-চাবি দিয়ে রাখতেন। শরতের তখন পয়সার বড় দরকার। ওই অবস্থাতেও সে পরকে সাহায্য করা ছাড়েনি। একদিন ভাবল, বাবা এই পাথরগুলো নিয়ে কীই বা করবেন, তার চেয়ে কারুর কাজে যদি লাগে সেই ভাল।

বাপের নজর বাঁচিয়ে একদিন সবকটি পাথর বের করে নিল। এ-কথা বেশিদিন চাপা থাকেনি। গরীবের সংসারে সেই তো একমাত্র সম্পত্তি। মোতিলাল স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। শেষে শরৎকে ডেকে বললেন,—'এই ছোঁড়া, তুই পাথরগুলো নিয়েছিস ?'

শরৎ উত্তর দিয়েছিল—'হ্যাঁ, নিয়েছি।'

'কেন নিয়েছিস ?'

'আমার পয়সার দরকার ছিল। আর পাথরগুলো কোন কাজে লাগছিল না।'

বাপের রাগের আর সীমা, পরিসীমা রইল না। অসহায় দুর্বল মানুষ যখন রেগে ওঠে তখন সে সব সীমার বাইরে চলে যায়। অত্যন্ত কড়া কথায় মোতিলাল শরৎকে ভৎর্সনা করে বলেন,—'তোর লজ্জা করে না ? জোয়ান ছেলে, কিছু করতে পারিস না ? সবাই খিদেয় মরছে আর তুই কিনা কটা পয়সার জন্য আমার শখের জমানো পাথরগুলো নিয়ে গেলি ?'

শরৎ অবাক হয়ে বাপের দিকে তাকিয়েছিল। সন্তানের জন্য স্বপ্নদর্শী বাপের মনে বড় দয়া মায়া ছিল। সবরকম দুষ্টুমি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বাবা তাকে কোনদিন দুটো কড়া কথা বলেননি, আর আজ সামান্য নিষ্প্রাণ পাথরের জন্য এমন কটু কথা তিনি বলতে পারলেন ? শরতের ভাবুক মনে বড় বেদনা হল। সেই মুহূর্তে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু তার গৃহত্যাগের এইটিই একমাত্র কারণ নয়। বাড়িতে একটি ঝি ছিল, সে রান্নার কাজ ও ছোট ভাইবোনেদের দেখাশোনা করত। ঝি-টি কখনও কখনও মার-ধোর পর্যন্ত করত। এই নিয়ে বাপের সঙ্গে শরতের একদিন কথা কাটাকাটি হয়। বাবা ঝি-এর পক্ষ নেন। বাড়ির অবস্থার কথা ভাবলে তাঁকে অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না। ঝি-এর সাহায্যেই কোনরকমে সংসার

চলছিল। কিন্তু শরৎ একথা মানতে রাজি ছিল না। তার মনে হয়েছিল বাবার উপর ঝি-এর অনুচিত প্রভাব রয়েছে।[১] কিন্তু কীই বা তার করার ছিল। সে নিজেও কতকাংশে এজন্য দায়ী, তাই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

শরতের কোন কাজের পেছনে কোন একটা কারণ থাকত না। যদি নাও হত লোকেরা মনে মনে গড়ে নিত। তাই তার গৃহত্যাগের একটা কারণ এ-ও শোনা গিয়েছিল যে তার প্রেমিকা তাকে ঠকিয়ে কোথাও চলে গেছে; আর বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল শরৎ প্রতিজ্ঞা করে বসেছে—আমি তাকে খুঁজবই।

যে কারণেই হোক, কিছু পাবার ব্যথায় ব্যথিত দিশাহারা শরৎ আর একবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিল।[২]

১৭.

শ্রীকান্তের মতই ঘুরতে ঘুরতে একদিন শরৎ দেখে যে আমবাগানের ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তখুনি সেখানে গিয়ে দেখে যে একজন খাসা সন্ন্যাসীর আশ্রম। প্রকাণ্ড ধুনী জ্বলছে, ঘটিতে চায়ের জল চাপানো হয়েছে। একজন সাধু চোখ খুলে বসে রয়েছেন, কাছেই গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম ছড়িয়ে রয়েছে, দুধের জন্য একটি গোরু ও ছাগল রয়েছে। উট ও টাট্টু ঘোড়াও আছে। ভাঙ ছাঁকবার ব্যবস্থাও আছে। শরৎ এগিয়ে গিয়ে সাধুর পা ছুঁয়ে বিনম্র গলায় বলল, আমি গৃহত্যাগী মুক্তির পথান্বেষী, হতভাগ্য শিশু। দয়া করে আপনার চরণ সেবার আজ্ঞা দিন। সাধু হেসে মাথা নেড়ে বললেন,—বেটা, বাড়ি ফিরে যা। এ পথ বড়ই দুর্গম।

---

১. শরৎচন্দ্র যখন বিখ্যাত হয়ে ভাগলপুরে আসেন, সেই ঝি-টি দেখা করতে এলে তাকে তিনি প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন।

২. জুলাই, ১৯০১-এর পর। কারণ সেই তারিখে তাঁর একটি লেখা 'ক্ষুদ্রের গৌরব' হস্তলিখিত পত্রিকা 'ছায়া'তে পাওয়া যায়।

শরৎ করুণ সুরে বলল, বাবাজী, কত পাপী, তাপী মানুষ আপনার মত সাধুর চরণ ধরে মুক্তি পেয়েছে, আমি কি আপনার চরণে থেকে মুক্তি পেতে পারি না। বাবাজী প্রসন্ন হলেন, 'তুই ঠিক বলছিস, আচ্ছা বেটা, ভগবানের যখন তাই ইচ্ছা তাহলে এখানেই থেকে যা।'

শরৎ সেই গুরুজীর দলে স্থান পেল। গাঁজা তৈরী করতে সে ওস্তাদ ছিলই, বাবাজীকে প্রসন্ন করতে তার দেরী হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে দীক্ষা নিয়ে গেরুয়া কাপড় ও রুদ্রাক্ষের মালা পরে সে বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। বেশ কদিন পর্যন্ত চেলাগিরি করে বাবাজীর সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোন এক জায়গায় বেশীদিন থাকা তার অসহ্য ঠেকত, তাই একদিন দলছাড়া হয়ে পড়ল। এক ভক্ত পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, সে সময় বসন্তের ভারি প্রকোপ। সেই পরিবারের সবার বসন্ত হয়। শরৎ নিজ স্বভাবানুযায়ী তাদের সেবায় মেতে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা ভাল হয়ে উঠল। শরতের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। শরৎকে তারা তাদের সঙ্গে যেতে বলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় শরৎ জ্বরে পড়ে। আর সেই ভদ্র পরিবারের লোকেরা তাকে একা অসুস্থ অবস্থায় এমনভাবে ফেলে চলে যায় যেন শরতের সঙ্গে কোনদিন কোন পরিচয় ছিল না। জ্বর নিয়েই সে ষ্টেশনের দিকে রওনা দেয়। পথে এক বুড়ো বিহারী তাকে দয়া করে নিজের গাড়িতে বসিয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। তাকে নিজের সঙ্গে যাওয়ার কথাও বুড়ো বলে।

কতক্ষণ ষ্টেশনে সে পড়েছিল, কেমনভাবে সুস্থ হয়েছিল, সে কথা কেউ জানে না। এটুকু শুধু শরতের মনে ছিল যে একটি গরীব বাঙালী ছেলে নিজের ছেঁড়া বিছানা তাকে পেতে দিয়ে গিয়েছিল। গরম দুধ এনে বলেছিল, 'ভয়ের কিছু নেই ভাল হয়ে যাবে। বাড়ির ঠিকানা বল, আমি টেলিগ্রাম করে দেব।'

কিন্তু শরৎ কাউকে কিছু বলেনি, ভাল না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকে গিয়েছিল। সেই ছেলেটি ও ষ্টেশনের অন্যান্য লোকেরা সবসময় তার দেখা শোনা করেছিল। যখন চলা ফেরা করার সামর্থ্য হল তখন মজঃফরপুরে চলে যায়। সেখানে একটা ধর্মশালায় ওঠে। তখনও পর্যন্ত তার পরনে সন্ন্যাসীর বেশই ছিল, কারণ এ বেশে ভিক্ষে পেতে অসুবিধে হয় না।

একদিন বাঙালীদের ক্লাবে গিয়ে সে বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলে,—'মুঝে এক পোষ্টকার্ড চাহিয়ে, আউর কলম ভী। চিঠ্‌টি লিখনা চাহতা হুঁ।'

পোষ্টকার্ড কলম নিয়ে ক্লাবঘরের একটা কোণে বসে সে চিঠি লিখতে আরম্ভ করে। চারপাশে বাচ্চা ছেলেরা ঘোরাফেরা করছিল। সন্ন্যাসীকে চিঠি লিখতে দেখে সবাই কৌতূহলের সঙ্গে উঁকি মারছিল। তারা দেখে, অত্যন্ত সুন্দর বাংলা হরফে সন্ন্যাসী চিঠি লিখছে।

এক-কান থেকে দশ-কান হতে হতে ক্লাবের সদস্যদের কানেও এ কথা পৌঁছল। সবার মনেই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল হয়। প্রমথনাথ ভট্ট নামে একটি যুবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বাংলায় জিজ্ঞেস করে—'আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন'?

শরৎ হেসে জবাব দিয়েছিল,—'আমি বিহারী, ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাই।'

তার হাসিতেই রহস্য ধরা পড়ে। প্রমথ বলেছিল,—বেশ যা হোক! আপনি মোটেও বিহারী নন, বাঙালী। এবার এই ছাতুখোরদের ভাষা ছেড়ে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলুন।

তারপর সন্ন্যাসী-বেশ চুলোয় গেল কিন্তু অপরিচিত লোককে সে 'বিহারী' বলেই নিজের পরিচয় দিত আর ধর্মশালাতেই থাকত। একদিন ধর্মশালার ছাতে বসে তন্ময় হয়ে গান গাইছিল। সেই সময় এক তরুণ নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে মিষ্টি গানের সুর শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বাড়ির সবাই গান-পাগল, প্রায় প্রতিদিনই কোন-না-কোন গায়ক ডেকে এনে বাড়িতে মজলিস বসানো হত। নিশানাথ তখুনি ধর্মশালায় গিয়ে শরৎকে বলেছিল, 'আপনি ভারি সুন্দর গান করেন তো? কোথায় বাড়ি আপনার?'

শরৎ বলেছিল—'আমি ভাগলপুর থেকে এসেছি, আমার নাম শরৎচন্দ্র।' নিশানাথ বলেছিল 'ভাগলপুর! সেখানের শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাতনী অনুরূপা দেবী আমার বৌদি হন।'

শরৎ বলেছিল—'আমি তাকে চিনি, বিভূতির বোন নিরুপমার তিনি বন্ধু। সৌরীন্দ্রমোহনও আমার বন্ধু।'

নিশানাথ খুব খুশী হয়ে শরৎকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে। বড় ভাই শিখরনাথকে বলেছিল,—'ইনি ভাগলপুরের শরৎচন্দ্র, ভারি মিষ্টি গানের গলা।' শিখরনাথ হেসে বলেছিলেন—'আর ইনি খুব ভাল গল্প লিখতে পারেন। তোমার বৌদির মুখে এর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম।'

শরৎ সেদিন থেকেই নিশানাথের বাড়ি রয়ে গেল। প্রতিদিন গানের আসর বসত। সুগায়ক হিসেবে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার কত বছর পরেও শিখরনাথ সে কথা মনে করে বলতেন,—'আহা, ওই গানখানা শরৎ কি সুন্দরই না গাইত। এখনো কানে বাজে।'

এইভাবে দুমাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ বুঝতে পারল না। অনাথের মত মজঃফরপুরে এসে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই বন্ধু-বান্ধব ছাড়া একটি বিহারী যুবক, মহাদেব সাহুর সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। সে ধনী জমিদারের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া ও বাঙালীদের মতই কাপড়-চোপড় পরত। শরতের মিষ্টি গলা ও কথা বলার অদ্ভুত ক্ষমতায় সে মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। একদিন শরৎ বলেছিল, 'একবার আমি রানাঘাটে পুলিশের হাত থেকে একটি অবিবাহিতা মেয়েকে উদ্ধার করেছিলাম।' মহাদেব সাহুর এক বন্ধু হেসে জিজ্ঞেস করেছিল—'সত্যি ?'

'খাঁটি সত্যি।'

কিন্তু মহাদেব সাহুর বন্ধু রানাঘাটে গিয়ে খোঁজ খবর করে জানতে পারে যে গল্প শরতের মন-গড়া। সে যাই হোক তার মন-গড়া গল্প শুনে লোকে মুগ্ধ না হয়ে পারত না। যত সহজে সে লোককে গল্প শুনিয়ে আনন্দ দিত, ঠিক ততখানিই সহজভাবে রুগীর পরিচর্যা, মৃতদেহ দাহ করার মত শক্ত কাজও করতে দ্বিধা করত না।

কিছুদিনের মধ্যেই শরৎ ও মহাদেব সাহু এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল যে, মদ খাওয়া ও বেশ্যার বাড়ি যাওয়া, সব কাজ এক সঙ্গেই দুজনে করত। দুজনে মিলে আবার শিকার করতেও যেত। সাহু খুব ভাল বিলিয়ার্ড খেলতে পারত, শরৎ কিন্তু এ-খেলা শিখতে পারেনি। মোসাহেবের দল সারা দিনরাত সাহুকে ঘিরে পড়ে থাকত। সাহুর দাক্ষিণ্যে মদের নেশা অবশ্য বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু মদ খেয়ে শরৎ মাতাল হয়েছে এ কথা কেউ শোনেনি বা দেখেনি। মিষ্টি করুণ সুরে বাঁশি বাজিয়ে শুধু মানুষজন নয় সমস্ত পরিবেশকে সে মাতিয়ে রাখত।

মহাদেব সাহু বাঁশি শুনতে খুব ভালবাসত। মদ ও বেশ্যার পিছনে জলের মত টাকা ওড়াতে লাগল। তার আত্মীয়স্বজনেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা একথাই বলতে লাগলেন, 'ভাগলপুরের একটি বাঙালী ছেলে মহাদেবকে নষ্ট করে ফেলছে।'

অন্য দলের লোকেরাই বা নীরবে এ অপবাদ সইবে কেন? তারাও বলে বেড়াতে লাগল, 'সাহু, শরৎকে বদ করে তুলেছে।' দুই দলের পরস্পরের প্রতি এই দোষারোপ দুই বন্ধু যে জানত না এমন নয়, কিন্তু তারা কেন কিছুরই পরোয়া করত না। মনে মনে তারা হাসত, কারণ দুজনেই জানত যে পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই তারা সব কিছু শিখেছে। অপরের কাছে শেখার মত আর কিছুই বাকি ছিল না। দুজনের বন্ধুত্বের দরুন সাহু পেয়েছিল মনের মত এক বন্ধু, আর শরতের পয়সার দুঃখ ঘুচেছিল। মহাদেব সাহু শরৎকে নিজের আদর্শ মনে করত। শরৎ ঈশ্বর মানত না। দেখাদেখি সাহুও বলতে লাগল, 'শরৎদা যখন বলেছে ঈশ্বর নেই, তখন সত্যিই ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আমিও ভগবান আছে বলে বিশ্বাস করি না।'

সাহুর সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে যেত। শিখরনাথের বাড়িতে এ নিয়ে আপত্তি ওঠে। বাড়ির গিন্নি শরৎকে খুবই স্নেহ করতেন, অনেক রাত পর্যন্ত তার আসার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শরতের মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ বেরোয়, সব সময় তেমন হুঁশও থাকে না। শিখরনাথকে এ কথা জানাতে সেদিন শিখরনাথ শরৎকে বলেছিলেন,—তোমার এত দেরী করে বাড়ি ফেরা আর মদ খাওয়া, বাড়ির লোকেদের পছন্দ নয়, তোমার একটু সাবধান হওয়া দরকার।

নিশানাথের বাড়ির লোকেরা সঙ্গীত-প্রিয় হলেও বড় ধর্মপ্রাণ ছিল। শরৎ নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে আর নিশানাথের বাড়ি ফিরে যায়নি। একটা মেসে গিয়ে ওঠে, কিন্তু পকেটে পয়সা কোথায়? শেষ পর্যন্ত সে মহাদেব সাহুর কাছে চলে যায়। তখন থেকেই তার খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা সব সাহুর সঙ্গেই হত।

প্রেমের ব্যথায় তখনো সে অস্থির। তার প্রেমিকা নীরদা তার প্রতি রাগ করে ভাগলপুর ছেড়ে চলে গেছে এবং আবগারী এক দারোগার সঙ্গে এখানে এসে রয়েছে। সেই কথা শুনেই শরৎ নাকি মজঃফরপুরে গিয়েছিল। একদিন সে নীরদাকে খুঁজেও পেয়েছিল কিন্তু নীরদা তার দিকে চেয়েও দেখেনি।

কিন্তু প্রেম অন্ধ। তখনও শরতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নীরদা তাকে ভালবাসে। যখন তখন সুযোগ পেলেই শরৎ তার পিছু নিত। বিরক্ত হয়ে একদিন নীরদা দারোগাকে বলে দেয়। দারোগাবাবু সেদিনই শরৎকে

ধরে বেশ উত্তম-মধ্যম দেয়। এমন মার মেরেছিল যে বহুক্ষণ পর্যন্ত সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। তারপরও নীরদার ভালোবাসা সম্বন্ধে শরতের ভ্রম মিটেছিল কি না, কিংবা আগাগোড়াই এ-গল্প একটা বিরাট ভ্রম, তা জানা যায়নি। তবে মজঃফরপুরে থাকাকালীন নারী সাহচর্যের তার অভাব হয়নি। পুঁটি নামের একটি সুন্দরী বেশ্যাকে ডেকে সাহু প্রতিদিন নাচ-গানের জলসা করত। দুই বন্ধু প্রাণভরে আনন্দ করত।

সে সময়েই রাজবালা নামে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। তার জীবন-কাহিনী বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বাবা বিধুভূষণবাবু একজন উকিল ছিলেন। বাড়ি থেকে পালানো একটি বাঙালী বউকে তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর সেই মেয়েটির ভালবাসার মানুষ তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। শেষে উকিল ভদ্রলোক মেয়েটিকে বিয়ে করেন। তাদের দুই ছেলে ও চার মেয়ে হয়। মেয়েরা সবকটিই ভারি চমৎকার দেখতে। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজবালা সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ধবধবে ফর্সা রং, শরীরের গড়নে শক্ত বাঁধুনী, তীক্ষ্ণ নাক, আর মিষ্টি স্বভাব। ছেলেদের সঙ্গ তার বেশী ভাল লাগত। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অস্থির-মতি পুরুষদের সে হৃদয়বল্লভা হয়ে উঠেছিল। কাজে কাজেই শরৎ ও মহাদেব সাহুর সঙ্গেও তার পরিচয় হওয়া এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাজবালার রূপে শরৎ মুগ্ধ হয়ে উঠল। শরতের মজঃফরপুরের জীবনকে সবরকমে বোহেমিয়ন বলা যেতে পারে। শিকার করা, বেশ্যাসঙ্গ ও মদ এ সবের প্রাচুর্য যেখানে, সেখানে আর কীই বা আশা করা যেতে পারে। শরৎ দেখতে সুন্দর ছিল না, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না, তাছাড়া টাকা পয়সাও ছিল না। কিন্তু এমন কিছু গুণ ছিল নিশ্চয়ই যার দরুণ সবার সে প্রিয় ছিল। বিশেষ করে মেয়েরা তার বাক্‌চাতুর্যে আকৃষ্ট না হয়ে পারত না।

কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে থেকে একান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসার শক্তি ছিল তার অপরিসীম। অন্তরের বৈরাগী সত্তা তাকে দূরে টেনে নিয়ে যেত, বহুদূরে কোন নির্জন নদীতীরে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে একলা বসে থাকত, লিখত। না জানি কত লেখাই সে এ ভাবে লিখেছিল। 'ব্রহ্মদৈত্য' গল্প তারই মধ্যে একটি।

অসমাপ্ত 'চরিত্রহীনের' পাণ্ডুলিপিখানা তার কাছেই ছিল। এই

উপলক্ষেই প্রমথনাথের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রমথনাথ বর্ধমান জেলার ছেলে, মজঃফরপুরে কাকার কাছে থেকে পড়াশোনা করেছিল। এবারে সে কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কালান্তরে এই বন্ধুত্ব কয়েকটি বিষয়ে আদর্শ প্রমাণিত হয়।

বন্ধু-বান্ধব ছাড়া এখানকার অন্যান্য লোকেদের সঙ্গেও সে অবাধে মিশত। তাদের মধ্যে বেশ্যা, সাধু সন্ন্যাসী, জমিদার, কারকুন, উকিল, সঙ্গীত-প্রেমিক, ও ছোট জাতের লোক, সব রকমেরই মানুষই ছিল। তাদের সবার কথা সে শুনত। তাদের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত ও একান্তে বসে লিখত। কখনও সে লোকেদের রেখাচিত্র লিখে শোনাত। এই রেখা চিত্রগুলিতে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থাকত। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা অসম্মান ও কলঙ্কের বিষয়, সাহিত্যিকের সেটুকুই ক্ষমতা। বিশ্বকবি লিখেছেন,—

'জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।'

১৮.

এই বোহেমিয়ন জীবনের শেষ কোথায় গিয়ে হত জানি না কিন্তু হঠাৎই ভাগলপুর থেকে টেলিগ্রাম আসে— তোমার বাবা মারা গেছেন, তাড়াতাড়ি চলে এস।'

ভাগলপুর থেকে যখন শরৎ চলে গিয়েছিল, সংসারের আর্থিক অবস্থা সেদিনও শোচনীয় ছিল, আর চলে যাবার পর তা আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। মোতিলাল পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াত। ছেঁড়া চটি, সারা শরীর নোংরা মলিন, মাথার চুলে জট পড়েছে, পেটে অন্ন নেই, হাতে পয়সা নেই, এ অবস্থায় কল্পনা-বিলাসী লোকের পাগল হওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

সেই সময় মোতিলালের খুড়শ্বশুর অঘোরনাথ ভাগলপুরে আসেন। দুজনে

সতীর্থ ছিলেন। মোতিলাল তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য শ্বশুর বাড়িতে যান। শীতের সময়, মোতিলালের গায়ে কোন কাপড় ছিল না। যদিও অঘোরনাথ বাপ ও ছেলে কারুর প্রতিই প্রসন্ন ছিলেন না কিন্তু ছোটবেলার বন্ধুর এ দুর্দশা দেখে তার মন বেদনায় ভরে ওঠে। তিনি বলেছিলেন,—'তুমি এ বাড়ি থেকে চলে গেলে কেন হে, মোতিলাল ?'

'ভাল লাগল না ছোটকাকা।'

'এত শীতে, গায়ে কাপড় দাওনি, কেন ?'

'নেং যে।'

'শরৎ কোথায় ?'

'ঝগড়া করে কোথায় নিরুদ্দেশ।'

'আজকাল কিছু কাজ কর্ম আছে ?'

'না।'

'কি করে চলে ?'

এ-কথার মোতিলাল কোন জবাব দেননি। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়েছিল। যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন নিজের গায়ের কাপড় তাঁকে পরিয়ে হাতে একটি নোট গুঁজে দেন। মোতিলালের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বললেন,—'কদিন আছেন, ছোটকাকা ?'

'কালই যাব।'

মোতিলাল পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন,—'আর হয় তো দেখা হবে না, ছোটকাকা—বয়স হচ্ছে তো আমাদের।'[১]

সত্যি সত্যিই আর তাদের দেখা হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই অজস্র ভালবাসায় ভরা, পৃথিবীর অযোগ্য, স্বপ্নদর্শী মোতিলাল, প্রতিকূল পরিবেশের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে স্বর্গে গেলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শরৎ খুবই দুঃখ পেয়েছিল। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে চলে এসেছিল, আর বোহিমিয়ন জীবনের দিনগুলোতে, কে বলতে পারে কবার সে বাপের কথা ভেবেছিল। আজ বাবা নেই, তাঁর অগাধ ভালবাসার কত কথাই না মনে পড়ছিল। সেই মুহূর্তে সে ভাগলপুর রওনা হয়।

শরতের অবর্তমানে মণীন্দ্রনাথ মোতিলালের শেষকৃত্য করেছিল। শ্রাদ্ধের সময়ও সে-ই সাহায্য করেছিল। সে শরতের সহপাঠী কিন্তু আচারনিষ্ঠ গাঙ্গুলী

১. শরৎ পরিচয়—সুরেন্দ্রনাথ।

বংশের যথার্থ ছেলে। শরতের জীবনকে সে ঘৃণার চোখে দেখত, তবু যে ব্যক্তির শ্রাদ্ধের প্রশ্ন ছিল সে গাঙ্গুলী বংশের জামাই। সেই বংশের অনুরূপ শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত, তাই সে সাহায্য করেছিল।

মা আগেই গিয়েছিলেন, বাবাও আর রইলেন না। বড় বোন পরের ঘরে। তিনটি ছোট ভাই বোন আর সে নিজে। নিজের জন্য তার তেমন চিন্তা ছিল না, কিন্তু এই অসহায় অবোধ শিশুদের নিয়ে সে এখন কি করে। ছোট বোন সুশীলাকে বাড়িওয়ালী খুব ভালবাসত, সুশীলাকে সেই নিজের কাছে নেয়। ছোট ভাই প্রভাস এগার-বারো বছরের ছিল, শরৎ তাকে আসানসোল নিয়ে গিয়েছিল। তার এক বন্ধু সেখানে রেলে কাজ করত। কাজ শেখার জন্য প্রভাসকে সে বন্ধুর বাড়ি রেখে আসে।

বাকি রইল প্রকাশ, তাকে কার কাছে রাখে। কেউ তার নিজের নয়। অনেক ভেবে চিন্তে সে ছোট দাদামশায় অঘোরনাথের শরণাপন্ন হয়। শরতের প্রতি তিনি বড়ই অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু দিদিমার ভরসাতেই শরৎ সেখানে যাবার সাহস করেছিল। এই ছোট দিদিমা কতবার কতরকম বিপদে শরৎকে রক্ষা করেছিলেন। প্রকাশকে সঙ্গে করে সে জলপাইগুড়ি যায়। দাদামশায়ের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে। অঘোরনাথ প্রথমে রাগ করেন কিন্তু একে তো মোতিলাল মারা গিয়েছিল, অপরদিকে স্ত্রীর অনুরোধও আগ্রহের দরুন ছোট দাদামশায় আর না করতে পারেননি।

ছোট দিদিমা আর একবার শরৎকে বাঁচালেন। দাদামশায় উপেক্ষার সঙ্গে আর দিদিমা স্নেহের সঙ্গে বললেন, 'এখন থেকে বাড়ির সব দায়িত্ব তোমার উপর। এবার একটা কিছু তোমার করা উচিৎ।' শরৎ বলল,—'তাই করতে যাচ্ছি।' ভাই বোনের দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিহারকে শেষ নমস্কার জানিয়ে সে জীবিকার উদ্দেশে কলকাতায় গিয়ে পৌছল। কয়েকজন মামা সেখানে থাকতেন। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরতের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সাহিত্যের প্রতি তার বেশ অনুরাগ ছিল। আর একজন মামা লালমোহন গাঙ্গুলী কলকাতায় ওকালতি করতেন। ভাগলপুর কাছারির মামলার আপীল সে সময় কলকাতায় হত। লালমোহন মামা সেখানেই প্র্যাকটিস্ করতেন। তার কাছে থেকেই শরৎ চাকরির চেষ্টা করবে এ ব্যবস্থাই ঠিক হয়। একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে নিজের খরচপত্রের জন্য অভিভাবকদের কাছে হাত পাততে দ্বিধা হওয়াই স্বাভাবিক। এই দ্বিধা

কাটানোর জন্য সে হিন্দির দরখাস্তগুলিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করত। তার বদলে কিছু পয়সা সে পেত। আইন আদালতের ভাষা তার তত আয়ত্তে ছিল না তাই এ কাজে তার মনও বসত না। বাড়ির তরিতরকারি তাকেই বাজার থেকে নিয়ে আসতে হত, সাধারণ চাকরের মত আরও কয়েকটা কাজ তাকে করতে হত। অপমানজনক কথাও তাকে শুনতে হত। বাড়ির অন্দর মহলে যেতে হলে ভাগলপুরের মত এখানেও তাকে গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকতে হত। একদিন সে মামার চুলের ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ তিনি এসে পড়েন। ক্রোধের সীমা হারিয়ে ফেললেন, একবার শরতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তারপর সেই ব্রাশখানা হাতে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যেন বলতে চাইলেন—যে ব্রাশ তুমি একবার ব্যবহার করেছ, তা আর আমার যোগ্য রইল না।'

এই নিদারুণ ঘৃণা ও অপমানের জন্য তার মন বেদনায় ভারি হয়ে ওঠে। প্রায়ই সে ভাবত অপরের বাড়িতে এত অপমান সয়ে থাকার চেয়ে, রাস্তাঘাট, জঙ্গল, মরুভূমি অনেক ভাল। শরতের বড় বোন কলকাতার কাছেই গোবিন্দপুরে থাকত। শরতের ইচ্ছে ছিল সেখানে গিয়ে থাকে। গিরীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি থেকে মনে হয় সেখানে সে গিয়েও ছিল।[২] তখন সেখানে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবাদ চলছিল। তাই মুখুজ্জে মশাই শরতের জন্য কিছুই করতে পারেননি। স্ত্রীকে তিনি বলেছিলেন—'তুমি তো জান এ পল্লী গ্রাম, শরতের এখানে থাকা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। গ্রামের লোকেরা সমলোচনা করবে।' 'তাহলে……?' ভায়ের প্রতি করুণায় অনিলার মন ভরে ওঠে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি।

মুখুজ্জে মশায় বলেছিলেন,—'তাকে বলো আর কোথাও গিয়ে থাকুক, খরচ পত্রের ব্যবস্থা আমি করে দেব।' মুখুজ্জে মশায় সাহায্য করেওছিলেন কিন্তু কলকাতায় থাকা শরতের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের মেসো অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা তার মনে হয়। তিনি রেঙ্গুনে এডভোকেট ছিলেন। কয়েক বছর আগে সেবার তিনি ভাগলপুরে এসেছিলেন। মোতিলালকে বলেছিলেন,—'ছেলেকে কলেজে কেন পাঠাচ্ছ? আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দাও। পড়াশোনা করে উকিল হতে দেরী হবে না। ভবিষ্যতে ভালমত উপার্জন করতে পারবে।'

---

২. ২৪ ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল।

অনেক কারণে সে-সময় শরতের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ তার সামনে জীবিকার প্রশ্ন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতার বহু লোক বর্মা সম্বন্ধে তাকে অনেক রকম গল্প শুনিয়েছিল। বলেছিল, অমুক লোক বর্মায় চাকরি করে পয়সাওয়ালা হয়ে গেছে। পয়সাকড়ি সেখানের রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে থাকে, শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা। জাহাজ থেকে নামলেই সাহেবরা বাঙালীদের কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে চাকরি দেয়।

এ-সব কথা শুনতে শুনতে শরতের ভবঘুরে মন তাকে বর্মা যাবার জন্য উৎসাহিত করে তুলেছিল। সে সময় অঘোরনাথ কলকাতায় এসেছিলেন এবং লালমোহনের বাড়িতেই উঠেছিলেন। বর্মা সম্বন্ধে এমন সব রোমান্টিক গল্প তিনি শরৎকে শোনালেন যে মনে মনে সে ঠিক করে ফেলে—বর্মা সে যাবেই।

এইরকম অনিশ্চিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তার মৌন সাহিত্য সাধনা নীরবে চলছিল। 'চরিত্রহীন' লেখা শুরু হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু মনে হয় সে সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না, এমন কি সৌরীন্দ্রমোহনও নয়। ভাগলপুরের এই পুরোন বন্ধু এখানেই থাকত ও প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যেয় সে শরতের কাছে আসত। তারপর দুজনে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। দুজনে মিলে খুব সাহিত্য আলোচনা করত।

একদিন সৌরীন্দ্র বলল,—'শরৎ! স্টার থিয়েটারে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক 'সাবিত্রী' অভিনীত হচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই দেখো।' শরৎ নাটকটি দেখে এসে সৌরীন্দ্রমোহনের উপর খুব এক চোট নিল। বলল, 'বাপরে বাপ। তোমার কি করে এই নাটক ভাল লাগল? সত্যবান না-মরা পর্যন্ত তেমন মন্দ হয়নি অমৃত মিত্র মাণ্ডব্যর অভিনয় ভালই করেছেন। কিন্তু সত্যবানের যা চেহারা তাকে সাবিত্রীর ছোট ভাই মনে হচ্ছিল। সত্যবানের শব কোলে নিয়ে সাবিত্রী গান গেয়েছে আশ্চর্যের ব্যাপার ওই অবস্থায় কেউ গান গাইতে পারে?'

সৌরীন্দ্র বলল, 'তুমি ওটাকে ঠিক সুর-লয়-তালের গানই বা ভাবছ কেন? ওই অবস্থায় মানুষ চিৎকার করে কাঁদে। তুমি কোথায় গেলে গো? আমার এখন কি হবে? ইত্যাদি, ইত্যাদি। শোকের সেই আবেগকে নাট্যকার গানের ছন্দ ও সুরে ব্যক্ত করেছেন।'

শরৎ বলল, 'তাই যদি হয় তাহলেও পর পর দুটো গান গাইবে? একটাই তো যথেষ্ট। আমার খুব খারাপ লেগেছে। গান গাইলে তো করুণ রসের শ্রাদ্ধ করা হয়। সামান্য ট্রাজেডিও উৎপন্ন করা যায় না।'

শরতের মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্ট এখানের পাথুরেঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে কাজ করছিল। প্রায়ই তার কাছে গিয়ে সে নিজের লেখার বিষয়ে আলোচনা করত। সে-ও দেখা করতে আসত। একদিন হঠাৎ গিরীন্দ্র বলল,—'শরৎ তুমি কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য গল্প লিখছ না কেন? পঁচিশ টাকা পুরস্কার।'

শরৎ জিজ্ঞেস করল,—'এই কুন্তলীন পুরস্কারটি কি জিনিস?'

গিরীন্দ্র বলল; "এখন স্বদেশী আমল, দেশপ্রেমিকরা স্বদেশী বস্তুকে খুব উৎসাহ দিচ্ছে, দেওয়াও উচিত। 'কুন্তলীন' একটি সুগন্ধি কেশতৈল। বউবাজারের এইচ. বসু এর নির্মাতা। তেলের প্রচারের জন্য তিনি এই প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। নামকরা বিখ্যাত লেখকেরা গল্পের মান নির্ণয় করবেন। পরে এ গল্পগুলো বই হিসাবেও ছাপা হবে।'

শরৎ বলল, 'স্বদেশীর ব্যাপার সে তো ভাল কথা কিন্তু গল্প লেখা তা-ও আবার পুরস্কারের জন্য, আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। এতবড় লেখকদের মধ্যে আমায় কে মান দেবে?' গিরীন্দ্র বলল, 'তুমি জান না, সত্যিই তুমি খুব ভাল গল্প লেখ। একটা গল্প তুমি লেখই না, দেখ, ঠিক পুরস্কার পাবে।'

কিন্তু চিরদিনের স্বভাবমত তখুনি সে গল্প লিখতে রাজী হয়নি। মামারা যতই আগ্রহ করেন, সে ততই হাঁ না, করতে করতে সময় নষ্ট করতে লাগল। শেষে গল্প দেবার শেষ দিনটি এসে পড়ল। গিরীন্দ্র আবার বলল, 'তুমি গল্প লিখছ না কেন? পুরস্কার না হয় না-ই পেলে। গল্প লেখ।'

অবশেষে শরৎ গল্প লিখতে রাজী হল। সেদিন সে যে গল্পটি লিখেছিল তার নাম ছিল 'মন্দির'। গল্প শেষ হতে হতে সন্ধ্যে হয়ে এল; গিরীন্দ্রকে সঙ্গে করে তখুনি সে কুন্তলীন কার্যালয়ে গিয়েছিল।

কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক বসু মহাশয় বলেছিলেন, 'শেষের দিনটির শেষ ক্ষণে গল্প নিয়ে এসেছ?' শরৎ বলেছিল, 'যদি সময় ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে গল্প নেবার জন্য আমি অনুরোধ করব না।'

বসু মহাশয় হেসে বলেছিলেন, 'না, না নেব না কেন? শেষ ক্ষণটিতে তো এসেই পড়েছ।'

গল্প দিয়ে শরৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। গল্পের উপর সে নিজের নাম দেয়নি, পুরস্কার সে পেতে পারে এ বিশ্বাস তার ছিল না। পুরস্কার না-পাওয়ার লজ্জা ও বেদনা সে সইতে পারত না, সেই ভয়ে নিজের নামের বদলে

সুরেন্দ্রনাথের নাম লিখে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রকে বলেছিল, 'আমি এই গল্পটা তোমার নামে পাঠিয়েছি, যদি ভাগ্যজোরে পুরস্কার পাই তা হলে, মোহিত সেন দ্বারা প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলী আমায় পাঠিয়ে দিও।'

হয়তো নামের জোরেই প্রতিযোগিতার ফলাফল যখন ঘোষণা করা হয় তখন দেখা যায় যে প্রথম পুরস্কার বাঙালী টোলা, ভাগলপুরের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছে। বন্ধুরা সুরেন্দ্রনাথকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাল। কিন্তু সুরেন্দ্রর মন গ্লানি ও লজ্জায় ভরে ওঠে। সে জানত যে এই যশ ও সম্মান তার প্রাপ্য নয় কিন্তু এ-যার প্রাপ্য, সেই শরৎ তো কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছে। দেড়শো গল্পের মধ্যে প্রথম হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু উদাসী শরৎ তো চিরদিন নিজেকে আড়ালে রেখেই আনন্দ পেত।

রেঙ্গুন যাওয়ার কথা সে কাউকে জানায়নি। তার মনে সন্দেহ ছিল যে বন্ধু বান্ধবেরা কেউই তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু না গিয়েই বা সে কি করবে। সম্পূর্ণ ধূসর জীবন সামনে পড়ে রয়েছে, আছে ছোট ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব, কাদের উপর এ-ভার সে ছেড়ে দেবে? যেমন করেই হোক উপার্জন তাকে করতেই হবে। শুধু দেবী মামাকে[৩] সে নিজের যাবার কথা জানিয়েছিল। গাড়ি ভাড়া তার কাছে ছিল না। কারুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে একদিন ভোর চারটের সময় সে ভবানীপুরের বাড়ি থেকে স্টীমার ঘাটের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়ল। দেবী মামা একা তার সঙ্গে ছিল। ভাড়া দেবার পর পকেটে তার একটি কি দুটি টাকা মাত্র ছিল। ভারতবর্ষে আবার কোনদিন ফিরে আসতে পারবে কি না, এ কথা ভাববার মত মানসিক অবস্থাও তার ছিল না।

এই পলায়নের সঙ্গে শরতের জীবন-নাটকের একটা অঙ্ক সমাপ্ত হয়। ছাব্বিশ বছর বয়স পেরিয়ে যৌবনের সূর্য মধ্যাকাশে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু হিমশীতল ঘন-কুয়াশায় তা ঢাকা ছিল। 'শ্রীকান্তে'র মত অপরের ইচ্ছেয় অপরের বাড়িতে থেকে বছরের পর বছর সে নিজের দেহকে কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে কোন মতে টেনে নিয়ে গেছে, কিন্তু মন? তাকে সে কোন্ রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছিল, কোন দিন আর সে মন সে ফিরে পায়নি।

এইভাবেই সেই উচ্ছৃঙ্খল বখাটে অল্পশিক্ষিত, নিঃসম্বল ব্যক্তি কোন্ বন্ধুহীন—লক্ষ্যহীন প্রবাসের পথে বেরিয়ে পড়েছিল।
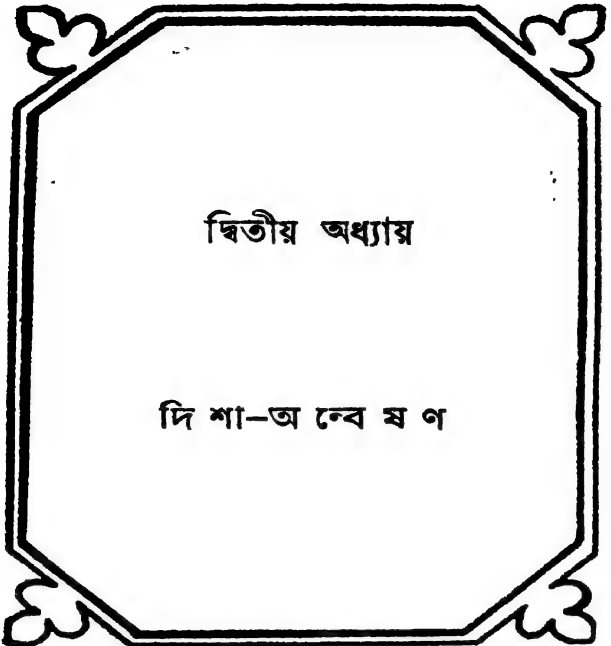
৩. দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মায়ের মৃত্যুর পর, 'তুই খেয়েছিস কিনা' একথা জিজ্ঞেস করবারও তার কেউ ছিল না। পথ চেয়ে বসে থাকার কেউ ছিল না। কারুর মনে এ ইচ্ছেও হত না যে জিজ্ঞেদ করে তার পরনের কিছু আছে কি না? নিজের খেয়াল খুশিতে অভিনয়, গান-বাজনা, তামাক-খাওয়া ইত্যাদিতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখত। সে জন্য অপমান তাকে সইতে হত। মামার বাড়িতে এ-সব কাজ দূষণীয় মনে করা হত। নিজের অসম্মান যে সে বুঝতে পারত না তা নয়, কিন্তু জানত যে, ধর্মগ্রন্থে যে আচার, সংহিতার বর্ণনা করা হয়েছে তা সকল সময়োপযোগী নয়। যেমন যেমন যুগ বদলায়, আচার সংহিতাও বদলে যায়। তাই হয়ত সব রকম অপমান আসলে তার মনে শক্তি জুগিয়েছিল। তার দিশাহারা মনের ভিতর যে সৌন্দর্য ও সাহিত্য-সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশে নিজস্ব জীবন তার পরিপূর্ণ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। দুঃখ শুধু উপভোক্তা হিসেবে সে সহ্য করেনি, দ্রষ্টার চোখ দিয়ে অনুভবও করেছিল।

দাসত্বের মুক্তি-নেতা রাষ্ট্রপতি লিঙ্কনের সঙ্গে শরতের তুলনা করা হয়ত সঙ্গত নয়, কিন্তু প্রারম্ভিক জীবনে কয়েকটি প্রকৃতি তাদের দুজনের প্রায় একই ধরনের ছিল। শারীরিক শক্তি প্রদর্শন, আমোদ-প্রমোদ অধ্যয়ন গল্প বলার কৌশল ও ভালবাসার বেদনা সম্বন্ধে দুজনেরই যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। লর্ড চার্লউড লিখেছেন,...সে অরাজক বিচারধারা-সম্পন্ন কয়েকজন লেখককে অধ্যয়ন করেছে, যাদের মধ্যে টমাস পেন, ওয়ালটেয়র এবং বোলনে প্রমুখ ছিলেন...মুর্গীর লড়াই, শারীরিক শক্তি প্রদর্শন, কুড়ুল, হাতুড়ি বা করাতের বিদ্যায়, তামাশা-মস্করা করার ইচ্ছে ইদানীং খুব বলবতী।...নির্জনপ্রিয়তা ও নিজের মধ্যে নিজেকে লীন করার প্রবৃত্তি তার বেড়ে গিয়েছিল।...লিঙ্কনের জীবনে প্রিয়তমার মৃত্যুর স্থায়ী প্রভাব দেখা যায়।

শরতের প্রিয়তমার মৃত্যু হয়নি কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছিল। এ বিচ্ছেদ তার জীবনে ভয়ঙ্কর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। কোথাও সে লিখেছিল,—'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'

সেইজন্যই কি সে অতদূরের পথে পা বাড়িয়েছিল?

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিশা–অন্বেষণ

১০

শ্রীকান্তের মতই ছোট্ট একটা লোহার ট্রাঙ্ক ও যৎসামান্য বিছানা-পত্র নিয়ে শরৎ যখন জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছল, ঘাট তখন লোকে লোকারণ্য বিরাট আকারের মোট-ঘাট বোঁচকা নিয়ে যাত্রীরা সপরিবারে সারা রাত জেটিতে এই আশায় বসে ছিল যে সকালে জাহাজে সুবিধে মতো একটু জায়গা পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার লোকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে চড়ার আগে ডাক্তারী পরীক্ষা হচ্ছে। কে জানে কেমন পরীক্ষা? সন্দেহজনক স্থানগুলিতে যখন ডাক্তার হাত দিচ্ছিল তখন ভয়ে লোকের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল এই ভেবে যে, কোন প্লেগের রুগী যাত্রীর সারিতে মিশে নেই তো? কারণ এই রোগ তখন বোম্বাই থেকেই বর্মায় ছড়িয়েছিল।

ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবার জাহাজে চড়ার পালা। জাহাজে চড়ার ব্যাপারটাও একটু অদ্ভুত ধরনের। কাঁটা-দেওয়া চক্রাকার একটা মেশিন সর্বক্ষণ আগু-পিছু ঘুরছে। উপরে গিয়ে তারপর নীচে জাহাজের গর্ভগৃহে নামতে হত, তারপর নিজের নিজের জায়গা দখল করে কম্বল-সতরঞ্চি বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করতে হত। শরৎ এখানে জায়গা পেল না, একেবারে উপরে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বসার যেটুকু জায়গা পেয়েছিল সেখান থেকেই যা কিছু দেখল, জানল, তাকে এককথায় ভারতদর্শন বললে মিথ্যে বলা হবে না।

শুধু কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার তো নয়, একভাবে প্রায় চারদিন শরৎ মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিল। যাত্রীদের মধ্যে এমন কতকগুলো লোক ছিল যারা প্রায়ই জাহাজে যাওয়া-আসা করে থাকে। আবার কিছু লোক চাকরি-বাকরির চেষ্টায় বর্মা যাচ্ছিল। অনেকেই আবার হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি ও অনুশাসনের ভয়ে ভাব-ভালবাসার লোকের সঙ্গে পালাচ্ছিল। কিন্তু এ-সব থেকেও ভয়ঙ্কর ছিল সাইক্লোনের অভিজ্ঞতা।

শরতের অবশ্য সাইক্লোন সম্বন্ধে সঠিক কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। প্রথমে অল্প অল্প বৃষ্টি, তারপর হাওয়ার বেগের সঙ্গে বৃষ্টি জোরে জোরে পড়তে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি, জোর হাওয়া, গভীর অন্ধকার, তার সঙ্গে জাহাজের দোলানি, সমুদ্রের বিশাল ঢেউ—সব মিলিয়ে মনকে ব্যাকুল করে তুলছিল। ঠিক সেই সময়েই এমন একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শোনা গেল যেন হাজার হাজার রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে, আর পৃথিবীকে দুপায়ের তলায় পেঁৎলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভয়ানক সামুদ্রিক হাওয়ার ঝাপটায় বাঁচাই দায় হয়ে উঠল। তার বিশাল ঢেউ জাহাজটাকে যেন গিলে ফেলবে। এক একটা ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছে আর চকমকির মত কিছু একটা জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারে জলরাশি দেখার উপায় ছিল না। কিন্তু চকমকির আলোয় ভয়ঙ্করী সমুদ্রের আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছিল। হঠাৎ জাহাজের মধ্যে শোনা গেল যাত্রীদের প্রাণ ফাটানো চিৎকার। সমুদ্রের দুর্নিবার মহাতরঙ্গ জাহাজের বুকে এমনভাবে আছড়ে পড়ল যে জাহাজ একেবারে জলে জলময়। মনে হল সবাই বুঝি ডুবেই যাবে কিন্তু তাণ্ডব যখন কমে এল তখন জাহাজের চতুর্দিকে তাকিয়ে মনে হল মহাপ্রলয়ের চেয়ে কিছু কম ক্ষতি হয়নি। মাথা গোঁজার মত একটু আশ্রয়ের জন্য মানুষ ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জীব জন্তু, পশু-পক্ষীরও আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, সব মিলিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড। সারারাত মানুষের ধাক্কায় মানুষ শিল নোড়ায় মসলা-পেষার মত পেষাই হতে লাগল। কয়েকজন আবার বমি করে ফেলল, পরিবেশ দুর্গন্ধময় হয়ে উঠল। খালাসি ও মেথর দিয়ে ডাক্তার জায়গাগুলো যতখানি সম্ভব পরিষ্কার করাবার চেষ্টা করছিলেন।

এক বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে দিয়ে শরৎ রেঙ্গুন পেঁীছল। যখন রেঙ্গুন কোর্টের কাছে জাহাজ পেঁীছল তখন সকলের মুখে মুখে করেনটিনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। রেঙ্গুন পেঁীছবার পর জাহাজের খালাসি ডেকের উপর এসে চিৎকার জুড়ে দিল, 'রঙ্গম সহর, রঙ্গম সহর, সবাই তৈরী হয়ে নাও করেনটাইনে যেতে হবে।' ওখানে না গিয়ে শহরে কেউ ঢুকতে পারবে না। প্লেগের দরুন বর্মা সরকার খুবই সজাগ। শহর থেকে আট মাইল দূরে কাঁটা বেড়া দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বানানো হয়েছিল। জাহাজের সব যাত্রীকে শহরে যাবার আগে এই কুঁড়ে ঘরে আট দশ দিন করে থাকতে

দেওয়া হত। অবশ্য শহরে কারো কোন পরিচিত লোক থাকলে নানা কৌশলে বেরিয়ে আসা যেত। শরৎ কাউকে খবর দেয়নি, উঁচু শ্রেণীর যাত্রীও সে ছিল না। কাজে কাজেই করেনটাইনে তাকে যেতেই হল। অভিজ্ঞতাই যার জীবনের সম্পদ, আর অনুভূতির রসেই যে সর্বদা স্নাত, তার পক্ষে করেনটাইনে থাকা খুব একটা দুঃখের ব্যাপার ছিল না। অন্তত জাহাজের মত সাইক্লোন এখানে ছিল না, আর ছাগল ভেড়ার মত গাদাগাদি করে থাকতেও হত না। করেনটাইনে থাকার মেয়াদ শেষ হলে একদিন দা-ঠাকুরের হোটেলে কাটিয়ে, সম্পর্কে মেসোমশায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে[১] শরৎ ভিখিরির মত গিয়ে পৌঁছল। উস্কো খুস্কো চুল, নোংরা জামাকাপড়, ছেঁড়া কামিজ, খালি পা, কাঁধে গামছা, তাছাড়া এতদিন নিজে রেঁধে বেড়ে খাওয়ার ফলে চেহারা আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। বাড়ি পৌঁছে মেসো অঘোরনাথকে দেখতেই শরৎ কেঁদে ফেলল। চোখের জলেই মেসোকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মেসো তো অবাক! জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে শরৎ! তুই হঠাৎ কেমন করে এলি?'

শরৎ বলল, 'আমায় করেনটাইনে আটকে রেখেছিল।'

মেসো অবাক হয়ে বললেন, 'তুই আমার নাম করলি না কেন? কত লোক আমার নাম করে বেরিয়ে আসছে আর তুই মুখ্যুর মত করেনটাইনে পড়ে থাকলি?'

অঘোরনাথ রেঙ্গুনের একজন নামকরা এডভোকেট। তাছাড়া তিনি ছিলেন শহরের একজন ধনী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। যেমন সুন্দর তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব, তেমনই ছিলেন তিনি খোলা মনের মানুষ। প্রতি শনিবার তাঁর বাড়িতে খুব খাওয়া দাওয়া ও গান-বাজনার আসর বসত। সব জাতির ভদ্র সম্মানিত ব্যক্তিরা আসরে যোগ দিতে আসতেন। অঘোরনাথের স্ত্রী সেখানকার আদব কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বাজার হাট তিনি নিজেই করতেন। জ্যাকেট সেমিজ, জুতো-মোজাও পরতেন। এই রকম একটা সৌখিন কেতাদুরস্ত সংসারে শরৎ অনাথের মতো গিয়ে পড়ল। মাসি ও মেসো দুজনেই অত্যন্ত ভালবাসা এবং আত্মীয়তার সঙ্গে শরৎকে আপ্যায়ন করেছিলেন। এ-সংসারে ভাগলপুরের অবহেলা ও উপেক্ষা যেমন ছিল না, তেমনই ছিল না ভবানীপুরের অপমান, ও উপদেশ। মেসো বললেন,—

১. জানুয়ারী—১৯০৩সাল।

'সবার আগে তুই বর্মী ভাষাটা শিখে আইনের বইগুলো পড়া আরম্ভ করে দে। তারপর তো তুই আমার মত উকিল হয়ে যাবি। এরই মধ্যে তোর একটা চাকরির ব্যবস্থাও করে দেব।'

তিন মাসের মধ্যেই বর্মা-রেলের অডিট অফিসে শরৎ চাকরি পেয়ে গেল। বাড়িতে মাসতুত বোনকে সঙ্গীত শিক্ষাও দিতে লাগল। দুঃখের[২] দিন হঠাৎ যেন উবে গেল। কিন্তু চিরদিনের দুর্ভাগ্য, কদিনের সুখ নিমেষে কেড়ে নিল। রেলের চাকরি দেড় বছরের বেশী টেঁকেনি আর বর্মী ভাষার পরীক্ষাতেও শরৎ কৃতকার্য হতে পারেনি। উকিল হওয়ার সাধ ও স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু সহজাত মিষ্ট স্বভাব ও গুণের জন্য বর্মার মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে সে বেশ প্রিয় হয়ে ওঠে। শরতের মিষ্ট কণ্ঠ, কথা বলার ভঙ্গি নানা ধরনের বানানো গল্প-বলা ও সেবা পরায়ণতায় সবাই তাকে সুনজরে দেখত। শরতের গান শুনবার জন্য শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অঘোরনাথের বাড়িতে আসতেন। এখানেই বিশ্ব পর্যটক গিরীন্দ্রনাথ সরকারের[২] সঙ্গে শরতের পরিচয় হয়। গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরতের ঘনিষ্ঠতা শুধু সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, খাওয়া দাওয়া এবং পানের ব্যাপারেও দুজনে দুজনের দোসর ছিল। হঠাৎই একদিন বাড়ি ফিরে শরৎ দেখে যে মেসোর নিউমোনিয়া হয়েছে। মাসি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সারারাত ধরে কয়েকদিন অক্লান্ত সেবা করেও মেসোকে বাঁচানো গেল না।[৩] আবার, শরতের সহায়-সম্বলহীন নিরাশ্রয় জীবন আরম্ভ হল। শরতের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো নিয়ে নানান ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। শরৎ নিজেও বুঝতে পেরেছিল রেঙ্গুনে থাকা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কোন-না-কোন মামা আসবেনই আর আবার সেই উপেক্ষা আর অবমাননার জীবন। তার চেয়ে তাদের আসার আগেই এখান থেকেই সরে পড়া ভাল। মাসির সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ এলেন। লোকমুখে শুনলেন, শরৎ অসুস্থ অবস্থায় কোন হাসপাতালে আছে। এমন রোগ, যে সবার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। মণিমামা শরতের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য মন থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সহজেই বুঝলেন রোগটা কী ধরনের। তিনি শরতের সঙ্গে দেখা করবারও চেষ্টা করলেন না।

২. শরতের বর্মা প্রবাসকালীন বিষয়ে ইনি একটি পুস্তক লিখেছিলেন, যা এখন অপ্রাপ্য। যদিও তাঁর লেখায় অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা পাওয়া যায়।

৩. ৩০ শে জানুয়ারী ১৯০৫ সাল।

এর কিছুদিন বাদে লালমোহন মামাও এসেছিলেন, তিনি শরৎকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। বোনকেও তিনি শরতের বিরুদ্ধে এমনভাবে বোঝালেন যে, মাসির বাড়িতে শরতের আর থাকা হল না। কারণ আর যাই হোক, এরপর শরৎ আর কোনদিন মাসির বাড়িতে পা দেয়নি।

২.

মাসির বাড়ি ছাড়ার পর থেকে শরৎ আবার ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে কারো বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকত আবার হয়ত হঠাৎই রেঙ্গুন ছেড়ে পেগু বা উত্তর বর্মায় পালিয়ে বেড়াত। বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মত (পোঙ্গী) একদেশ থেকে অন্যদেশ ঘুরে বেড়ানোর নেশা বাঁশির নেশার মতই তাকে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু নিজেকে নিয়ে ভাবলে তো আর চলবে না। দেশে ছোট ছোট ভাইবোনদের নিরাশ্রয় অসহায় ছেড়ে এসেছে, তাই পাঁচ ছয় মাস উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাবার পর এগজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস[১] এর অফিসে মাসিক ত্রিশ টাকায় একটা অস্থায়ী চাকরি নিল।

পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস, বর্মার ডেপুটি এগ্‌জামিনার শ্রীমণীন্দ্রকুমার মিত্র এগজিকিউটিভ ইনজিনীয়ারের কার্যালয়ে একাউন্টস দেখাশোনার ব্যাপারে পেগু এসেছিলেন। শরৎ সে-সময় সম্পর্কে তাঁরই এক ভাইয়ের বাড়িতে থাকত। শরতের গান সে বড় ভালবাসত। একদিন মিত্র মহাশয়ের সম্মানে সান্ধ্য-ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক বন্ধু-বান্ধবও সে নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। শরতের গান শোনার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে ছিল। কে-একজন বলে উঠল, 'শরৎদা ওই গানটা গাও না ভাই।—ওহে জীবন বল্লভ, সাধন দুর্লভ।' শরৎ বার বার মানা করা সত্ত্বেও কেউ তাকে ছাড়ল না, গান তাকে গাইতেই হল। সভ্য সমাজে আসার মত এই একটিই গুণ ছিল তার। শরৎ একটার পর একটা গাইতে লাগল আর মিত্র মহাশয় মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। মিত্র মহাশয় খুবই সরলপ্রাণ সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। মুগ্ধচিত্তে

১. জুলাই, ১৯০৫ সাল।

তিনি বললেন, 'শরৎদা আপনার গলায় নিশ্চয়ই যাদু আছে, কী মিষ্টি গলা আপনার।' শরৎ মৃদু হেসে চুপ করে রইল, কিন্তু এই গানের সূত্র ধরেই ক্রমশঃ দুজনে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মিত্র মহাশয়ের দয়াতেই শরৎ চাকরিটি পায় কিন্তু মাসখানেক পরে শরৎ পেগু চলে যায়। সেখানে এগ্‌জিকিউটিভ ইনজিনীয়ারের পদে পেগু ডিভিসনের অফিসে কাজ পায়।[২] সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর পাবলিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টে একাউণ্টশিপের পরীক্ষা দেয় কিন্তু সফল হতে পারেনি।

একের পর এক অনেকগুলো অস্থায়ী চাকরি করে। মাঝে মাঝে আবার বেকারও থাকতে হয়েছিল। এই অবসর সময়ে বাঁশি বাজাত, দাবা খেলত শিকার করত, আবার কখনও গেরুয়া বস্ত্র পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মত দিশাহীন যাত্রার পথে বেরিয়ে পড়ত। যখন ক্লান্তি বোধ করত রেঙ্গুন ফিরে আসত। বর্মায় একবার প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পৌঙ্গী অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুক হতে হয়। সেটা সাতদিনের জন্যও হতে পারে আবার কেউ কেউ আজীবনও পৌঙ্গী থেকে যেত। পৌঙ্গীর এই পোষাকে যথেষ্ট সম্মান পাওয়া যেত, আচরণেও যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকত, যেমন সিনেমা দেখা বা চুরুট খাওয়ার নিষেধ ছিল না। শরতের পৌঙ্গী হওয়ার প্রতি বিশেষ একটা ঝোঁক ছিল। লম্বা লম্বা চুল ও দাড়ি রাখতে ভালবাসত, ভাবত বাউলদের মত হাতে একতারা নিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত মিত্র মহাশয়ের কৃপায় এগ্‌জামিনার[৩] পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টসের রেঙ্গুন অফিসে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে একটা স্থায়ী চাকরি শরতের ভাগ্যে জুটে যায়। ভাল কাজের দরুন তিনমাস পরে মাসিক বেতন ৫০ টাকা থেকে ৬৫ টাকা করে দেওয়া হয়। এই চাকরি পাবার পর মনে হত শরতের অনিশ্চিত বোহেমিয়ন জীবনের বোধহয় পরিসমাপ্তি ঘটল। দশ বছর পর শরৎ যখন এই চাকরিতে ইস্তফা দেয় তখন তার বেতন প্রায় ৯০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল, আর তার অফিস বিভাগও একাউণ্টস জেনারেলের কার্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে সময় শরৎ মণীন্দ্র মিত্রের বাড়িতেই থাকত। সঙ্গীত ও দর্শনচর্চায় কেউই ক্লান্তি বোধ করত না। এছাড়া মিত্র মহাশয়ের ছেলেমেয়েদের শরৎ সঙ্গীত-শিক্ষাও দিত।

২. আগষ্ট, ১৯০৫ সাল।

৩. এপ্রিল, ১৯০৬ সাল।

রেঙ্গুনে বাঙালীদের আলাদা একটা ক্লাব ছিল, 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব'। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় সেখানে সঙ্গীত, নাটক ও অধ্যয়নের আসর বসত। ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। শরৎ এই ক্লাবের বিশিষ্ট গায়ক ছিল। তার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে ভাবুক শ্রোতারা ভাবে বিভোর হয়ে পড়ত। নীলকণ্ঠ, নিধুবাবু, দাশরথি রায় ইত্যাদি প্রাচীন কবিদের গান ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলী ও ভজনও সে ভাল গাইতে পারত। বাউল গান ও কীর্তন তার গলার যেন মধুবর্ষণ করত। সেদিন সে জ্ঞানদাসের এই পদটি গাইল :

'তোমার গরবে গরবিনী রাই
রূপসী তোমার রূপে।'

মনে হল যেন ওর রুগ্ন শীর্ণ গলাখানি সঙ্গীতের ভারে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। প্রাণের সবটুকু বেদনা ও সরসতা নিয়ে সে গাইছিল। তার মর্মের ক্রন্দন গানের ভিতর দিয়ে সবার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। ওই একটি পদের জোরে শরতের কত ভক্তই না জুটে গিয়েছিল। অফিসের বন্ধু-বান্ধবরাও শরৎকে ছাড়ত না। মেসে কারো একটা হারমোনিয়াম পড়ে ছিল ধুলোয় ভর্তি সেটাকেই ঝেড়ে মুছে বন্ধুরা শরতের হাতে তুলে দিল। বলল, শরৎদা, আজ তো গাইতেই হবে। শরৎ গাইল,—

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখব বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে ॥

বন্ধুরা এই গানটি কোন ভাল গাইয়ের মুখে শুনেছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রের দৃষ্টিতে হয়ত সে গায়কের গান শ্রেষ্ঠ হতে পারে কিন্তু যেখানে প্রাণের স্পর্শ মাখানো সঙ্গীত, সেখানে শরৎ নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতম গায়ক। তাই আজ সকল শ্রোতার চোখ অশ্রুসজল।

বহু বছর পর 'শেষ প্রশ্নে'র স্রষ্টা শিবনাথের সম্বন্ধে বলেছেন, 'শিবনাথ মদ্যপায়ী মাতাল হওয়ার জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত, বেশ্যালয়েও সে মাঝে-মধ্যে যায়, তথাপি সে উঁচুদরের গায়ক, তাই এতগুলি সব গুণ থাকা সত্বেও বড় বড় মজলিসে তার ডাক পড়ে।' শিবনাথ কি শরতের নিজেরই ছবি নয়? সুগায়ক হিসেবে শিবনাথের চেয়ে শরতের খ্যাতি কিছু কম ছিল না। গানের

জন্যই সে অনেকের বন্ধু ও বহুজনের সান্নিধ্যে আসে। এই সময়েই 'পলাশী যুদ্ধ' বইটির লেখক নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুন আসেন। 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে' তাঁর সম্মানার্থে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। মণীন্দ্রনাথ শরৎকে অনুরোধ করেন যে, 'এই সভার অভ্যর্থনা-সঙ্গীত কিন্তু তোমাকেই গাইতে হবে শরৎদা।' গান শরৎ গেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সবার অলক্ষ্যে পর্দার পিছনে বসে। বন্ধুদের সামনে গাওয়া সে এক ব্যাপার, আর বিশাল সভায় জনসমুদ্রের সামনে গান গাওয়া বা কিছু বলা শরৎ সবিনয়ে এড়িয়ে যেত। নিজেকে লুকিয়ে রাখার ঝোঁক দিন দিন তার বেড়েই যাচ্ছিল। সে দাম্ভিক ছিল না কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাব তাকে পলায়নবাদী করে তুলেছিল। তাই লুকিয়ে-পালিয়ে বেড়িয়েই সে স্বস্তি অনুভব করত। পর্দার আড়ালে বসে গান গাইলেই কণ্ঠের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় না, তাই পর্দার আড়ালে গাওয়া শরতের সে কণ্ঠস্বরে সভার সবাই সেদিন মুগ্ধ হয়েছিল। স্বয়ং সেনমশাই বিভোর হয়ে শুনেছিলেন সে গান। একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতও সেদিন শরৎ শুনিয়েছিল। সভার শেষে সেন মশাই বলেছিলেন, 'আমি গায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' শরৎ ততক্ষণে কিন্তু পালিয়ে বেঁচেছে। নবীনচন্দ্র সেন অবশ্য তাতে দমেননি। বলেছিলেন,— এমন মধুর গলায় বাংলা গান খুব কমই শুনেছি, যেখান থেকে পারো তাকে একবার খুঁজে আনো।

বারংবার অনুরোধ উপরোধ করা সত্ত্বেও শরৎ কিছুতেই সেনমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়নি। অবশেষে যখন জোর করে তাকে কোনরকমে রাজী করানো গেল, তখন অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সেনমশাই যেখানে উঠেছিলেন, শরৎ সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পেঁাছে দেখল যে সেন মশাই বৈঠকখানায় বসে রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে কথা বলছেন। দেখামাত্রই শরৎ পিছন ফিরে দৌড় মারল। শব্দ পেয়ে সবাই বাইরে এলেন। চকিত বিস্ময়ে সেনমশাই দেখলেন, এক পাটি জুতো সিঁড়িতে পড়ে রয়েছে আর শরৎ খালি পায়েই দৌড়চ্ছে। শেষ পর্যন্ত একদিন শরৎকে সেন মশায়ের বাড়িতে আসতেই হল। তিনি বলেছিলেন, 'আপনার গান-শোনার জন্য আমি চাতকের মতই পিপাসিত।' শরৎ বলল, 'আমি তো গান শোনাতে আসিনি। আপনার ছেলে নির্মলচন্দ্র ভাল গাইতে পারে, আমি তার গান শুনতে এসেছি। কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কি

নির্মলচন্দ্রের তুলনা চলে?' রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বললেন, 'আজ এখানে নির্মলচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সবাই উপস্থিত রয়েছে আমি কিন্তু শরৎ-সুধাই পান করতে চাই।'

তবুও শরৎ নির্মলচন্দ্রের গাইবার পরই গাইল।

'আমার রিক্ত শূন্য জীবনে সখা বাকি কিছু নাই।
দাও বাঁচিবার মত তার বেশী নাই চাই ॥

কবিবর সেনমশাই বিভোর হয়ে শুনছিলেন, বললেন,—'আপনার গানের প্রভাবে অন্তরে যেন চিরসুন্দরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি তো জানতাম না রেঙ্গুনে এমন একটা রত্ন লুকিয়ে আছে। আজ আপনাকে 'রেঙ্গুন রত্ন' উপাধি দিলাম।' এই উপাধির মর্যাদা শরৎ কি শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছিল? উপেক্ষা আর অবমাননার আঘাতে কণ্ঠের মাধুর্যও সে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। সঙ্গীতের প্রতি কেমন একটা অরুচি ধরে গিয়েছিল। কখনও যদি গাইতে বসত একটা গান গাইবার পরই উঠে পড়ত। বন্ধুরা বলত,—শরৎদা একি করছ? ঘাটে এসে তরী ডোবালে। অন্য গান না-ই বা গাইলে, এটা তো শেষ করো।

কিন্তু কারো অনুরোধ সে রাখেনি। তার অস্থির চঞ্চল স্বভাব সঙ্গীতের রসটুকু কখন শুষে নিল, লোকে ক্রমশ ভুলেও গেল শরৎ কোন-এক সময়ে খুব ভাল গাইতে পারত। চিরদিনই স্বাস্থ্যহীন, গাইতে গাইতে অবসন্ন হয়ে পড়ত। ক্রমশ যেন সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে নির্লিপ্ত একাকিত্ব তাকে পেয়ে বসল। নিরিবিলিতে বসে পড়াশুনো করতে তার ভাল লাগত, কেউ সেদিন হয়ত কল্পনা করতেও পারেনি যে এই পলায়নের পিছনে তার মনে লেখক হওয়ার মৌন সাধনা লুকিয়ে ছিল।

৩.

শরৎ নিজেকে নিরীশ্বরবাদী মনে করত ও সব রকম দুর্গুণ এবং বিলাসিতা সত্ত্বেও তার মন ছিল সত্যিই বৈরাগী। পড়াশুনোর ঝোঁক তার বরাবরই প্রবল ছিল, তাছাড়া পড়ার ব্যাপারেও কোন বাছ-বিচার তার ছিল না। সমাজ শাস্ত্র, যৌনবিজ্ঞান, ভৌতিকশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সব বিষয়ই সমান অনুরাগের সঙ্গে পড়ত। মণীন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের নিয়ে প্রচুর আলোচনা হত। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি এই অনুরাগের জোরেই রেঙ্গুনের স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে। প্রথম প্রথম সে মিস্ত্রিপল্লীর লোকেদের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিতে যেত, পরে তাদের সঙ্গে ঈশ্বরচর্চাও করত। সেদিন হঠাৎই শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা স্বামীজী ঈশ্বরকে আপনি দেখতে পান না কেন?'

স্বামীজী বললেন, 'ঠাকুর বলেছেন, সমুদ্রের ভেতর রত্ন লুকিয়ে রয়েছে, তবে তা পেতে হলে যত্নের প্রয়োজন। তেমনই ঈশ্বর আছেন তবে তাঁকে জানতে হলে সাধনার প্রয়োজন। শ্যাওলা ঢাকা পুকুরের জল নিতে হলে শ্যাওলা সরিয়েই নিতে হবে, ঠিক সেই রকমই মায়ায় বদ্ধ চোখের পাতা না খুললে ঈশ্বর দর্শনও পাওয়া যায় না। সবার আগে মোহমুক্ত হতে হবে।'

শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'মোহ বা মায়া কি বস্তু?'

স্বামীজী বললেন, 'বিষয়বস্তু আর কামিনী কাঞ্চনে লিপ্ত থাকাই মোহ। এই মোহের আবরণ ছিঁড়ে সরল চিত্তে তাঁকে ডাকলে নিশ্চয় তাঁর দয়া পাওয়া যাবে।'

শরৎ বলল, 'শুনেছি, তিনি তো মঙ্গলময় তবুও পৃথিবীতে এত দুঃখ দুর্দশা কেন?'

স্বামীজী হেসে জবাব দিলেন,—'এই সংসার যাকে আমরা দুঃখ বলি

সে তো বাস্তবিকই কোন দুঃখ নয়, সে তো দুঃখেরই দীক্ষা। সুখের ছোঁয়া পেলেই লোকে দুঃখকে ভুলে যায়। কিন্তু ব্যথা বা দুঃখ আছে বলেই তো বোঝা যায় দুঃখই এই পৃথিবীর প্রিয় বস্তু, নইলে আমরা তাঁকে মনেই বা রাখব কেন।'

শরৎ খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকার পর বলল, 'অদৃষ্ট আর পুরুষকারের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?'

স্বামীজী বললেন,—'পূর্বজন্মের অর্জিত ফলের নামই অদৃষ্ট, যদিও বর্তমান জীবনের অনেক কিছুই তার সঙ্গে জড়িত থাকে ; চলতি কথায় যাকে আমরা কর্ম বলে থাকি। দেবতা আর পুরুষকার একই জিনিস। এক ছাড়া অপরের গতি নেই। এই জন্যই দেবতার সাধনায় পুরুষকারের প্রয়োজন। আবার তেমনই পুরুষকারের সাধনায় দেবতা বা ভগবদ্‌কৃপা আবশ্যক।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর শরৎ জিজ্ঞেস করল,—'গেরুয়া কাপড় না পরেও কি সন্ন্যাসী হওয়া যায় ?'

স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'কেন যাবে না ? ধর্মের সম্বন্ধ তো মনের সঙ্গে। গেরুয়া ধারণ না করেও মন মুক্ত হতে পারে। মনের জন্যই মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কাজেই প্রথমে মন মুক্ত হওয়া দরকার, তারপর তো বাইরের সাহায্য। মন যদি উপযুক্ত হয় তবেই গেরুয়া তার সাহায্যকারী হয়, নইলে লোক দেখানো ভড়ং ছাড়া আর কিছু হয় না।'[১]

এই ধরনের কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা প্রায়ই হত। মনে হয় প্রচুর বিলাসিতার মাঝেও শরতের বৈরাগী মন নীরবে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়ে থাকত।

এই সময়ে রেঙ্গুনে হঠাৎই প্লেগ ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে খুব ইঁদুর মরতে লাগল। তিনি ঘর বাড়ি ছেড়ে শহর থেকে দূরে কোথাও চলে গেলেন। শরৎ সঙ্গে গেল না, অফিসের অন্য বাবুদের সঙ্গে মেসে গিয়ে উঠল। প্লেগের মহামারী এমনই দুর্দান্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কারও আর পরের দুঃখ চিন্তা করার অবসর ছিল না। সবাই ভয়ে পালাচ্ছিল। রুগী একাই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল। বরাবরের অভ্যেসমত এবারও এই দারুণ দুঃসময়ে শরৎ দুঃখী আতুর জনের পাশে এসে দাঁড়াল, যতবড় সাহসীই হোক না কেন 'প্লেগ' এই

---

১. ব্রহ্মদেশে শরৎ—গিরীন্দ্রনাথ সরকার।

মারাত্মক শব্দ শোনামাত্রই পরম প্রিয়জনকেও ছেড়ে লোকে প্রাণভয়ে পালায়, কিন্তু শরৎ হাসিমুখে নিতান্ত অপরিচিতের পাশে পরম নির্ভয়ে গিয়ে দাঁড়াত। বরফ ও ওষুধ কিনে আনত। রাজুর মানবিক করুণার পাঠশালায় যে শিক্ষা সে পেয়েছিল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা সে ভোলেনি। এই সব দিনের ব্যক্তিগত কত বিচিত্র অনুভূতিই পরে 'শ্রীকান্ত'-এ ফুটে উঠেছে। শরৎও একদিন জ্বরে পড়ল, মেসের বন্ধু আগেই জ্বরে পড়েছিল। তবুও দুজনে একে অপরের মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছিল। বন্ধুর অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীণ হয়ে দাঁড়াল। কখনও জ্ঞান ফেরে, বেশীর ভাগ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। সেই অবস্থায় শরৎকে নিতান্ত আপনার ভেবে পরম বিশ্বাসে বলেছিল, 'আমার ট্রাঙ্কে কয়েকটা গিনি আছে, আমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও। ঠিকানাও বাক্সে পাবে।' শরৎ ভেবেছিল মেসের অন্য বন্ধুরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে কিন্তু এল না। ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে শরৎ উঁকি দিয়ে দেখল বালিশে মাথা দিয়ে পাশাপাশি দুজন ঘুমোচ্ছে, হাজার চেঁচালেও এ ঘুম তাদের আর ভাঙবে না। ফিরে এসে দেখল বন্ধু তখনও মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে রাতে শরতের আর শোওয়া হল না। পরের দিন বন্ধুর বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানো, পুলিসে খবর দেওয়া এবং শবদাহের ব্যবস্থা করতে করতে সন্ধ্যে হয়ে এল। নিজের শরীর তেমন সুস্থ ছিল না; কোথায়ই বা যাবে? তবে শরতের জ্বর প্লেগের জ্বর ছিল না, কয়েকদিন পরেই সে সুস্থ হয়ে ওঠে। অসুস্থ অবস্থায় এই কদিন কোথায় কেমনভাবে কেটেছে সঠিক খবর কেউ জানতে পারেনি।

মিস্ত্রি পাড়ায় নিচু শ্রেণীর লোকরা থাকত। শরৎ প্রায়ই এই মিস্ত্রি পাড়ায় যেত। শরতের মনের দুরপনেয় হীনমন্যতা, সভ্যসমাজ বহির্ভূত এই সব ছোট শ্রেণীর লোকেদের মাঝে এসে আনন্দ পেত। দেশেও সে জাতি বহিস্কৃত ছিল, তার আত্মীয়স্বজন তাকে নিজের বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরা তাকে চরিত্রহীন ভাবত, ঘৃণা করত, অধার্মিক ও অধঃপাতে যাওয়া লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে তারা ঘৃণাবোধ করত। অচেতন মনে হয়তো শরৎ তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিশোধ তুলতে চাইত, তাই সমাজে যারা হেয়, নিচু, তাদের প্রতিই সে আকৃষ্ট হত। এ ধরনের বিচিত্র প্রবৃত্তি অবশ্য শরতের লেখায় প্রধান সহায় হল। অফিসের পর সোজা স্থানীয় নামকরা বানার্ড লাইব্রেরিতে গিয়ে চুপচাপ পড়াশুনো

করত। লাইব্রেরিতে তার কোনরকম বিধিনিষেধ ছিল না। কোন্ আলমারির কোন্ তাকে কোন্ বই আছে সব তার নখদর্পণে ছিল। প্রত্যেকটি বই-ই তার পড়া হয়ে গিয়েছিল। বইগুলোকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই ভালবাসত। প্রিয় লেখক টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা' ও 'রেজারেকশন' বই দুখানি তার বড় প্রিয় ছিল। আনা কারেনিনা প্রায় বার পঞ্চাশেক পড়েছিল। এই সাধনার ছাপ তার লেখায় স্পষ্ট দেখা যায়। 'নারীর মূল্য', 'নারীর ইতিহাস,' এই রচনাগুলির সামগ্রী সে এখান থেকেই আহরণ করে। রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতা ফেরার সময় শরৎ বলেছিল, 'এই বানার্ড লাইব্রেরির রেঙ্গুন ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে এত স্বাধীনতা আমি কোথায় পাবো।' 'পথের দাবী'র কবির বিষয়ে সব্যসাচী বলেছিল,—'তোমরা কেউ ওকে জানো না, ভারতী, ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙ্গা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায় নি এমন জায়গা নেই। তাছাড়া ভারি পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে, ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই।'

শরৎকেই বা কে চিনতে পেরেছিল? এই সময় শরৎ 'চরিত্রহীন' লেখায় ব্যাপৃত ছিল, যদিও ভারতবর্ষে থাকাকালীনই সে বইখানি লিখতে শুরু করে। 'চরিত্রহীন'-এ যে মেসের বর্ণনা পাওয়া যায়, সে অভিজ্ঞতা রেঙ্গুনে থাকাকালীনই সে আহরণ করেছিল। 'চরিত্রহীন'এর নায়ক সতীশ মেসে থাকত। সারা দিন কাজকর্মের পর লণ্ঠন জেলে সে যখন লিখতে বসত মেসের তখন সবাই বিরক্ত হত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলত, 'দেখ, দেখ, ইনি ভবিষ্যতে লেখক হবেন, তাই অর্দ্ধেক রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে লিখতে বসেছেন। উহুঁ, পঞ্চাশ টাকা মাস মাইনের কেরানী লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। শখের বলিহারি যাই।' বন্ধুরা শরৎকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত, বাতি নিবিয়ে দিত, কখনও কখনও রাগারাগিও হয়ে যেত। নানান কারণে বিতিবিরক্ত হয়ে শরৎ মিস্ত্রি-পাড়াতেই বসবাস করতে মনস্থ করল। মিস্ত্রিপাড়া শহর থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে 'বোটাটাং পোজান ডং' রোডের কাছে ছিল। ধান, কাঠ ও ঢালাইয়ের অনেকগুলো কারখানা এখানে থাকার দরুণ অনেক বাঙালী মিস্ত্রির বসবাস এখানে ছিল। রাস্তার ধারে ধারে এদের বাড়িঘর ছিল, দূরে একটা বড় খোলা মাঠও পড়ে ছিল। মাঠের অপর কোণ ঘেঁষে

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পোজাং ডং-এর শুরু। বড় সুন্দর সে দৃশ্য, চেয়ে দেখার মতই। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে এ দৃশ্য শরৎ তন্ময় হয়ে দেখত। মিস্ত্রি-পাড়াতে থাকার দরুন অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক কমে এল। শুধু কয়েকজন বন্ধু ছাড়া মিস্ত্রিপাড়ার কারিগরেরাই তার বন্ধু হয়ে উঠল। কলকারখানার জনমজুরদের মধ্যে প্রায়ই মারা-মারি লড়াই ঝগড়া বেঁধে যেত আর শরৎকে তাদের মোড়ল হতে হত। ছুটির দরখাস্ত লেখা, বাড়িতে চিঠি লিখে দেওয়া, দেশে মনিঅর্ডার পাঠানো, সবই শরৎকেই করে দিতে হত। আবার এরা যখন অসুখে পড়ত হোমিওপ্যাথী ব্যাগটি সঙ্গে করে ঘরে ঘরে তাদের পরিচর্যা করতে বেরিয়ে পড়ত। এই সময় শরতের বন্ধু বঙ্গচন্দ্র দে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুজনে বহুদিন মেসে একসঙ্গে ছিল, বড় প্রিয় বন্ধু। বঙ্গচন্দ্র পূর্ববঙ্গীয়, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ছেলে। বিশেষ অধ্যয়নশীল ব্যক্তি, ইংরেজি পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হত। কিন্তু একদিকে জ্ঞানপিপাসাও যেমন তার তীব্র ছিল শরীরের পিপাসাও তার অত্যন্ত উগ্র ছিল। হাস্যপরিহাসে যেমন মেতে উঠত, তেমন মদ্যপানেও সে আকণ্ঠ ডুবে থাকত। স্বভাবের এই মিলের জন্যই দুজনের বন্ধুত্বের বাঁধনও শক্ত ছিল। শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁকে গেঁয়োবাঙাল বলে রাগাত, বঙ্গচন্দ্রও খুব রাগারাগি করত। বঙ্গচন্দ্র নবীনচন্দ্রের ভক্ত ছিল আর শরৎচন্দ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। দুজনের কবিতা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে তর্ক লেগে যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন শরৎ কবিগুরুর এই কবিতাটি শোনাত,

> 'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
> করে শুধু মিছে কোলাহল
> সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া,
> পান করে শুধু হলাহল।'

বঙ্গচন্দ্র আর কিছু না বলে নীরব হয়ে যেত। পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার প্রতি স্পর্ধা সর্বজনবিদিত। তবুও দুজনের মধ্যে ক্ষণেকের জন্যেও কখনও মন কষাকষি হয়নি। রাগারাগি, হাসিঠাট্টা খাওয়া-দাওয়া, পান করা, গভীর দর্শনচর্চা—সবই হত। বঙ্গচন্দ্র শরতের প্রতিভাকে চিনতে পেরেছিল। শরৎ বঙ্গচন্দ্রের গভীর জ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তবুও নিবিড় মানবতাই দুজনের বন্ধুত্বের প্রধান কারণ হয়েছিল। তাই বঙ্গচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে শরৎ তক্ষুনি মেসে গিয়ে পৌঁছল। রোগ সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আশেপাশের বন্ধুরা ওকে ছেড়েই পালিয়ে গিয়েছিল। শরৎ কিন্তু প্রাণ দিয়ে সেবা করে। সামান্য সুস্থ হলে বন্ধুকে নিজের বাসায় নিয়ে এল। বন্ধুর জন্য ওষুধ আনা, গরম জলের সেঁক দেওয়া, সাবু বার্লি তৈরি করে খাওয়ানো সবই একহাতে করত। মাঝে মধ্যে হাসি ঠাট্টা করেও আবহাওয়াকে হালকা করার চেষ্টা করত। কিন্তু এত করেও বন্ধুকে সে বাঁচাতে পারেনি। শরতের কোলে মাথা রেখেই চিরদিনের মত সে চোখ বুজেছিল। প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু শরৎকে কাতর করে তোলে, এ মৃত্যু বড় মর্মান্তিক হয়ে তার বুকে বেজেছিল। গান, বাজনা, হাসি ঠাট্টা যেন চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল। শুধু সেই চিরদিনের একাকীত্ব, মনন ও সাহিত্য-সৃজন তার দোসর হল। বৈরাগী মন বিবাগী হয়ে গেল।

৪.

বরাবরের অভ্যেসমত রাতে দেরি করে ফিরে দরজা খুলতে গিয়ে শরৎ দেখল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। অবাক হয়ে ভাবল, ভেতরে কে হতে পারে? কী জানি, ঘরে চোর ঢুকল নাকি? জোরে একবার ধাক্কা দিল কিন্তু বাস্তবিকই দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

শরৎ ডাকল, 'ভেতরে কে?'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। একবার নয়, বার কয়েক ডাকার পর একটা কাতরানি শুনতে পাওয়া গেল, সামান্য শব্দ করে দরজা খুলে গেল। বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে শরৎ দেখল, ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতার মতই দাঁড়িয়ে কাঁপছে যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রির মেয়ে শান্তি। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছে। চোখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী ভেবে শরৎ জিজ্ঞেস করল—'কী হয়েছে শান্তি? তুমি এখানে এমন করে কেন এসেছ?' অনেক আশ্বাস দেওয়ার পর একটু সুস্থির হয়ে শান্তি বলল, 'বাবা পয়সা নিয়ে

একটা মাতাল বদমাস বুড়ো ঘোষালের সঙ্গে আমার বিয়ে পাকা করে ফেলেছেন। আজ নেশায় পাগল হয়ে আমার সঙ্গে বদমাইশি করতে এসেছিল, সেই ভয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে আপনার ঘরে আমি পালিয়ে এসেছি…'। এই বলে শরতের পায়ের উপর পড়ে শান্তি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমায় রক্ষা করুন, আমায় আপনি বাঁচান।'

ভাববার আর কীই বা ছিল! শান্তি তার আশ্রয়ে এসেছে, শরৎ কেমন করে পিছিয়ে যাবে, তাই বলল, তুমি ভয় পেওনা শান্তি। আজকের রাত তুমি এখানেই শুয়ে পড়। আমি আর কোথাও যাচ্ছি। সকালে এসে তোমার যা হোক একটা উপায় নিশ্চয়ই করব।' শরৎ জানত, যজ্ঞেশ্বর মিস্ত্রির বাড়ি মাতালদের আড্ডা। যত সব নেশাখোর গেঁজেলরা তার সঙ্গী। ঘরে বউ নেই। শান্তি বেচারীকেই তাদের ফাইফরমাস খাটতে খাটতে নাজেহাল হতে হয়। এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি হলে চক্কোত্তি মশাই শান্তিকে নির্মম প্রহার করত। 'পথের দাবী'তে ভারতী এমনই এক বাঙ্গালী মিস্ত্রির বাসায় গেছে, সেই প্রৌঢ় মিস্ত্রি পিতল ঢালাইয়ের কাজ করত। মদ খেয়ে কাঠের মেঝেয় পড়ে কাউকে খারাপ গালমন্দ দিচ্ছিল। ভারতী জিজ্ঞেস করল, 'মানিক, কার উপরে রাগ করেছ? সুশীলা কই? আজ দুদিন সে পড়তে যায় না কেন?'

মানিক কোনরকমে বেসামাল অবস্থা আয়ত্তে এনে উঠে দাঁড়াল, আর ভালভাবে তাকিয়ে ভারতীকে লক্ষ্য করে বলল, 'দিদিমণি? এস, বস! সুশীলা কী করে তোমার ইস্কুলে যাবে বলো? রাঁধা-বাড়া, বাসন মাজা মায় ছেলেটাকে সামলানো পর্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্ছে দিদিমণি। যোদো শালাকে আমি খুন না করি ত আমি কৈবর্ত্ত থেকে খারিজ! বড় সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।'

শান্তির প্রতি অজান্তেই শরতের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। সকাল বেলায় শান্তির বাপকে ডেকে শরৎ বলল, 'শুনলাম শান্তির বিয়ে তুমি বুড়ো ঘোষালের সঙ্গে ঠিক করেছ?'

যজ্ঞেশ্বর বলল,—হ্যাঁ।

'ঘোষাল তো শান্তির যোগ্য বর নয়, একে বুড়ো তায় নেশাভাঙ্গ করে।'

চক্রবর্তী কঠিন স্বরে বলল, "আমি গরীব লোক, এই বিদেশে এর চেয়ে ভালো পাত্র কোথায় পাব। ঘোষালের পয়সা আছে, মেয়ের খাওয়া পরার দুঃখ থাকবে না। নেশা করে তার কি হয়েছে, নেশা তো আমিও করি,

আপনিও করেন। আর বয়সের কথা যদি বলেন, তো পুরুষমানুষের আবার বয়স দেখে নাকি কেউ।'

চক্রবর্তী মিস্ত্রির ব্যাখ্যা শুনে শরৎ হেসে ফেলল, তাকে বোঝাবারও অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। চক্রবর্তী নিজের মতে অটল হয়ে রইল। শেষে শরৎ বলল, 'ঘোষালের কাছে যদি আপনি ধারী হন, আমি তা শোধ করে দেব।'

চক্রবর্তী বলল, 'তাতে আর কি হল ?' মেয়ের বিয়ে তো আমায় দিতেই হবে। আর বাবুমশায় এতই যদি আপনার প্রাণে দয়া-মায়া থাকে, তাহলে এই গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে নিজেই বিয়ে করে আমার জাতিকুল বংশের মান-মর্যাদা রক্ষা করুন না।'

চক্রবর্তীর কথা শুনে শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নিজের বিয়ের কথা তার মাথাতেই আসেনি, বিয়ে সে করতেও চায় না। বোধহয় কৈশোরের ব্যর্থ প্রেম এখনও সে ভুলতে পারেনি। তাই চক্রবর্তীর কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে চলে গেল, কিন্তু চিরদিনের মতো তার মন কোন মেয়ের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টায় অনেক জায়গায় কাকুতি-মিনতি করল, অনেকের হাতে-পায়ে ধরল কিন্তু একটা যোগ্য বর খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত চক্রবর্তীর বাসায় গিয়ে শরৎ বলল,—'আমি এ বিয়ের জন্য তৈরি চক্রবর্তী মশাই।'

শান্তির সঙ্গে শরতের এই বিয়ে কোন্ রীতি ও নিয়মে সম্পন্ন হয়েছিল, রেঙ্গুরের ক'ঘর কুলীন বাঙালী এই বিয়েতে যোগ দিয়েছিল তার সঠিক লিখিত প্রমাণ কারও কাছে নেই। লোকেদের ধারনা, আদপে শরৎ বিয়েই করেনি বরং ছোট জাতের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘর করছে। এইরকমভাবে কোন মেয়ে লোক নিয়ে পড়ে থাকাকে লোকে খাঁটি চরিত্রহীনতাই মনে করেছিল।

যাই হোক না কেন, তার এতদিনের অব্যবস্থিত জীবনে নারীর পদার্পণ ঘটল, নারীর কোমল স্পর্শে শরতের জীবনের গতি আনন্দের স্রোতে গিয়ে ভিড়ল। নারী তার জীবনে আসেনি তা নয়, তবে সংসারী হওয়ার এই তো তার প্রথম সুযোগ। বিয়ের পর জীবনের অর্থই যেন তার বদলে গেল, সে আর একা নয়। তার প্রিয়তমা স্ত্রী তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, কারণ আজ সে শুধু স্বামীই নয় তার স্ত্রীর ত্রাণকর্তা। না জানি কত দুঃখের দিন কাটিয়ে এটুকু সুখের মুখ সে দেখতে পেয়েছিল। দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প

করত, দুজনের চোখে দুজনে কি জানি কি খুঁজত? অফিসের বন্ধুরা তাকে স্ত্রৈণ বলত, শরৎ কিন্তু কিছু বলত না। শুধু কারো কোন অসুখ হলে, মিস্ত্রি পাড়ার কেউ ডাকলে নিজের হোমিওপ্যাথী ব্যাগটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত কিংবা যখন লেখার প্রেরণা পেয়ে বসত তখন লেখার সাধনায় ডুবে থাকত। এ ছাড়া শরতের সংসার 'শান্তির' মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর এক বছর পর সংসারে একটি নতুন প্রাণীর আগমন হয়। শিশুর কলকাকলীতে বাড়ি মুখর হয়ে উঠল। ভালবাসা ও সহানুভূতির অভাবে যে এতদিন নিরাশ্রিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভদ্র সমাজে যার স্থান জোটেনি, সমাজের নগণ্য মানুষের আশ্রয়ে যাকে বারবার ছুটতে হয়েছে, তারই গৃহ প্রাঙ্গণ যখন স্ত্রীর ভালোবাসা ও সন্তানের হাসি কলরবে মুখর হয়ে উঠল তখন স্বেচ্ছাচারী মানুষটার মন না-জানি কি এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভরে উঠেছিল।

কিন্তু বিধাতা বোধহয় অলক্ষ্যে থেকে হেসেছিল—তাই নতুন করে সংসার পাতার দু'বছরের মধ্যেই রেঙ্গুন শহরে আবার প্লেগের মহামারী দেখা দিল। চারিদিকে হাহাকার, অগণিত মৃতদেহ, এক দুর্বিষহ আবহাওয়ার মধ্যে একদিন শান্তিও জ্বরে পড়ল। এই উগ্র জ্বরের সঙ্গে শরতের পূর্ব পরিচয় ছিল। বহু রোগীর সেবায় তার অনুভূতি দক্ষ হয়ে উঠেছিল। সহজেই বুঝতে পারল, প্লেগ শান্তিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল কিন্তু সকলেরই তো দুঃসময়, কেই বা এগিয়ে আসবে। বন্ধু গিরীন্দ্র সরকারের কাছে গিয়ে শরৎ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—'ভাই গিরীণ, বড় বিপদে পড়েছি। শান্তি ভয়ঙ্কর জ্বরে ছটফট করছে।'

'কী বলছ, শরৎদা? কাকে দেখিয়েছ?'

''এখনও পর্যন্ত তো ডাক্তার ডাকাই হয়নি, মাসের শেষ, হাতে বিশেষ কিছু নেই।'

'তুমি ভেব না। আমি অপূর্ব ডাক্তার বা ডাক্তার দে-কে সঙ্গে নিয়ে এখুনি আসছি।'

সে সময় গিরীন্দ্রনাথ সরকার একটি সৎকার সমিতি গড়েছিলেন। এই সৎকার সমিতি রুগীর চিকিৎসা ও মৃত্যুর পর দাহকার্যে সাহায্য করত। শরৎ বলল,—'তুমি সৎকার সমিতি গড়ে বড় পুণ্য করেছ ভাই। এই বিপদে আমায় রক্ষা কর'। তারপর হতাশ হয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। বলল,—'সবই ভাগ্য ভাই! যা লিখিয়ে এসেছি, তাই তো হবে।'

গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। সমিতির আলমারি খুলে রুগীর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ও ওষুধপত্র দিয়ে বলেছিল, তুমি বাড়ি যাও, আমি আসছি।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সরকার যখন শরতের বাসায় পৌঁছল, শান্তি তখন একটা তক্তপোষের উপর শুয়ে চাদরে মুখ ঢেকে ছটফট করছিল, প্রাণটুকু গলার কাছে যেন কোনরকমে আটকে আছে। একটি বুড়ি মাথার শিয়রে বসে পাখার বাতাস করছিল। ডাক্তার রোগিণীকে দেখামাত্রই বুঝলেন, এ প্লেগের রুগী, বাঁচার বিন্দুমাত্রও আশা নেই। ডাক্তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। শরৎ আরও ভেঙ্গে পড়ল, কাতর অনুনয়ে বার বার ডাক্তারের কাছে শান্তির প্রাণভিক্ষা চাইছিল। শরতের অবস্থা দেখে সবার দুঃখ হচ্ছিল কিন্তু করারই বা কী ছিল? সান্ত্বনা দিয়ে করণীয় যা কিছু বলে-কয়ে যে যার ফিরে গেল। শরৎ আবার রোগিনীর শিয়রে গিয়ে বসল। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে শান্তির জ্ঞান ফিরে এসেছিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল,—'আমার জন্য তুমি অনেক দুঃখ পেলে, ক্ষমা করে দিও।'

আর্দ্র কণ্ঠে শরৎ বলেছিল,—'এ কথা বোল না, আমার বড় ভয় করে।'

শান্তি বলল, 'ছি, ভয় কিসের? আমায় আশীর্বাদ কর, তোমার পায়ের একটু ধুলো আমায় দাও।' শরৎ বুঝতে পেরেছিল আর আশীর্বাদ করার মতো কিছু নেই, সব শেষ। সকল প্রয়াস ও প্রার্থনা ব্যর্থ করে দিয়ে পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্টকে তুচ্ছ করে শান্তি পরলোকে চলে গেল। স্ত্রীর প্রাণহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে শরৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। প্লেগের রুগী মরেছে জানলে প্রতিবেশীরা কেউই সে সময়ে প্রাণভয়ে এগিয়ে আসত না। শরতের এই দুঃসময়ে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। ভদ্র বাঙ্গালী সমাজকে সে নিজেই এড়িয়ে চলত, তাই তারাই বা আসবে কেন। শুধু বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সাহায্যে একটি কুলী জোগাড় করে ঠেলাগাড়ি করে শান্তির শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। শ্মশানে এক সন্ন্যাসী থাকতেন, শরতের নিঃসঙ্গতা ও সঙ্গতিহীনতা বুঝতে পেরে তিনি স্বয়ং চিতা নির্মাণ করে শব দাহ করার ব্যবস্থা করলেন। স্ত্রীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে শরৎ শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মেয়েদের মতো চিন্তা করত, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমি স্বামী ছিলাম, আজ আর কেউ নই। ছোট শিশুর মতই কাঁদল। বন্ধুরা শরতের ব্যথায় সমব্যথী কিন্তু শরতের মন একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। কৈশোর জীবনের ব্যর্থ

প্রেমের মতই এই দুঃখ তার জীবনে গভীর এবং স্থায়ী রেখাপাত করে। লেখা, অধ্যয়ন, ছবি আঁকা সব কিছু ছেড়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট বাচ্চাটাও মহামারীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। জীবনের অফুরন্ত পাওয়া হঠাৎ যেন এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল, শুরু হল আবার সেই পুরাতন নিঃসঙ্গতার জীবন।

অনেক বছর পরে বন্ধুর জোয়ান ছেলে যখন মারা যায়, তার মাকে শরৎ বলেছিল, 'দিদি, তবু তো তুমি এত বছর ছেলের মুখ দেখলে আমি তো মাত্র এক বছরের মধ্যেই সে সুখে চিরদিনের মত বঞ্চিত হয়ে রইলাম।'

বন্ধুরা পরামর্শ দিল, 'কিছুদিন বাইরে ঘুরে আয়।' শরতের সম্পূর্ণ জীবনটাই তো একটা যাত্রা, এক দিশাহীন, উদ্দেশ্যহীন যাত্রা। বরাবরের মতো এবার আর সে ইচ্ছেমত বেড়াতে পারল না, কারণ অফিসে নির্ধারিত সময় পর্যন্তই ছুটি পাওয়া যায়। কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আবার সে কর্মস্থলে ফিরে আসে। দুঃখ তো বলে বেড়িয়ে লাভ নেই, তাকে সইতে হয়, তবেই সে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ মৃত্যুশোক তার জীবনে গভীরতা ও ব্যাপকতা এনে দিয়েছিল। শূন্য বাসা ছেড়ে পাশেই অন্য বাসা বদল করেছিল। পুরোন বাসার সবটুকুতেই যে তার অল্পমেয়াদী দাম্পত্যজীবনের ছবি আঁকা ছিল!

৫

বহুমুখী প্রতিভাশালী ধনী রবীন্দ্রনাথের মতো শুধু সাহিত্যেই নয়, সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রতিও শরতের তীব্র অনুরাগ ছিল। যদিও এক্ষেত্রে তার অনুভূতি তেমন গভীর ছিল না, তবুও এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে কয়েক বছর সে চিত্রকলার সাধনায় মনোনিবেশ করেছিল।

তিন বছর পরে বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা জানিয়ে প্রিয়বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টকে শরৎ একখানি চিঠি লেখে[১],—'আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকি

১. ২২ মার্চ, ১৯১২ সাল।

আছে। বছর তিনেক আগে যখন 'হার্ট ডিজিজ'—এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া 'অয়েলপেন্টিং' শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি অয়েলপেন্টিং সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে। এখন আমার কি করা উচিৎ যদি বলিয়া দাও ত, তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। নভেল, হিস্ট্রি, পেন্টিং কোনটা ? কোনটা আবার শুরু করি বলতো ?'

মনে হয় এই অগ্নিকাণ্ডের পর ছবি আঁকার প্রতি তার তেমন রুচি আর ছিল না। শুধু মহাশ্বেতার অসম্পূর্ণ চিত্র যা আগুনে পোড়েনি সেটাই পুরো করেছিল।[২] মনে হয় সে সময় আরো কয়েকটা ছবি এঁকেছিল। শরতের বন্ধু ও সহকর্মী যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, 'এক রবিবারে গিয়া দেখি, ইজেলের উপর কাপড় ঢাকা একখানা ছবি।'

'ওখানা কী, শরৎদা ?'

প্রশ্ন শুনিয়াই সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা তুমিই বল আগে কী ওখানা ?'

'কি আর হবে—ছবি।'

'বড় তো বললে ছবি !...ছবি ছাড়া ওখানা আর কী হতে পারে ? কার ছবি যদি বলতে পার তো বুঝি তোমার অনুমানের জোর।'

'যদি বলি নারদমুনির—?'

'হ্যাঁ তাই। এই ছ্যাখ'—বলিয়াই ছবির উপর হইতে কাপড়ের ঢাকনাটা সরাইয়া দিলেন। আমি তো দেখিয়া অবাক। সত্য সত্যই যে সেই বুড়োর ছবি। গ্রাম্য পুকুরের পাড়ে এলোমেলো গাছপালা, তারই মধ্য দিয়া আঁকা-বাঁকা ভাঙ্গাচোরা রাস্তা, তারই পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া একটি বৃদ্ধ। যে একবার ওই নারদমুনিকে দেখিয়াছে, সে কদাপি এমন কথা বলিবেনা যে, এ আর কারও ছবি। বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর নৈরাশ্যের কেমন গাঢ় ছায়াপাত হইয়াছে, সেটিই দেখিবার বিষয়।'

সরকার ছবিটা দেখছিল ঠিক সেই সময়েই বুড়ো এসে হাজির। সিঁড়িতে পা দিয়েই হাঁকল, 'দেবতা ঘরে আছে ?'

শরৎ তখুনি নীচে নেমে গিয়ে বড় যত্নের সঙ্গে হাত ধরে বুড়োকে উপরে নিয়ে এল। তারপর সেই ছবিটি তার সামনে এনে রাখল। দেখামাত্রই

২. ১৮ মার্চ, ১৯১৩, গিরীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি।

বৃদ্ধের কোটরে বসা দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'দেবতা এতও আপনার মাথায় আসে ?'

প্রত্যুত্তরে শরৎ বলল, 'ছাখ নারদ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। কাজটা ভাবছ খুব শক্ত ? না তা নয়। রোজ সকালবেলা আমার এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আসতে পার ? চা-টাও খেতে পারবে, আর আমার এই ছবি আঁকাও দেখতে পারবে।'

চায়ের নামে বুড়োর জিভে জল এসে গেল। শরৎ এক পেয়ালা চা তার হাতে এনে দিয়ে বলল, 'বড়ই কষ্ট হয়েছে, নাও চা খাও।'

বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের হয়েছে তো দেবতা ?'

শরৎ বলল, 'ওহে দেবতাদের কি আর ওটি বাকি থাকতে আছে। তুমি এখন খেয়ে নাও চট করে। নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' সরকার জিজ্ঞেস করল, 'এ শিক্ষার গুরু কে, শরৎদা ?'

নিজের কপালখানা দেখিয়ে জবাব দিল, 'এ গুরু আমি নিজে।'

প্রকৃতির ছবি আঁকা অপেক্ষা মানব-আকৃতি আঁকার প্রতিই শরতের বেশী ঝোঁক ছিল। তার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ শরীর-বিজ্ঞান জানা না থাকলে মানব আকৃতি আঁকা যায় না। যদি কোন আকৃতি জীবন্তই না হয়, তাহলে আর তাকে ছবি বলা যায় কী করে। মনে হয় শরৎ বিখ্যাত চিত্রকর ভিনসেণ্ট ভ্যান গগ্ কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। আয়ানগো বলেছিলেন, 'মানব শরীরের পূর্ণজ্ঞান না থাকলে সুষ্ঠু মানব আকৃতি আঁকা সম্ভব নয়। কারণ তা শুধু অনুকরণই হবে, যথার্থ হবে না।'

একদিন সরকারকে শরৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বল তো সরকার, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় পেণ্টার কে ?'

সরকার বলল, 'র‍্যাফেল বড় পেণ্টার।'

'উহুঁ'—হলনা। র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে, তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার।'

তিসিয়ান সম্বন্ধে শরতের খুব উঁচু ধারণা ছিল। ইতালীয় চিত্রকলাকে শরৎ নিজের মতে শ্রেষ্ঠ মনে করত। তারপরের স্থান ফ্লেমিস, ডাচ, ও ব্রিটিশ চিত্রকলার ছিল। 'ছবি' গল্পে শরৎচন্দ্র বাথিনকে অমর করে রেখেছে। বাথিনের কাছ থেকেই সে শিল্পকলার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। সাধারণত বাঙালীরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ভালবাসে কিন্তু শরৎ এর ব্যতিক্রম।

অফিস ছাড়াও অবাঙ্গালীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ও মেলামেশা ছিল। শিল্পী বাথিনও শরতের এমনই এক বন্ধু। একবার সতীশচন্দ্র দাসকে[৩] সঙ্গে করে শরৎ বাথিনের বাড়ি দেখা করতে যায়। তিনি লিখেছেন,—'সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আলোকের সুবন্দোবস্ত নেই, রাস্তাঘাটেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, সন্ধ্যাতে ঠাকুর ঘরের আরতি নাই, শঙ্খধ্বনি নাই। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, 'একি শরৎদা, কোথায় নিয়ে এলে বল দেখি ? শেষকালে কি গুণ্ডা বদ্মায়েসের হাতে প্রাণটা খোয়াব ?'

শরৎদা বলিলেন, 'না হে না, এসোনা আমার সঙ্গে। গুণ্ডা বদ্মায়েসের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমাকে আমাকে মারতে আসবে !'

'তুমি যাই বল না দাদা, এমন বিশ্রী জায়গায় লোকে বেড়াতে আসে ? তাও আবার অন্ধকার রাত্রে ? যদিও আমরা পল্লীগ্রামের লোক, এযে পল্লীরও বাড়া ? অনুমানে বুঝিতে পারিলাম বর্ষাকালে রাস্তায় চলাও কষ্ট, এখনো এক একখানা ইষ্টকখণ্ড পড়িয়া মাটির সঙ্গে আটকাইয়া রহিয়াছে। শরৎদার মুখে কথা নাই, আমিও অনন্যোপায় হইয়া পেছন ধরিয়া চলিলাম বটে, কিন্তু বস্তীর কুকুরের কথা মনে পড়িয়া আমার বুক শুকাইয়া গেল। বর্মীদের দুই-চারিটা কাঠের বাড়ি রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেরাসিনের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গৃহপালিত কুকুরগুলি বর্মীদের ঘরের দাওয়ায় শুইয়া নতুন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া প্রভুর মুখপানে ও আগন্তুকের পানে এক একবার তাকাইয়া মনিবের আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। এদেশের কুকুরগুলো এমন সাংঘাতিক কোন প্রকার সাড়া শব্দ না দিয়া পেছন দিক হইতে লোককে আক্রমণ করে। আমি আগেও দু'-একবার এ-বিপদে পড়িয়াছিলাম। আমি শরৎদাকে বলিলাম, 'শরৎদা, বস্তীর বর্মীদের কুকুরগুলি কিন্তু বড় সাংঘাতিক—'

কথাটা বলিতে না বলিতেই শরৎদা বললেন, 'ভয় নেই তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। পশু হলে কি হবে, তারাও লোক চেনে।' কিছুদূর যেতে না যেতেই সামনের একটা কাঠের বাড়ির সম্মুখে গিয়েই শরৎদা দাঁড়ালেন। শরৎদাকে দেখিয়াই একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক তাদের নিজের ভাষায় শরৎদাকে ডাকিতেই, তিনিও বর্মীদের ভাষায় কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাশে একটি বর্ষীয়সী মেয়েও বসিয়াছিল, স্ত্রীলোকটি আবার কি বলিতেই মেয়েটি বাহির হইয়া গেল। আমরা দুখানা চেয়ারে বসিয়া

৩. ইনি শরতের বর্মা প্রবাস সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিখেছেন (শরৎ প্রতিভা)।

পড়িলাম। স্ত্রীলোকটি শরৎদার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিল, ঠিক যেন কতকালের পরিচিত নিজেদের আত্মীয় বন্ধুর ভিতরের একজন। কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি শরৎদার বন্ধুকে আনিয়া হাজির করিয়া দিলেন। বহুদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা হইলে যেরূপ আদর অভ্যর্থনা ও নানাপ্রকার দুঃখ দৈন্যের পালা আরম্ভ হয়, তাদের দুজনের মধ্যেও সেরূপ পালা আরম্ভ হইয়া কিছুক্ষণ পরে অনুযোগের পালা আরম্ভ হল। এবার আরম্ভ হইল অভ্যর্থনার পালা। ক্রমান্বয়ে টেবিলে নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু আসিয়া সজ্জিত হইতে লাগিল। শরৎদা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খাবে ?' আমি তো দেখেশুনেই অবাক, বলে কি ? যাদের খাদ্যের কোন বিচার নাই, তাদের সঙ্গে খেয়ে কি শেষকালে জাতটা হারাবো। আমি নিজের জাত কুল বজায় রাখিয়া হিন্দুয়ানী মতে চা রুটি কতক ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। কিন্তু এদিকে শরৎদা তাঁর বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রী ও মেয়েটিকে লইয়া এক টেবিলে বসিয়া গল্পগুজব করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, 'শরৎদা এবার উঠে পড়ি, ঘরে গিয়ে পেঁছুতে রাত অনেক হবে।' শরৎদা বন্ধুর হাতে হাত মিলাইয়া উঠিয়া পড়িলেন, বন্ধুটি গলির মোড় পর্যন্ত একটা আলো লইয়া আসিয়া আমাদিগকে বড় রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিয়া গুড নাইটের পালা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শরৎদা এরা কে, এদের সঙ্গে এত বন্ধুত্বভাব হলো কী করে ? বোধহয় এক অফিসেই কাজ করে, না ?'

শরৎদা বললেন, 'না হে না, এলোকটি চিত্রবিদ্যায় ওস্তাদ। ঘরেতে যেসব চিত্র দেখলে এরি হাতের তৈরি, আমার সঙ্গে আলাপ পেগুতে।'

আমি আবার বলিলাম, 'বন্ধু হিসাবে না হয় দেখা করতে এলে দাদা, কিন্তু সঙ্গে খেলে কী করে ?'

এবার শরৎদা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাগল আর কাকে বলে ? এরাও যে হিন্দু জাতির শাখা। এ জাতিটা এত ধর্মভীরু, আর লাজ-লজ্জা এদের ভেতরে মোটেই নেই। দু-দিন আলাপ হতে না হতেই এরা লোককে আপনার করে নিতে পারে। হিংসা, ঘৃণা, লজ্জা এদের ধর্মের বিরুদ্ধে।'

ছবি আঁকার দিকে শরতের ঝোঁক বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। মোতিলালও ভাল শিল্পী হতে পারতেন কিন্তু জীবনে কোন কাজেই তিনি টিঁকে থাকতে পারেন নি। বাপের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন ও সাধনা শরতের মধ্যে বিকশিত

হতে চাইত। বাগিনের সহযোগিতায় শরৎ কয়েকটি সুন্দর চিত্র এঁকেছিল। তার মধ্যে 'মহাশ্বেতার' ছবিটি এত ভাল হয়েছিল যে, বন্ধুরা বলেছিল, 'তোমার ছবি প্রদর্শনীতে পাঠাও না কেন?'

খ্যাতি এবং প্রচার দুইই শরতের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই বন্ধুদের অনুরোধ রাখতে পারেনি। তার শিল্পসাধনার বিষয়ে যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, 'আলো ও ছায়ার পরস্পর সম্বন্ধটুকু ইহাতে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা নিতান্ত কাঁচা হাতের বলিয়া মনে করিবার মত নয়। বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এ্যানাটমির জ্ঞান, পারস্পেক্‌টিভ এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডের আইডিয়া সমস্তই বিদ্যমান ছিল। শিল্পীর বর্ণজ্ঞানও যে নিতান্ত কম ছিল, তাহাও বলিতে চাহিনা। মোটের উপর একসঙ্গে নিসর্গচিত্র ও মনুষ্যচিত্র মিলাইয়া যাহা হয় ঠিক তাই, এই তপস্বিনী মহাশ্বেতার চিত্র সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, প্রকৃতির খেয়ালী সন্তান শরৎচন্দ্রের তুলির মুখে।

'বর্ষার দিনে অচ্ছোদের তীর ঝাপসা দেখাইতেছিল, ওপারে মেঘভারাবনত আকাশ আরও অস্পষ্ট, ইহার একপাশ দিয়া লাজুক সূর্য একটুখানি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। তীরে তরুতলে এলোকেশী সদ্যস্নাতা তপস্বিনী মহাশ্বেতা রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবীরই যেন একখানা জীবন্ত আলেখ্য।'

ছোট ঘরের একটা কোণে ছবিটি রাখা থাকত। আলো-আঁধারে ঘেরা অপরিসর সেই ছোট্ট ঘরের কপাট খুললে যেটুকু আলো ঘরে এসে পড়ত সেই আলোতেই ছবিটি চোখে পড়ত। এইভাবেই শরৎ সরকারমশাইকে ছবিটি দেখিয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'সকল উন্নত কলার মধ্যেই সেই চির সুন্দরের আনন্দঘন রসমূর্তিরই বিকাশ সাধনের চেষ্টা। বাস্তবিকই একটুখানি উদার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, আপাত কুৎসিত জিনিসটিও সুন্দর বলিয়া মনে হয়। অবশ্য শরৎবাবু যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলেন সেটি নগ্ন সৌন্দর্যের চিত্র নয়। নগ্ন হইলেও বোধ হয় কুৎসিত বলিতে পারিতাম না এই কারণে যে, তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের কেমন চমৎকার সামঞ্জস্য ছিল। ছবিটি শরতের বিশেষ প্রিয় ছিল। গিরীন মামাকে লিখেছিল,[৪] 'ছবিটি এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। যদি বলতো সম্পূর্ণ করি। আমার তো বাড়ি ঘর কিছুই নেই, তোমার আছে। ছবিটি আমারও বিশেষ প্রিয় এটি যাতে নষ্ট না হয় তাই তোমার কাছে রাখতে চাই।'

৪. ১৮ই মার্চ ১৯১৩ সাল।

এসব সত্ত্বেও তার শিল্প সাধনা একমুখী ছিল, কোন ছবিই উঁচুমানের ছিল না, তবুও মনের মধ্যে ছিল অকুণ্ঠ ইচ্ছা আর শিল্পের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। লেখকরূপে শরৎ যখন খ্যাতির শিখরে তখন কলকাতা আর্ট কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সিংহর বাড়িতে তাঁর আঁকা 'মা ও ছেলের' ছবি দেখে সেও পেন্সিল স্কেচে ছবিটি এঁকেছিল। সতীশচন্দ্রের পুত্রের আঁকা 'হর-পার্বতীর' ছবি দেখে সেও হর-পার্বতীর স্কেচ এঁকেছিল। ছবিগুলি আজও কোথাও সুরক্ষিত আছে।

৬.

রেঙ্গুন যাবার সময় শরৎ নিজের যাবতীয় লেখা বন্ধুদের কাছে রেখে গিয়েছিল। 'বড়দিদি' তারই মধ্যে বেশ বড় গল্প। গল্পটি সুরেন্দ্রনাথের নিকট ছিল। যাবার সময় শরৎ বলে গিয়েছিল, 'ছাপবার দরকার নেই, তবু যদি ছাপানো হয় তাহলে প্রবাসী ছাড়া অন্য কোন পত্রিকায় তার অনুমতি বিনা যেন গল্প না দেওয়া হয়।' ভাগলপুরের মুন্সেফ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় ছিল, তিনি সুরেন্দ্রনাথের 'সাহিত্য সংহার' সভার সদস্যও ছিলেন। সেই সভায় শরৎচন্দ্রের গল্প পড়া হয়। শরতের গল্প জ্ঞানেন্দ্রবাবুর খুব ভাল লাগাতে 'বড়দিদি' গল্পটি 'প্রবাসীতে' ছাপাবার জন্য নেন। যে সময়ে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী 'ভারতী' পত্রিকা বার করেছিলেন। বেশীর ভাগ সময়ই লাহোরে থাকতেন তাই তাঁর একজন সম্পাদকের দরকার ছিল। এই কাজের জন্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করা হয়। সৌরীন্দ্রমোহন শরতের বন্ধু ছিল। 'বড়দিদির' একটা কপি তার কাছে ছিল সে গল্পটি সরলা দেবীকে পড়তে দেয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু 'বড়দিদি' 'প্রবাসীতে' ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা

জানা যায়নি, তবে সরলাদেবীর কাছে গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন। সরলাদেবী বলেছিলেন[১] চমৎকার! এটি দাও ভারতীতে ছাপতে। এক সংখ্যায় শেষ না করে তিন-চার সংখ্যায় শেষ করো। লেখকের নাম প্রথমে চেপে রাখো; শেষের সংখ্যায় লেখকের নাম প্রকাশ করো। লোকে ভাববে, রবীন্দ্রনাথের লেখা। এ লেখার জোরে আমাদের দেরির খেসারৎ হয়ে যাবেখন।' সৌরীন্দ্র বলল—কিন্তু 'বড়দিদি' যে ছাপতে দেব ছাপবার জন্য লেখকের অনুমতি নিইনি।' সরলা দেবী বললেন, 'চিঠি লিখে অনুমতি নাও।'

'তার উপায় নেই। তিনি এখন বর্মায়। তার কোন ঠিকঠিকানা নেই। আমরা বহুকাল তার কোন খবর পাইনি। অজ্ঞাতবাসে আছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।'

সরলাদেবী বললেন, 'যেখানেই থাকুন। এ গল্প ছাপা হলে সে সংবাদ তিনি কারো না কারো মুখে শুনবেন। তার অনুমতি ছাড়া গল্প ছাপার দায়িত্ব তুমি নিতে পারবে না?' একথা শুনে সৌরীন্দ্রমোহনের বুক গর্বে ভরে ওঠে, বলল,—'খুব পারব। তিনি পাবলিসিটি চান না, বলতেন লিখে আনন্দ পাই। তোমরা পড়ো সেই ঢের। কাজ কি ছেপে। তা ছাড়া কে বা পড়বে আমার গল্প।' সরলাদেবী বললেন, 'এতবড় শক্তিসম্পন্ন লেখকের shyness ভাল নয়। দাও ছেপে—তুমি দায়িত্ব নাও।'

সৌরীন্দ্রমোহন রাজী হয়ে তিনটি সংখ্যায় গল্পটি ছাপাবার ব্যবস্থা করল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় কিস্তিটি কোন কারণে খোয়া যায়। এবার কি হবে? ভাগলপুরে বিভূতিভূষণ ভট্টকে লিখলে সে জানালো, শরতের লেখা গল্পগুলো আছে সুরেনের কাছে। সৌরীন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে লিখল, 'বড়দিদি'র শেষাংশের কপি হারিয়েছে। তুমি যদি কপি করে না পাঠাও, তা হলে 'ভারতী'র জীবন সংশয়াপন্ন'। 'ভারতী'র সেই সংখ্যাটি[২] প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। এত সুন্দর লেখা কার হতে পারে? সাবলীল মিষ্ট ভঙ্গি, ভাষার কী অপূর্ব বাঁধন। এ-তো বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরের কাহিনী কেউ যেন বড় নিপুণ হাতে কাগজের উপর তুলে ধরেছে। সাহিত্যরসিকরা ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথই ছদ্মনামে গল্পটি লিখেছেন। এত সুন্দর

১. শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
২. ভারতী, বৈশাখ—১৯০৭ (এপ্রিল-মে)।

উৎকৃষ্ট লেখা আর কারই বা হতে পারে। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মতও তাই ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে নতুন কোন গল্প আপাতত তিনি লিখছেন না। ভারতীতে 'বড়দিদি'র প্রথম কিস্তি পড়ে মজুমদার মশায় অবাক হয়ে গেলেন। পত্রিকার একটি কপি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বললেন, 'উপন্যাস লিখবেন না বলেছিলেন, এই তো লিখচেন ভারতীতে—নাম না দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, উপন্যাস তো আমি লিখছি না, হতে পারে আমার কোন কবিতা এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে ছাপা হয়েছে। অবাক হয়ে শৈলেশ বললেন, কবিতা টবিতা নয়, রীতিমত উপন্যাস।'

'উপন্যাস? কি বলছ শৈলেশ? আমি উপন্যাস লিখলাম আর তা ভারতী'তে ছাপাও হয়ে গেল। নিশ্চয় কোথাও কোন ভুল হয়ে গেছে।'

বিরক্ত হয়ে শৈলেশ, ভারতীতে ছাপা 'বড়দিদি'র অংশটুকু পকেট থেকে বার করে বললেন, নাম না দিলেও আপনি নিজেকে লুকোতে পারবেন না। এবার আপনি কি আর না বলতে পারবেন?

শৈলেশের অভিযোগের তীব্রতার দরুনই হোক বা 'বড়দিদি'র প্রারম্ভিক অংশের দু'চার লাইনের আকর্ষণেই হোক রবীন্দ্রনাথ নীরবে অংশটুকু পড়লেন। বললেন, সত্যিই ভারি চমৎকার লেখা, এ আমি লিখিনি অন্য কারুর লেখা। কিন্তু যিনি লিখেছেন তিনি অসাধারণ শক্তিশালী লেখক। তাঁর ওই একটি মাত্র গল্প প্রকাশ করে নিঃশব্দে নেপথ্য-বাস শুধু অনুচিত নয়—নিষ্ঠুর হবে।

ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরাও গল্পটি পড়লেন। প্রত্যেকের মনে একই প্রশ্ন, লেখক কে? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র সম্পাদক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি সৌরীন্দ্রকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, বড়দিদির লেখক কে? তারপর অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে সৌরীন্দ্রর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব কাছে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সৌরীন্দ্রর কাছে শরতের সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সৌরীন্দ্রনাথ সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে শেষে বলেছিল, শরতের লেখা এ ধরনের অনেক গল্প আছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'জমা করে রেখেছো কেন? ছাপো...দেশের মঙ্গল হবে।'

সৌরীন্দ্র বলল, 'কিন্তু সে তো এখানে নেই, রেঙ্গুনে কোথায় থাকে তাও আমার জানা নেই। তার অনুমতি ছাড়া কেমন করে ছাপা যায়। রবীন্দ্রনাথ

বললেন, যা হোক কিছু করে তার খোঁজ করো, ধরে আনো তাকে। বাংলাদেশে ওর জোড়া আর লেখক পাবে না।

টলস্টয় নিজের প্রথম গল্প 'শৈশব' এল, এন, এর ছদ্মনামে লিখেছিলেন। গল্পটি পড়ে সেণ্টপীটর্সবুর্গের সাহিত্যিক-জগতে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল।

একজন লেখক তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে গল্পটি শোনাত; আর তুর্গেনেভ সেই অজ্ঞাত লেখকের এমনই প্রশংসা করেছিলেন যেমন শরতের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ করলেন। তিনি সম্পাদককে লিখেছিলেন, নিঃসন্দেহে সে প্রতিভাসম্পন্ন লেখক। তাকে লেখ যে, লেখা যেন না ছাড়ে। আর একথাও জানিয়ে দিয়ো তাকে আমার প্রণাম জানালাম, সঙ্গে প্রশংসা ও শুভেচ্ছা পাঠালাম।

'বড়দিদি' গল্পটির প্রশংসা রেঙ্গুনে বসে শরতের কানে পৌঁছল, কিন্তু স্বভাববশতঃই কারোর কাছে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেনি। তৃতীয় কিস্তিতে যখন ছাপার অক্ষরে শরতের নাম দেখা গেল তখন বন্ধুদের মনে সন্দেহ হল, এ আমাদের পাগলা শরৎ নয় তো? একজন তো শরৎচন্দ্রকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমিই 'বড়দিদি'র লেখক? শরৎ একটু কঠিন স্বরে বলল, 'ভারতীতে আমি আমার কোন লেখা পাঠাইনি।'

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সে কিছুই লুকোয়নি। যোগেন্দ্রনাথ সরকারকে সে সবকিছুই জানিয়েছিল, বলেছিল—'এ আমার অল্প বয়সের লেখা। সুরেন্দ্রের কাছে রেখে এসেছিলাম, মনে হয় গল্পটি পত্রিকায় সে-ই পাঠিয়েছে।' 'বড়দিদি' বের হওয়ার পর শরৎ হাইড্রোসিল অপারেশন করাতে কলকাতা এসেছিল। প্রায় মাস চারেক[৩] সে কলকাতায় ছিল। খুব ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করেনি। মনে হয় রেঙ্গুনে থাকাকালীন নিজ আচরণের জন্য বন্ধুদের কাছে যেতে পারেনি। বন্ধুদের এড়িয়ে গেলেও বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপেরা তাকে খুবই বিরক্ত করতে আরম্ভ করে। একটি চিঠিতে[৪] শরৎ লিখেছে 'আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন'কটা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার তো নাই।'

কলকাতায় এসে কোন বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি শরৎ কখনই উঠত

---

৩. নভেম্বর, ১৯০৭ থেকে ১৯০৮ ফেব্রুয়ারী।
৪. ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ সাল। বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা।

না। কোন অখ্যাত পল্লীতে গিয়েই উঠত। এই অখ্যাত নোংরা গলির বদনামী মেয়েদের মধ্যেই সে নারীত্বের সন্ধান খুঁজে পেয়েছিল। না-জানি কত অভাগিনী নারীর ইতিহাস সে সঞ্চিত করেছিল। তাদের কাছেই সে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করে। নিজমুখে এসব কথা বলতে কোনদিন সে কুণ্ঠাবোধ করে নি। তার এরকম স্বভাবের জন্যই বোধহয় কেউ আশ্চর্য হয়নি যে, 'বড়দিদি'র এত প্রশংসা হওয়া সত্ত্বেও সে সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে দেখা করা উচিত মনে করেনি। শুধু যাওয়ার সময় ছোট ভাই প্রভাসচন্দ্রকে বলেছিল, 'ভারতী'র যে-কটা সংখ্যায় বড়দিদি বের হয়েছে সেগুলো কিনে যেন সে পাঠিয়ে দেয়।

কলকাতায় থাকাকালীন বন্ধুদের সঙ্গে কেন সে দেখা করেনি, এ সম্বন্ধে রেঙ্গুন থেকে একটি চিঠি বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখে, 'অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি—প্রার্থনা করিতেছি যেন এখানি তোমার হাতে পড়ে। আমার সমস্ত দুষ্কৃতি ভুলিয়া সবটুকু স্নেহের চক্ষে পড়িয়ো ভাই, যেন এ লেখা আমার সার্থক হয়। তোমাদের চিঠি লিখিতে লজ্জা করিতেছে—ভয় হইতেছে যে, এই বানান ভুল এলোমেলো লেখা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিবে, আর মনে করিবে ছেলেবেলায় এই লেখা কেমন করিয়াই বা ভালবাসিতে!...এমনি অদৃষ্ট আমার যে বোধহয় মাসচারেক কলিকাতায় থাকিয়াও তোমাদের দেখিতে পাইলাম না। তুমিও কলিকাতায় আসিলে, অথচ এমনি ভুল করিলে যে দেখা হইল না। এখন মনে হইতেছে যে কোনদিন কোনকালেও দেখা হইবে কি না। একবার আশুর[৫] সহিত ও একবার একাই তোমাদের বাড়িতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু কি রকম লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল —আর গেলাম না।

পুঁটু, বড় হতভাগ্য জীবন আমার। এমন অর্থহীন নিষ্ফল নীরস দিন, মাস ও বৎসরের সমষ্টি যে কেন মাথায় বহিয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। ভগবান বুদ্ধি যদি দিয়াছিলেন, একটু সুবুদ্ধি দিলেই তো পারিতেন। যদি না দিলেন তো এত ভালবাসিতে শিখাইয়া দিলেন কেন? ভালবাসিবার একটি মাত্র পাত্র আমাকে দিলেই কি এই বিশ্বরাজ্যে তাঁহার লোকের অভাব ঘটিত! জানি না কেমন বিচার!

বুঝিতে পারি যে, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র। এ

৫. বিভূতিভূষণের এক ভাইপো।

বোঝা যে কত মর্মান্তিক তাহা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। জানি, বিশ্বাসের কোন রাস্তা আমি রাখি নাই—চির প্রবাসী দুঃখী, কুৎসিৎ আচারী আমি কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না, কিন্তু পুঁটু সমস্তটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া? আমার ঘুড়ির নীচে ভার নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই—এখন সোজা চলিতেছি না বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে? সাধু সাজিতেছি না ভাই—এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না—কিন্তু তোমরা তো ভাল, তবে তোমরাই বা এত নিষ্ঠুর হইলে কেন?

সুরেন ও গিরীনকে চিঠি দিয়া জবাব পাইলাম না; তুমিও দিলে না। আমাকে একছত্র লিখিয়া পাঠাইলেই কি তোমরা পতিত হইতে? এতদূরে থাকিয়া তোমাদের কাহারো কোন ক্ষতি করিতে পারিব না। একখানি চিঠি লিখিলেই যদি তোমাদের চরিত্র মলিন হইয়া যায় তো গেলই বা! এমন জিনিস নির্মল থাকিলেই বা কি আর মলিন হইলেই বা কি!

একদিন তো তোমরা আমাকে ভালবাসিয়াছিলে—আজ আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, এ চিঠির জবাব দিয়ো ভাই! চিরদিনই মনে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, জানিনা কেন, তুমি ও বুড়ি কোনদিন আমার প্রতি বিমুখ হইবে না—আমার এ বিশ্বাস ভাঙ্গিয়ো না। মিথ্যা যদিই বা হয় ক্ষতি কি? যে মিথ্যা কাহারো কোন ক্ষতি করিবে না, অথচ একজনকে আশ্রয় দিবে, নৈতিক অবনতি যে তাহাতে কতখানি মাপিয়া দেখিবার শিক্ষা আমার নাই, কিন্তু দয়া মায়া ও স্নেহের স্বর্ণাঙ্গে একতিল আঁচড়ও লাগিবে না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।'

কিন্তু মনে হয় পরবর্তী চার বছরের মধ্যে এ বিশ্বাসের মর্যাদা শরৎ রাখতে পারেনি। নিজেকে জাহির করার অভ্যেস তার কোনকালেও ছিল না। যশের কাঙালও সে নয়।

গিরীনমামাকে শরৎ লিখেছিল[৩] 'যদি আমি যশের কাঙাল হতাম, তাহলে দিনের পর দিন এত সময় আমি নষ্ট করতাম না।'

'মন্দির' গল্পটির জন্য পুরস্কার পেয়েও সে কারো কাছে নিজেকে জাহির করেনি। ঠিক সেই রকমই 'বড়দিদি' ছাপবার পরও সে চুপচাপ থাকে।

৩. ১৮ই মার্চ ১৯১৩ সাল।

রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েও অন্ধকারেই নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। শুধু মনের অতলে কোথাও একটা কিছু ঘটে যাচ্ছিল যার দরুন তার নিজের জীবনটাই যে বদলে গেল তা নয়, বরং ভারতীয় সাহিত্যের ধারাও যেন এক নতুন গতি পেল। সাধারণ মানুষের মনকে অভিভূত করে দেয় এমন এক জীবন্ত সৃজনীশক্তি, মানব অভিজ্ঞতাকে মহীয়সী করে তুলে ধরা এমন এক মহান লোকপ্রিয় কথাশিল্পী কোথায় হারিয়ে যেত, যদি না সৌরীন্দ্রমোহন 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' গল্পটি প্রকাশ করত। নইলে নিজেকে সবার আড়ালে লুকিয়ে রাখার প্রবৃত্তির দরুন আত্মগোপনকারী শরতের প্রতিভা রেঙ্গুনের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসের ফাইলের মধ্যে বেঘোরে মারা যেত। হিন্দি সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীইলাচন্দ্র যোশী কলকাতায় বেশ কয়েক বছর শরতের সংস্পর্শে থাকেন। তিনি লিখেছেন, 'মনে হয় সাহিত্য ও সমাজে অজ্ঞাত ও অপরিচিত থাকার মধ্যে শরৎ এক বিচিত্র ধরনের সুখ পেত। তার অন্তরের কয়েকটি গ্রন্থি এমন ছিল যার দরুন খ্যাতি ও সম্মান নিতে সে কুণ্ঠাবোধ করত। সে যা কিছু লিখত বোধহয় এই ভেবেই লিখত যে তার মৃত্যুর পরই সেগুলি যেন ছাপা হয়। আর স্বর্গীয় লেখক নিজের লেখনীর সাহায্যে সবার মন জয় করে নেবে। এই অনুভূতির জন্য জীবিত অবস্থায় কোন সম্মানই সে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি।'

লেখা সে কোনদিন ছাড়েনি, ধীর মন্থর গতিতে তা দিনের পর দিন এগিয়ে গেছে। তবুও আশ্চর্য এই যে, বর্মায় তার বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই জানত না যে শরৎ সত্যিই একজন বেশ ভালো লেখক। এ রহস্য অবশ্য শেষপর্যন্ত চাপা থাকেনি, যখন শরৎ একটি প্রবন্ধ 'বেঙ্গল ক্লাবের' সাহিত্য গোষ্ঠীর জন্য লেখে। বেঙ্গল স্যোশাল ক্লাবটি ভেঙ্গে যাবার পর কয়েকজন সদস্য মিলে এই ক্লাবটির স্থাপনা করে। এই সাহিত্যসভায় কবিতা, কাহিনী ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পড়া হত, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদিও হত। বাকপটু হওয়ার দরুন সবার আগে শরৎই আলোচনা শুরু করত। বন্ধুরা বলে যে, এত যখন বলতে পারো তা হলে নিজে লেখ না কেন? শরৎ বলেছিল,—আমি লিখতে পারি না, বেশী পড়াশোনা করিনি।

চিরদিনের সেই মিথ্যা ও নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবৃত্তি। কিন্তু একদিন যখন নারী চরিত্র নিয়ে সভায় তুমুল তর্ক চলছে তখন নানান জ্ঞানী-গুণীদের বই থেকে উদাহরণ দিয়ে শরৎ সবাইকে অবাক করে দেয়, আর সে ধরাও

পড়ে। বন্ধুরা বলল, তুমি তো বলতে যে বেশী পড়ালেখা করনি, এত যে জ্ঞানের কথা আজ বললে সে কি না পড়েই ? এর পরের বার তোমাকেই প্রবন্ধ লিখতে হবে। সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দেওয়া হল যে আগামী বৈঠকে নারীর ইতিহাস নামক প্রবন্ধ শরৎ পড়বে। প্রবন্ধে নারীর সামাজিক জীবনে যৌনতার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে।

সবাই সেই দিনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইল। বিষয়টির নতুনত্বের দরুন সভার দিন প্রচুর ভিড় হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত বক্তার পাত্তা নেই। সময় বয়ে যায়। চেয়ারে বসে সভাপতি ক্লান্তি বোধ করছিলেন, সভামণ্ডলী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দুজন সদস্যকে শরতের খোঁজে পাঠানো হল আর উদ্‌বোধন সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু করে দেওয়া হল। সেদিন আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও আর এক জন সদস্য দেড়মাইল হেঁটে শরতের বাড়ী পৌঁছে দেখে যে সে বাড়ীতে নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজন বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই ? সরকার বলল, শরৎ বাড়ি নেই ? লোকটি বলল, আপনারা কে ? কোত্থেকে আসছেন ?

সরকার বলল, 'আমরা বেঙ্গলী ক্লাব থেকে এসেছি। আজ সেখানে শরতের...'পুরো কথাটা শোনার আগেই লোকটি ভেতরে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, 'বাবু বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন, সভায় যেতে পারছেন না। আমার কাছে এই কাগজ দিয়ে গেছেন দেবার জন্য।'

কথা শুনে তো তারা থ। প্রবন্ধটি হাতে নিয়ে আরো অবাক হল, ছোট ছোট অক্ষরে লেখা যেন একটি মহাভারত। সভায় ফিরে পুরো ঘটনা বলল। সবাই মিলে ঠিক করল যে শরৎবাবু সভায় উপস্থিত না হতে পারলেও তার প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করা হবে। কিন্তু পড়বেটা কে ? যদিও পরিষ্কার হরফে লেখা, কিন্তু এত ছোট ছোট আর প্রায় অনেক পাতার প্রবন্ধ। শেষ পর্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকারকেই পড়তে হল। পরে অবশ্য জানা যায় যে শরৎ এই শর্তেই প্রবন্ধ লেখে যে সভায় প্রবন্ধটি সে পাঠ করবে না। রাশি রাশি কোটেশনে ভর্তি সেই প্রবন্ধটি পাঠ করতে যোগেন্দ্রের প্রায় পুরো দুটো ঘণ্টা লেগেছিল। সভা স্তব্ধ। তার ভাষা ও গঠন সাবলীল বিষয়বস্তু এত নিপুণ, যুক্তিসম্মত ও মৌলিক যে সবাই মুক্তকণ্ঠে প্রবন্ধটির প্রশংসা করে।

'বড়দিদি' শরতের ছোটবেলার রচনা কিন্তু সেদিন তার সহজ প্রতিভা আর পরিণত-রচনা-কৌশলের পরিচয় সবার সামনে উন্মোচিত হয়।

একদিন ছবি দেখতে দেখতে যোগেন্দ্রনাথ সরকার একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে পায়। মোটা মলাটের খাতায় মুক্তো অক্ষরে প্রায় আট-নটা অধ্যায় লেখা ছিল। খাতার উপর নাম ছিল 'চরিত্রহীন'। শুরু করলে আর ছাড়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ছাড়া এত ভাল লেখা সে আর পড়েনি। কিছুদিন আগেই 'গোরা' প্রকাশিত হয়[৭]।

পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় কয়েকজনের নাম লেখা ছিল। জিজ্ঞেস করাতে শরৎ বলে, 'ভাগলপুরে আমাদের একটি সাহিত্য-সভা ছিল ওরা তারই সদস্য। তাদের মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনী-সংগ্রহ 'শেফালী' নামে বের হয়। যোগেন্দ্রনাথ গল্পগুলির খুব প্রশংসা করেন। শরৎ বলল, 'ওঃ! অমুক তো! ও বেশ লেখে। —কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমাকেই গুরু বলে পরিচয় দেয়'। সরকার বলল,—'তা বটে। কিন্তু দেখছি শিষ্যবিদ্যা গরিয়সী'।

শরৎ হেসে বলল, 'ওহে আমিও নেহাৎ মন্দ লিখি নে। লিখলে অনেকের চেয়েই বোধহয় ভাল লিখতে পারি।'

যোগেন্দ্র জানত মনের আগুন চিরদিন চাপা থাকে না। শরৎকে ক্রমাগত উৎসাহ জুগিয়ে 'নারীর ইতিহাস' বলতে গেলে সে-ই লিখিয়েছিল। বাংলা-দেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় সাতশো কূলত্যাগিনী অভাগিনী নারীর করুণ জীবন কাহিনী এতে লেখা হয়। এতে তাদের নাম ঠিকানা, বয়স, জাত বংশ পরিচয় ও কূলত্যাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর্যন্ত দেওয়া হয়। নারীর যৌন জীবনের রহস্য, দৈবী ও মানবীয় অগোচর নারীর বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে গম্ভীর বিবেচনা ও অনুশীলনপূর্বক সত্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছিল। এর জন্য শরৎকে দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হয়। এই সংগ্রহখানি সম্বন্ধে অনেকদিন পরে তিনি বলেছিলেন,[৮] 'এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কূলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশিজন সধবা। বিধবা খুব কম। স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি, আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি অনেক দুঃখে মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়। পরপুরুষের রূপেরও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা

৭. ১৩১০ সাল।
৮. ১৪ই আগষ্ট ১৯১৯ সাল। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা।

আশ্চর্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।'

পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ে শরতের যে এত পড়া ছিল, সে কথা সাধারণ লোকেরা সেদিন মানতে চায়নি। যখনই সে কোন গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করেছে লোকেরা তা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে,—কে বলেছে এ সব কথা, শরৎ চাটুজ্জে? ওর কথা বাদ দাও কি না বলে ও।

লোকে যাই বলুক না কেন, মিল, স্পেন্সর, কাণ্ট শরতের প্রিয় দার্শনিক ছিলেন। স্পেনসরের সহজ সরল অভিব্যক্তি তার দারুণ ভাল লাগত। বিশ্বাস করত যে, সত্যের সহজ উপলব্ধি ছাড়া অভিব্যক্তি সহজ হতে পারে না। 'ডিসক্রিয়েটিভ স্যোসিওলজি' সে খুব ভালভাবে পড়েছিল।

ঔপন্যাসিক ডিকেন্স শরতের প্রিয় লেখক ছিলেন। টলস্টয় ডিকেন্সকে ভালবাসতেন তার কারণ, টলস্টয় নিজের ডায়েরীতে লিখেছেন 'লেখকের জনপ্রিয়তার প্রথম শর্ত হল সেই ভালবাসা যা নিজের সৃষ্ট চরিত্রে প্রকাশ করে। হয় তো সেজন্যই ডিকেন্সের চরিত্রগুলি সারা বিশ্বের চোখে সমান প্রিয়'। আমেরিকা ও রাশিয়ার মানুষকে যা এক করে তোলে শরৎ এমন চরিত্রের খোঁজে ছিল। ডিকেন্স ছাড়া টলস্টয়, জোলা ও হেনরি উড ও তার প্রিয় লেখক ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি আর কাউকে স্বীকার করেনি। বলত, 'অন্য কবিদের মত হওয়ার চেষ্টা হয়তো করা যেতে পারে, কিন্তু রবিবাবু? তাঁর এই কবিতাটির কথা একবার ভাব তো। এমন সুন্দর কবিতা কেউ লিখতে পারে?

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা;
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত।
তোমার বীণা তারে বাজিছে তারা॥
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

পড়তে পড়তে শরতের চোখদুটি জলে ভরে উঠত। বলত, 'কবিতার মূলে কল্পনা মেশালেই তা মহৎ হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই সত্যের উপলব্ধি, তখনই যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। সরকার বলল, 'অনেকে বলে রবিবাবুর কবিতা নাকি ভারি শক্ত ?

শরৎ বলল, 'সে কথা ঠিক কিন্তু সহানুভূতির উষ্ণতায় সে জিনিস কঠিন থেকে সরস হয়ে যায়, সে উপলব্ধি তো অন্তরের উপলব্ধি। তা না হলে কবিতা বুঝতে চাওয়া বিড়ম্বনা বই আর কিছু নয়। কবিতা এমন হওয়া চাই যা পড়তে ও শুনতে ভাল লাগে। শোনামাত্র তৃপ্তিতে মন ভরে যায়। এমন গভীর ভাব থাকবে যা সহজ-কল্পনার বাইরে, তা যদি না হয় তা হলে 'তুমি মারলে ধাক্কা, আমি মারলাম ঠেলা,' একে কি কবিতা বলা যায়। এ যেন সেই শ্রীমান্ বংশীমোহনের 'ওহে তালগাছ তুমি কেন এত লম্বা, ভীত জগদম্বা'-র মত কবিতা হয়ে যাবে।'

৭.

একদিকে অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলত, অপরদিকে সর্বহারা মানুষের জীবনের গভীরে ঢুকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের খেলায় শরৎ বিভোর ছিল। এই সর্বহারা মানুষদের মধ্যে থেকে সে গল্প উপন্যাসের অনেক চরিত্র খুঁজে পেয়েছিল। অসহায় নিরাশ্রিতদের দেখে তার মন বেদনায় ভেঙে পড়ত। তাদের ছোট কাজ করতে দেখলে তার আত্মাভিমান জেগে উঠত। যথাশক্তি তাদের সাহায্য করত। দেশে ফিরে যাবার জন্য টিকিট কেটে অনেককে জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে আসত। কু-পথগামী কত মেয়েকে এভাবে সে রক্ষা করেছিল।

কত রকম বিচিত্র চরিত্রের সান্নিধ্যেই না তাকে আসতে হয়েছে। নিজের তখন খাওয়া পরার সঙ্গতি নেই, কয়েক কাপ চা খেয়ে দিনের পর দিন কেটে

যেত। একদিন বাড়ির কাছেই এক বামুনপুরুতের সঙ্গে দেখা হয়। পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। পুরুতমশাই একদিন বলল, 'দাদা আপনার খাওয়া দাওয়ার ভারি অসুবিধে দেখছি, আমার বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় না?'

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না-না, এখানে আমার কোনই অসুবিধে হচ্ছে না।'

পুরুত মশাই প্রায়ই অনুরোধ-উপরোধ করেন। শেষপর্যন্ত এই স্নেহপূর্ণ নিমন্ত্রণ স্বীকার না করে পারেনি। অবশ্য আর একটা কারণ ছিল, পুরুত মশাইয়ের সাংসারিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, শরৎ যদি তার বাসায় খাওয়া দাওয়া করে তাতে হয়তো তাদের কিছু সুবিধে হতে পারে, এ-সব ভেবে শরৎ রাজী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ বাড়িতে একটা অসম্ভাব্য কাণ্ড ঘটে গেল। শরৎ জানত না যে, বাড়িতে যে-স্ত্রীলোকটি রান্না করে সে পুরুত মশায়ের স্ত্রী নয়, রক্ষিতা। তার নাম ছিল হরিমতি। শরৎকে সে খুব যত্নআত্তি করত। সেদিন কী জানি কি কারণে পুরুত ঠাকুর ও হরিমতির মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। পুরুত ঠাকুর গলার পইতেখানি কোমরে জড়াতে জড়াতে আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, 'দেখছ দাদা মাগীর কাণ্ড, এই ছোটজাতের মাথায়......।'

পুরুত ঠাকুর সম্পূর্ণ বলার আগেই হরিমতি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়ি উনুনে চড়িয়ে মাথায় কাপড় টেনে দরজার আড়ালে সরে গিয়ে বলল, 'সাবধান! ছোট জাতের কে? আমি নয়, তুই। তুই-ই হচ্ছিস—। খবরদার বলছি জাত তুলে কথা বলবি না। তুই কি ভেবেছিস আমি বাজারের মেয়ে? যা বলবি তাই মেনে চলব? আমি বৈষ্ণবী। তোর মত ছোট জাতের বামুন আমি ঢের দেখেছি, মুখ সামলে কথা বল, না দিস খেতে, না পরতে—তার উপর লম্বা লম্বা বুলি......।'

হরিমতির বিরামহীন চোপা শুনে শরৎ সেদিন বুঝতে পেরেছিল এরা অতি দরিদ্র। পুরুত ঠাকুর হরিমতিকে কাছে রেখেছে কিন্তু ভাল ব্যবহার করে না। খেটে খুটে পুরুত ঠাকুরকে খাইয়ে পরিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বয়সও হয়েছে বেচারীর। তার অবস্থা দেখে শরতের মনে খুব দুঃখ হল। দুজনের ঝগড়া থামাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারল না। ঝগড়ার পর থেকে হরিমতির হাতে খরচ দেওয়া পুরুত ঠাকুর বন্ধ করে দিল।

হরিমতি কেঁদে কেঁদে নিজের কাহিনী শরৎকে বলেছিল। শরৎ তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, 'আমার মনে হয় তুমি কলকাতা ফিরে যাও।'

হরিমতি বলেছিল, 'দাদাঠাকুর, আপনি যদি সে ব্যবস্থা করে দেন আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। মাগোদের এই দেশ ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পারি চলে যেতে চাই।'

কিন্তু একদিন চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই প্লেগ হয়ে হরিমতি সব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। কিন্তু শরৎ ভারি বিপদে পড়ে। প্লেগের নাম শুনে কেউ কাছে আসতে চায় না। মদ খাইয়ে কোনরকমে চার পাঁচজন লোক জোগাড় করে হরিমতির দাহ-সংস্কার করা হয়।

মিস্ত্রি পল্লীতে এ ধরনের গল্প বা ঘটনা নতুন ছিল না। শরৎ জানতে পারলেই হোমিওপ্যাথী ওষুধের বাক্সটি সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াত। প্রয়োজনে ওষুধ দিত, ঝগড়ার নিষ্পত্তি করত।

সেদিন পাড়ার এক মিস্ত্রির বউয়ের খুব জ্বর হয়। মিস্ত্রি এসে কেঁদে পড়ল; বলল,—'দাদাঠাকুর, বউয়ের খুব জ্বর, আপনি নিজে গিয়ে একটু দেখবেন আসুন।' শরৎ সঙ্গে সঙ্গে সেই মিস্ত্রির সঙ্গে তার বাড়ি গিয়েছিল। জ্বরে বউ অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। সৌভাগ্যবশতঃ শরতের ওষুধে সে ঠিক হয়ে যায়। মিস্ত্রিবউ সেই থেকে 'বাবা' বলে ডাকত। একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সে শুনল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নাকি ঝগড়া হয়ে গেছে। শরৎ মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বউকে আমি কোনদিন জোরে কথা পর্যন্ত বলতে শুনিনি কিন্তু আজ হঠাৎ কি হল?'

মিস্ত্রি খুব রেগে ছিল, কোনদিন বউয়ের নামে একটা কথাও বলেনি, রাগের মাথায় বলে ফেলল—'আপনি তো সব খবর জানেন না বাবাঠাকুর। আমি এই মাগীকে শ্মশান থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম কি-না জিজ্ঞেস করুন? খাওয়া পরার কোন কষ্ট নেই। তবু দিন রাত খচ্-খচ্ করে। এতই যদি তাহলে আমার সঙ্গে কণ্ঠী বদল করতে গিয়েছিল কেন?'

বাবাঠাকুরের সামনে এত বড় দুর্নাম শুনে মিস্ত্রি-বউই বা নীরবে থাকবে কেন? মাথায় কাপড় টেনে দরজার আড়াল থেকে সে-ও চিৎকার করে বলল, 'বাবাঠাকুরের সামনে আমার নামে তুমি অনেক কিছু বলেছ। নিজেকে ভদ্রলোক বলে জাহির করছ। আমার সর্বনাশ করে আবার আমার নামেই দুর্নাম রটাচ্ছ। মাসী ছিল তাই রক্ষে নইলে কাল রাত্তিরে তো আমায় মেরেই

ফেলতে। আমি কি দুঃখে তোমার মার সইব? কথায় কথায় বল বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা, আমি কি কিছুই জানি না, না, বুঝতে পারি না। যাকে বিয়ে করেছিলে সে এখন এখানে নিজের ভাইয়ের কাছে এসে রয়েছে। আমাকে বার করে দিয়ে সে মাগীকে এখানে এনে রাখবে। সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাইছ না কেন? আমার গয়না গাঁটি আর কলকাতা যাওয়ার খরচ-পত্তর আমায় দিয়ে দাও, তারপর সে মাগীকে নিয়ে যেখানে খুশী গিয়ে থাকগে। অনেক সয়েছি আর নয়, আজ এখুনি আমার সব চাই এই কথা বলে রাখলাম। আমার সর্বনাশ তো করেইছ, কিন্তু চন্দ্র স্যিয্যি এখনও ওঠে, ভগবান করে, রাত পোহাতে না পোহাতে তোর সর্বনাশ দেখি।' এরপর মিস্ত্রিবউ কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কোনরকমে শরৎ তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তখনকার মতো শান্ত করেছিল। মিস্ত্রি সময়মত কারখানায় গেল কিন্তু আর ফিরে এল না। এমনি করে ক'দিন কেটে গেল। শরৎ খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে এল। বউয়ের এ-ব্যাপারে সত্যি কোন দোষ ছিল না। মিস্ত্রির বিয়ে করা বউ ভায়ের বাড়ি এসে উঠেছিল, বোধহয় সেই বউ নিয়ে সে কোথাও সরে পড়েছিল। শরৎ কণ্ঠী-বদল-করা-বউকে বলল, তুমি কলকাতা ফিরে যাও। বউ বলল, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখন আর আমি কি করব দাদাঠাকুর? আমার কাশীবাস করাই ঠিক।'

শরৎ তাকে কাশী পাঠিয়ে দিল। শরতের এক বন্ধু ছিল, তার নাম শ্রীসুরেন্দ্র মান্না। দুজনে একই বাড়িতে থাকত। গান বাজনার ভারি শখ ছিল তার। কীর্তন বেশ ভাল গাইতে পারত। শরৎ সুর দিত। সুরেন্দ্র মান্নার নিজের একটা সংকীর্তনের দল ছিল। একদিন সুরেন্দ্র মান্নার চাকরি গেল। সে কি করে? অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে যে 'নামটু গোল্ড মাইনে' চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শরৎ তাকে বলল, 'তুমি এই মুহূর্তে নামটু চলে যাও।' তার কদিন পরে তাকে দেখে শরৎ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নামটু যাচ্ছ না কেন? কী ব্যাপার?' প্রথমে সামান্য একটু দ্বিধা করার পর বলল, 'কেমন করে যাই দা'ঠাকুর, হাতে পয়সা কড়ি কিছু নেই। হোটেলে খাওয়ার পয়সা বাকি রয়েছে, বন্ধুদের কাছেও কিছু ধার কর্জ রয়েছে। তাও তো যাবার আগে শোধ করে যাওয়া উচিত।'

শরতের মুখে চট করে কোন উত্তর জোগাল না। সেও তো একজন সামান্য কেরানী। তার পরদিন সুরেন্দ্রকে সে ডেকে পাঠাল, বলল,—'নামটু

যাবার পথ ঘাট চেন? প্রথমে মাগুলে যেতে হয়, তারপর লাসিয়োর পক্ষে নামিয়ো পড়বে। সেখান থেকে গোল্ড মাইনের দিকে একটা গাড়ি যায়, সেটা কোন যাত্রীবাহী গাড়ি নয় তবে তুমি তোমার বন্ধুর লেখা চিঠিখানি দেখালে তোমার গাড়িতে জায়গা পেতে বেগ পেতে হবে না। ভাড়া বাবদ পনেরো টাকা খরচ লাগে, সে টাকা আমি তোমায় দিচ্ছি, তুমি এখুনি রওয়ানা হয়ে পড়।'

সুরেন্দ্র হঠাৎ যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারল না! বলল, 'দা'ঠাকুর, ধার কর্জ শোধ না করে এভাবে যাওয়া কি ভাল হবে।'

শরৎ বলল, 'সে কথা নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। সে সব আমি শোধ করে দেব। হ্যাঁ, আর একটা কথা সেখানে ভয়ঙ্কর শীত, কাপড়-চোপড়ের দরকার থাকলে আমায় লিখে জানিও, কেমন?' তারপর হাতে টাকা দিয়ে বলেছিল, 'সকাল বেলা গাড়ি ছাড়বে তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।'

সুরেন্দ্র চলে গেল, জানতেও পারল না যে তার হাতে টাকা দেবার পর শরতের হাতে সেদিন আর একটি কপর্দকও ছিল না। শুধু এক কাপ চা খেয়ে সেদিন সে অফিসে গিয়েছিল, রাতেও একগ্লাস দুধ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। কত লোক তো শরতের বাড়ির দরজার কড়া নেড়ে ভিক্ষে বা সাহায্য চাইতে আসত। একদিন যোগেন্দ্রের সঙ্গে মানুষের অভাব দৈন্য সংক্রান্ত কথাবার্তা হচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় খুটখুট শব্দ। উঁকি মেরে দেখা গেল সেই চিরপরিচিত নারদমুনি কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। শরৎ নীচে গিয়ে হাত ধরে বুড়োকে উপরে নিয়ে গিয়ে যোগেন্দ্রকে বলল, 'এ লোকটা সত্যিই ভগবানের দয়ার পাত্র। ভালবেসে নিজের সব খুইয়ে সত্যি যদি কেউ পথের ভিখিরি হতে পারে তাহলে এর গল্পটিও সত্যি। পুরুত ডেকে শাঁখ বাজিয়ে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছিল, সে যেই হোক, বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা ও বুকভরা ভালবাসা সে পেয়েছিল। সেই বউ প্লেগে মরে যাওয়াতে শোকে পাগল হয়ে পড়ে। প্রায় তিন-চারশো টাকার মত ডাক্তারের পেছনে খরচ হয়েছিল। বউ বাঁচতো তো একটা কথা ছিল। তাই তো আমি বলি বেচারী সত্যিই ভগবানের করুণার পাত্র। তবে যেমন মেরেছেন, রক্ষাও আবার তিনিই করবেন, নইলে সংসার চলবে কেমন করে?' এতটা বলে শরৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কয়েকটা মুহূর্ত শূন্যের দিকে চেয়ে রইল, হয়ত তার নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গিয়ে থাকবে। সে-ও যে প্লেগেই মারা

যায়। ভেতরে গিয়ে এক কাপ চা নিয়ে এসে পরম স্নেহের সঙ্গে বুড়োকে বলল, 'দেখ নারদমুনি! তোমার যখন যা দরকার আমায় জানিও। যদি তা না কর আমি কিন্তু কোনদিন তোমায় ক্ষমা করব না। যদি কোনদিন জানতে পারি যে তুমি অভুক্ত রয়েছে, তাহলে আর আমার ঘরের দরজা মাড়িওনা।'

নারদ মুনি গদ্‌গদ হয়ে জবাব দেয়, 'তাই কি কখনও হয় দা'ঠাকুর। আপনার মত দয়ালু ঠাকুর থাকতে অভুক্ত কেমন করে থাকব বলুন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোহা লক্কড়ের শক্ত কাজ করতে পারো আর এই সোজা কাজটা করতে পারবে না? খুব পারবে।' এই বলে শরৎ তামাক খাওয়ায় মন দিল। নারদ মুনি কিন্তু তার আসল নাম নয়, আসলে সে একটা সাধারণ মিস্ত্রিশ্রেণীর লোক ছিল। জীবনে এমন কোনরকম বদ নেশা ও পাপ নেই যা সে করেনি। শনিবার সন্ধ্যায় মদ খেয়ে সোমবার সকাল পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা তার রোজকার কাজ ছিল। তারপর অসুখের ছুতো করে অফিস থেকে ছুটি নিত। তার মাতলামি শরৎ বহুবার দেখেছে। তাই তো 'পথের দাবী'র স্রষ্টা লিখতে পেরেছেন—

'অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশজন স্ত্রীলোকে মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানারংয়ের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়ো গোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে,— তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ-ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-বমি করিয়া আসিল। একজন অল্প-বয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধহয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয় ত অল্পদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙ্গালী মেয়েমানুষকে চোখের সমুখে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল।'

কিন্তু শরৎ হতভম্ব হয়নি। কারণ সে জানত এরা তার থেকে আলাদা

নয়। শরৎ বিশ্বাস করত অপরের ভাল করা নামক কোন কথা যদি পৃথিবীতে থাকে, তার যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে সে প্রয়োজন এখানে এদেরই সবচেয়ে বেশী। যখন লোকেরা বাড়াবাড়ি করে নিজের জীবন নষ্ট করে ফেলে তখন তাদের ঘৃণা করতে নেই, ভালবেসে তাদের বোঝাতে হয়। একদিন যোগেন্দ্রের সামনে একজন অসুস্থ বলে দরখাস্ত লেখাতে এল। শরৎ লিখে দেবার পর সে চলে যেতেই যোগেন্দ্র শরৎকে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখের কোন লক্ষণ তো দেখা গেল না।'

শরৎ হেসে ফেলল, বলল—'অসুখ থাকলে তো দেখা যাবে। শনিবার সন্ধ্যেতে এদের ঘাড়ে ভূত চাপে। দু-তিন দিন পর্যন্ত সে ভূত থাকে। অনেক বোঝাই, ধমক দিই যদি আসছে শনিবারে আবার ভূত চাপে তো আমি নিজে গিয়ে তোমার বড়সাহেব-কে বলে আসব। তোমার চাকরি যাবে। তখন এরা কত রকম দিব্য দেয়, বলে, 'আর কখনও মদ খাব না, যদি খাই তা হলে যেন মা-বাপের রক্ত......।'

কিন্তু মা-বাপের রক্তও শেষ পর্যন্ত তাদের শপথ রক্ষা করাতে পারে না।

সরকার আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এ ধরনের লোকেদের মধ্যে আপনি থাকেন কেন?'

শরতকে কেউ যেন জোরে ধাক্কা মারল। জলভরা চোখ দুটি তুলে সরকারের দিকে তাকাল, বলল, 'এরা বড়ই অভাগা সরকার, কিন্তু তবু মানুষ তো! এদের একটুও ভাল না করে যদি দূর দূর করে দূরেই সরিয়ে দিই তাহলে এরা যে আরও বিগড়ে যাবে।'

বলতে বলতে যেন সে কোথায় হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্ম-বিভোর হয়ে বসে থেকে বলল, 'কোন অবস্থাতেই মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। যে লোক খারাপ তাকে শোধরাবার চেষ্টা করা উচিত। এ সত্যিই খুব বড় কাজ। ভগবানের এই রাজত্বে মানুষ যতখানি শক্তিমান ঠিক ততখানিই সে দুর্বল। কখনও যদি সোমবার দিন সকালে আস দেখবে আমি সত্যি কথাই বলছি। ঘাড়ের ভূত যখন নেমে যায়, সংসারের অস্তিত্ব তখন টের পায়, দরখাস্ত না দিলে চাকরি থাকবে না বুঝতে পারে। তখন লজ্জার মাথা খেয়ে অসুখের দরখাস্ত লেখাতে আমার কাছে আসে। তখন আমি তাদের বদ্ অভ্যেসের কথা ভুলে যাই, ভাবি, হায়! এই অভাগা

মানুষগুলো কত অসহায়।' বলতে বলতে চোখ দুটি আবার জলে ভরে উঠল।

কখনও যে শরৎ রাগ করত না তা নয়। কিন্তু কাউকে ঘৃণা সে কোনদিন করেনি। কারণ তার মনে হত, যারা মদ খায় তারা হৃদয়, মন ও বুদ্ধির ব্যাপকতায়, মদ যারা খায় না তাদের থেকে অনেক ছোট, এ কথা কোনমতেই সত্য নয়। তাই তো ছোটজাতের সেই সব নেশাখোরেরা তাকে 'বামুন দা' বলে ডাকত। তাদের নিয়ে সে একটা সংকীর্তন দলও গড়েছিল। যদিও মনে মনে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল তবু তাদের দুর্গুণ ছাড়াবার জন্য কীর্তন গাইত, রামকৃষ্ণ মিশনের উৎসবে যোগ দিত।

এ ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার, যে নিজে মদ খায় ও নানান বদ্ অভ্যাসের দাস, সে অন্যের কু-অভ্যাস ও দুর্নাম ঘোচাবার চেষ্টা করছে। বন্ধুদের কানে মাঝে মাঝে তার সেই বিশ্রী গুণপনার কথা বেশ পল্লবিত হয়ে পৌছত। ফলে অনেকেই তার সম্বন্ধে অনেক অবিশ্বসনীয় ঘটনার সৃষ্টি করে। তার সম্বন্ধে সে সব কথা শুধু যে অতিরঞ্জিত তা নয় একেবারেই মিথ্যে। সত্যি কথা এই টুকুই যে শরতের মধ্যে আরো কয়েকটি শরৎ আসন গেড়ে বসেছিল, যারা তার চারপাশে একটা রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে রাখতে চাইত। নিজেকে লুকিয়ে রাখা, আর অবচেতন মনে সমাজের উপর প্রতিশোধ নেবার নিদারুণ ঘৃণা কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকত। সে যে একটা 'কেউ' একথা সে বলতে চাইত। নইলে মদ খেয়ে মাতাল হতে কেউ কি কোন দিন তাকে দেখেছে? পঞ্চাশ বছর পর[১] তার এক বন্ধুর ছোট ভাই বলেছিল, একদিন সে খুব দেরি করে ফেরে। মেসের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বারবার ডাকার পরও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন বাধ্য হয়ে আমি দরজা খুলে দিলাম। তিনি ভেতরে ঢুকে পড়লেন। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির ফলে মনে হয় তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে, বমি করে ফেললেন। খুব মদ খেয়েছিলেন কিন্তু হুঁশ ছিল। ভালবেসে বললেন, 'কনিষ্ঠ, তুমিই শুধু আমায় ভালবাস।'

মদ অনেকে খায়। শরৎও খেত, তা বলে সে কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তার সবচেয়ে বড় অপরাধ, সে তথাকথিত ছোট ও চরিত্রহীন লোকেদের সঙ্গে বাস করত। যখনই সুযোগ পেত 'জাভা', 'সুমাত্রা', 'বোর্নিও'র অধ্যাত দ্বীপ-গুলোতে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। তাদেরই একজন হয়ে সে বাঁচতে চাইত।

১. ১৯৬০ সালে লেখক রেঙ্গুনে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এই অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির দরুন অনেক কিছুই সে হারিয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে পেয়েও ছিল প্রচুর। শরীর অকালে জর্জর হয়ে পড়েছিল, সে কি অভিজ্ঞতার ভারে?

এই অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পাই আমরা 'শ্রীকান্তে', 'চরিত্রহীনে' ও আরও অনেক গল্পে। সে যুগে মানুষের চিত্তজয়ী লেখক কি আজকের মানুষের ভালবাসার মোহ-পাশ কাটাতে পেরেছেন? সর্বকালের জনচিত্তজয়ী শরৎ নিজেকে কোনদিন চিনতে পেরেছিল কি-না তা-ই বা কে বলতে পারে?

৮.

শান্তির মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা শরৎ আর ভাবেনি। বয়সও হয়ে গিয়েছিল। দুঃখ ঝড়ের আপদে বিপদে যৌবন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। সারাদিন অফিসে খাটাখাটুনির পর বাড়ি ফিরে হয় লিখত, না হয় ছবি আঁকত। কিন্তু সমাজের সভ্য লোকেদের মধ্যে এ-রটনা কেমন করে ছড়িয়ে পড়ে যে, শরৎ একটি ছোটজাতের স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকে। একজন বলে, 'স্ত্রীলোকটির নাম নাকি বিরাজ বউ।'

অন্যজন বলে, 'না, না, তার নাম নয়নতারা।'

তৃতীয়জন বলে, 'নয়নতারা নয়, শশিতারা।'

এ ছাড়াও আরো অনেক নাম তাদের জানা ছিল। কিন্তু কেউ তার বাড়ি গিয়ে বাস্তবিক খবরাখবর নেবার চেষ্টা করেনি। ভদ্রলোকেরা চরিত্রহীন লোকের বাড়ি যায়ই-বা কেমন করে? কোন কাজে যদি কেউ যেত, বাইরের বৈঠকখানায় বসে চলে আসত। এটুকু খবরই তাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক আছে, আর সে শরতের স্ত্রী নয়।

সেবার মাঘোৎসবের দিন কীর্তন গাইবার জন্য মৃদঙ্গের দরকার পড়ল। একজন বলল, 'শরতের কাছে মৃদঙ্গ আছে, নিয়ে আসব?' এর আগে সে

শরতের বাড়ি কখনও যায়নি। শরৎ আপ্যায়ন করে বসতে দিয়ে বলল, 'বলুন আমি আপনার কি কাজে লাগতে পারি ?'

বন্ধুটি বলল, 'ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে মৃদঙ্গের দরকার, আপনি কি দিতে পারবেন ?'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই যে টাঙানো রয়েছে সে তো আপনাদের জন্যই।'

বন্ধু আবার বলল, 'এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য কোন লোক পাওয়া যাবে কি ?'

সেদিনটা ছিল আবার রবিবার। রবিবার মিস্ত্রিপাড়ার যা অবস্থা হয়, লোক পাওয়াই মুস্কিল। শরৎ কিছু বলবার আগেই ভেতর থেকে নারী-কণ্ঠের ঝংকার শোনা গেল, 'ভক্তের আবার মৃদঙ্গ বইবার লোকের দরকার হয় নাকি ?'

তীব্র বিদ্রূপে বন্ধুর মনে আঘাত লাগে, বলল, 'সে তো নিশ্চয়। আমি নিজেই এটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।' মৃদঙ্গ নিয়ে যাবার আগে সে আর একটা কথাও জেনে গেল যে শরতের বাড়িতে একটি ধর্মপ্রাণা স্ত্রীলোক আছে। প্রচলিত অর্থে স্ত্রীলোকটি শরতের স্ত্রী ছিল না। হিন্দু-পদ্ধতিতে বরানুগমন ও অগ্নিসাক্ষী করে সাতপাক ঘুরে শরৎ তাকে বিয়ে করেনি কিন্তু অবশ্যই সে শরতের জীবন-সঙ্গিনী।

টাকা রোজগারের জন্য বাংলাদেশ থেকে কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে একজন রেঙ্গুনে আসে। সে মেদিনীপুর জেলার লোক। সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটির নাম মোক্ষদা। তার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাওয়া যায়, তবে সে সব কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুন্দরী সে ছিল না। দুধের মত ফর্সা রংও তার ছিল না, ছিল না পটলচেরা চোখ কিন্তু তার দেহ-সৌষ্ঠব ছিল অপূর্ব। বৃষ্টিতে ভেজা ফুলের মত লাবণ্যে ভরা বড় স্নেহময়ী মেয়ে ছিল সে। বাপ অধিকারী, বৈষ্ণব। কুলীন ব্রাহ্মণ তারা নয়। অত্যন্ত অভাবের দরুন বরপণ জোগাড়ের সঙ্গতি ছিল না। তাই যাতে দুটো টাকা পয়সা উপার্জন হয় সেই আশায় তারা বর্মায় চলে আসে। এতদূরে বসে অপবাদের কথা কেই বা জানতে পারবে ? অধিকারী মশাই রেঙ্গুনে যার বাড়িতে এসে উঠেছিল সে শরতের বন্ধু ছিল। সেই সুবাদে শরতের সঙ্গেও তার পরিচয় হয়। পরের দুঃখে কাতর হওয়া শরতের স্বভাব। তাই অধিকারী মহাশয়ের মেয়ের বিয়ের জন্য সে-ও উঠে-পড়ে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বর আর খুঁজে

পাওয়া যায় না। একদিন কৃষ্ণদাস শরৎকে বলল, 'মেয়ে বড় হয়েছে, একে নিয়ে একা কোথায় ঘুরে বেড়াব। গরীব ব্রাহ্মণ আমি। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক একে গ্রহণ করেন আমার বড় উপকার হয়।'

শরৎ রাজী হয়নি। মেয়েকে সে জানত। তার যাতে একটা বিয়ে হয় সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেনি, কিন্তু নিজে বিয়ে করার মত মানসিকতা তার ছিল না। হয়তো শান্তির স্মৃতি তখনও তার মনে জীবন্ত ছিল।

হঠাৎই সে সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্বাধীন, দায় দায়িত্বহীন দুর্বল শরীর নিয়ে কদিনই বা সে ভাল থাকত। খাওয়া-দাওয়ার বিলি ব্যবস্থা কোন কালেই ভাল ছিল না। বর্মা ম্যালেরিয়া আর প্লেগের ঘর। জ্বর যখন শরতের খুব বেশী, সে সময় মোক্ষদা বাঙালী মেয়ের আন্তরিক স্নেহ ও মমতা নিয়ে শরতের সেবা যত্ন করে। ক'দিন পর জ্বর যখন একটু কমের দিকে, শরৎ দেখল মোক্ষদা মাথার কাছে বসে তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'এখন শরীর কেমন বোধ হচ্ছে?'

এই স্নেহসিক্ত কথা শুনে তার শান্তির কথা মনে পড়ে। মায়ের মৃত্যুর পর শান্তি তার জীবনে একমাত্র নারী যে তাকে সত্যিকারের স্নেহ ভালবাসা দিয়েছিল। বহুদিন পর দুটো মমতামাখানো কথা, তার মনে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল। কৃতজ্ঞ চোখদুটি মেলে দিয়ে বলল, 'বেশ ভাল বোধ করছি, তুমি আমার অনেক সেবা করেছ, আমার সব কষ্ট যেন তুমিই সহ্য করেছ।'

মোক্ষদার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। শরতের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমার মত অভাগিনীর কপালে অতবড় সৌভাগ্য কি জুটবে?'

ক্ষীণ স্নেহসিক্ত স্বরে শরৎ বলল, 'না, না, তুমি অভাগিনী কেন হতে যাবে। তুমি বাংলার মেয়ে, চির স্নেহময়ী তুমি।' তারপর স্বগোতোক্তির মত বলতে লাগল, 'রূপের আশীর্বাদ তুমি পাওনি, কিন্তু তোমার অন্তরে যে স্নেহের সমুদ্র লুকিয়ে রয়েছে, তুমি যার কাছেই থাকবে সে ধন্য হয়ে যাবে। আমার মা ঠিক এমনি ছিলেন। তিনি অন্তরের রূপে রূপসী ছিলেন। তুমিও ঠিক তেমনই মহৎ।'

মোক্ষদা সব কথা বোধহয় ঠিক শুনতে পায়নি, শুধু শরতের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা শ্যামবর্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে ছিল। মন তার কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

বিলাসীও তো এমনি করে মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করতে পেরেছিল।'[১] মোক্ষদার স্নেহযত্নে শরৎ ক্রমশ ভাল হয়ে উঠল। কৃষ্ণদাস খুব খুশী। তার ধারণা হল এবার হয়তো তার ভাবনা চিন্তা দূর হবে শরৎ তবুও রাজী হল না।

কিছুদিন পর কৃষ্ণদাস বলল, 'যদি মোক্ষদাকে আপনি বিয়ে না-ই করেন তাহলে আমায় কিছু টাকা পয়সা দিন যাতে দেশে ফিরে গিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিতে পারি।' শরতের কাছে অত টাকা পয়সাই বা কোথায়? অধিকারী মশায়কে সে অর্থ সাহায্য দিতে পারেনি। তারপর হঠাৎ একদিন দেখে যে মোক্ষদাকে তার কাছে রেখে কৃষ্ণদাস দেশে ফিরে গেছে। মোক্ষদা বাপের উপর দুঃখে অভিমানে ভেঙে পড়ল। শরৎ নিজেও ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল তবু মোক্ষদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'তোমার দুঃখ করবার কোন দরকার নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য ব্যবস্থা হচ্ছে তুমি এখানেই থাকতে পার।'

মোক্ষদা শরতের কাছে রয়ে গেল। এই নিয়ে আর একবার হৈ চৈ অপবাদের ফুলঝুরি ছড়াল। একদিন শরৎ বলল, 'চল আমি তোমায় কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বলা যতটা সহজ মোক্ষদাকে বিদেয় করা ঠিক ততটাই শক্ত ব্যাপার ছিল। ছোটবেলা থেকে যে লোক পরের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছে, সে কেমন করে একা অসহায় মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে? একদিন বাড়ি ফিরে মোক্ষদাকে বলল, 'জান! তোমার জন্য আজ একটা বর ঠিক করে ফেলেছি।'

মোক্ষদা শরতের দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল, কান্নাভেজা সুরে বলল, 'এভাবে কথা বলতে আপনার ভাল লাগে?'

শরৎ বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করছি না, তোমার এতে খারাপ কিছু মনে করার নেই। বিয়ে তো তোমায় একদিন করতেই হবে। তোমার জন্য যে লোক ঠিক করেছি সে তোমায় ভালবাসে, তোমার প্রতি সে ভারি সদয়।'

মোক্ষদা অবাক হয়ে গেল, কোনরকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আমি এ-সব কিছুই জানি না, সে কোন্ জন? না জেনে আমি কিছুই বলতে পারব না।'

দুষ্টু হাসি হেসে শরৎ বলল, 'তুমি তাকে দেখেছ।'

'সে কি?'

---

১. শরৎ সাহিত্য, পঞ্চম ভাগ। পৃষ্ঠা ১২১ (বিলাসী গল্প)

'হ্যাঁ, অনেকবারই দেখেছ।'

মোক্ষদা হয়ত বুঝতে পেরেছিল। তবুও না-জানার ভাণ করে বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

শরৎ বলল, 'আমায় জান না?' মোক্ষদা চোখ তুলে শরতের দিকে তাকাল। বিস্ময় ও অবিশ্বাসে ভরা সে-দৃষ্টি শরতের অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করল। ভরা বাদলের মত মোক্ষদা শরতের পায়ের কাছে ঝুঁকে পড়ল। মাঝপথেই শরৎ তাকে ধরে ফেলল, বলল, 'এ লোকটিকে তোমার পছন্দ তো?' মোক্ষদা কোন জবাব দেয়নি। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বলার মত তার কিছু ছিল না। শৈবমতে তাদের বিয়ে হয়। হয়তো এ-ঘটনা ঠিক ঠিক এভাবে ঘটেনি, কেমন করে ঘটেছিল সে খবর কেউ জানে না। তবে সে-বিয়ে সমাজ ও আইনের চোখে কোন অংশে কম ছিল না। যতক্ষণ না গান-বাজনা, আলোর ঝলমলানি ও বিধি-বিধানের সঙ্গে বিয়ে হয় সমাজ তা মানতে চায় না। না মানুক, সর্বহারাদের শরৎ সে তো মেনেছিল। মোক্ষদাকে বলেছিল —'আজ থেকে তুমি হিরণ্ময়ী। খাঁটি সোনার মত তুমি আসল; তাতে কোনদিন ময়লা লাগে না। তোমার অন্তরের উজ্জ্বল রূপ আমি দেখেছি, সেটুকুই আমার শক্তি।'

সুরেন্দ্রও মালতীকে ঠিক একথাই বলেছিল, 'তোমাকে বিবাহ করলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হলে; আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে ফাঁসা আজ পরালাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলতে পারবে না।'

আইনত স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর সব দায়িত্ব হিরণ্ময়ী সেদিন গ্রহণ করেছিল। মনের এই মিলনই যথার্থ বিবাহ। বিবাহের মন্ত্র যে ভাষাতেই পড়া হোক না কেন, সংস্কৃত হলেও কি এসে যায় তাতে? এ পৃথিবীতে এমন অনেক স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়েছে যাকে হয়ত পবিত্র বলা যেতে পারে না, কিন্তু সে সব মিলনকেও তো সমাজ মেনে নিয়েছিল, আর বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণে পবিত্র করে তুলেছিল। হিরণ্ময়ী যদি মন্ত্রশুদ্ধা স্ত্রী না-ও হয়, তাতে কী হয়েছে? সমাজ যদি তাকে স্ত্রীর ন্যায্য মর্যাদা না দিয়ে থাকে তাতে তার কি ক্ষতি হয়েছিল? শরতের প্রতি তার মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার শেষ ছিল না। শরৎও যে হিরণ্ময়ীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত।

আর একবার জীবন যেন নতুন করে শরতের কাছে ধরা দিল। মন গড়া প্রেমের গল্প বলে বেড়াবার তার আর প্রয়োজন রইল না। তার উচ্ছৃঙ্খল

শিল্পিমন, তার উদাসী বৈরাগী মনকে প্রায়ই পরাজিত করে ফেলত। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, এই জয়ের আধার ছিল তার অহংকার। তাই না বৈষ্ণবী কমললতা শ্রীকান্তকে বলেছে—'তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগী মন—ওর চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর কিছু আছে নাকি।' (শ্রীকান্ত-চতুর্থ পর্ব) কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণ ভট্টকে শরৎ লিখেছিল[২]—'মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড়-বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ বাধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমান ভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চারতলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

'এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজককন্যা, তখন কান মলিয়া, একহাত নাকখত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিন মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি, চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি, বহুপূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা শুরু করিয়াছিলাম এইবার সেটা শেষ করিব।'

পুরো চিঠিখানি পড়ার পর কি মনে হয় না যে সম্পূর্ণ কাহিনীটিই তার মন গড়া? গুরুগম্ভীর হয়ে পরিহাস করা তার একটি সহজ স্বভাব ছিল। আঠারো মাসের এই প্রণয় কাহিনী যদি বিন্দুমাত্রও সত্য হত তাহলে গিরীন্দ্রনাথ সরকার, যিনি অনেক সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য রুচিকর গল্পের অবতারণা করেছেন, এ ঘটনার উল্লেখ নিশ্চয় করতেন। তাই মনে হয়, কিশোর বয়সের সেই নীরদার মত এ ঘটনাও সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। মহাকবি চণ্ডীদাস রজকিনীর সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করেছিলেন, শরতের মনে চণ্ডীদাসের সেই অনন্যসাধারণ প্রেম মনে হয় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল, নইলে মনগড়া গল্পের পেছনে তেমন জোরালো কারণ আর কি থাকতে পারে? রজকিনী ছাড়াও তার কল্পনালোকে আরো অনেকগুলি প্রেয়সী ছিল। বহুদিন পর সে যখন কলকাতায় আসে,

২. ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ সাল।

অক্ষয়কুমার সরকারের সঙ্গে[৩] নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলেছিল,—
'রেঙ্গুনে একটি বাঙ্গালী মেয়ে কতভাবেই না আমায় প্রেম নিবেদন করেছিল।
তার সঙ্গ-লাভের জন্য আমিও কম ব্যাকুল হইনি। কিন্তু কদিন একসঙ্গে
থাকার পর হঠাৎ সে উধাও হয়ে যায়, তার বিরহে আমার পাগলের মতো
অবস্থা। বাড়িউলী আমার অবস্থা দেখে বলেছিল, কার জন্য এমন পাগলামী
করছ, বন্ধুর জন্য তার টাকার দরকার পড়েছিল তোমায় ঠকিয়ে তার সঙ্গে
চলে গেছে। তোমার প্রতি তার কোন টান ছিল না।'

এই গল্পগুলি সত্যি মিথ্যা যাই হোক, শরতের মানসিকতার পরিচয় এতে
পাওয়া যায়। তার ধারণা ছিল নারীর প্রেম ছাড়া পুরুষ সাহসী হতে পারে না।
প্রেমের পরিভাষা তার মতে দেহের ক্ষুধা নয় বরং উপাস্য দেবতার কাছে আত্ম-
সমর্পণ যথার্থ প্রেম। কৈশোরের সেই ব্যর্থ প্রেমের পর অবশ্যই সে কাউকে না
কাউকে সত্যি ভালবেসেছিল। সে সময় প্রায়ই অনেক মন্দ লোক মেয়েদের
প্ররোচিত করে রেঙ্গুনে নিয়ে পালিয়ে যেত। গায়ত্রী এই রকমই একটি তরুণী।
যেমন তার ছিল দেহসৌষ্ঠব তেমনই ছিল মোহিত করা রূপ। শুধু অকাল-
বৈধব্যের জন্য তুষের আগুনের মত ভিতরে ভিতরে জ্বলছিল। মা-বাপ বোধহয়
ভাল ব্যবহার করত না তার সঙ্গে, তাই মেসোর কাছে লক্ষ্ণৌ যেতে চেয়েছিল।
পাড়ার ছেলে নন্দদুলালের আশ্বাসে সে বেরিয়ে পড়ে কিন্তু ছেলেটি লক্ষ্ণৌ না
গিয়ে তাকে নিয়ে রেঙ্গুনে পালিয়ে আসে। বেচারী গায়ত্রী পথে ঘাটে
কাকেই বা বিশ্বাস করে বলবে একথা। জাহাজে বর্মার একটি ছেলে পাঁচকড়ির
সঙ্গে আলাপ হয়। নন্দদুলাল পাঁচকড়িকে জানায় যে গায়ত্রী তার স্ত্রী।
রেঙ্গুনের বিখ্যাত এডভোকেট শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে তারা
ওঠে। বাড়ির গৃহিণীর স্নেহ ভালবাসার ফলে গায়ত্রী নিজের মনের জোর
ফিরে পেয়েছিল। তাঁকে নিজের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিয়েছিল। মুখুজ্জে
গিন্নি সমস্ত শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তখুনি গিরীন্দ্রনাথ সরকারকে ডেকে
পাঠালেন। গিরীন্দ্রনাথ যার পর নাই নন্দদুলালকে অপমান করলেন, তারপর
শরৎ ও অন্য বন্ধুদের সাহায্যে তাকে ভারতগামী জাহাজে তুলে দেওয়া হয়।
গায়ত্রীর বাবাকে চিঠি লিখে জানানো হয়, কিন্তু ততদিন গায়ত্রী থাকে
কোথায়? মুখুজ্জে গিন্নি গায়ত্রীকে আর থাকতে দিতে রাজী হলেন না।
তখন গিরীন্দ্রনাথ শরতের পাড়াতে একটি ঘর ঠিক করে দেন। পাঁচকড়ি তার

৩. এই ঘটনার উল্লেখ অক্ষয়কুমার সরকারের ডায়েরীতে পাওয়া যায়। ২. ২. ১৯৩০

দেখা-শোনা করত। শরৎ রাতে পাঁচকড়ির বাসায় গিয়ে শুত।

গায়ত্রীর বাবা চিঠির উত্তরে জানালেন, কোন-মতেই কুলটা মেয়েকে ঘরে নিতে রাজী নন। গিরীন হতাশ হয়ে লক্ষ্ণৌ-এ গায়ত্রীর মেসোকে চিঠি লিখে সব কথা জানাল। বার বার আসা-যাওয়ার ফলে শরৎ গায়ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল। বিধবা, সহায় সম্বলহীনার প্রতি শরতের মন সহজাত করুণার ফলে আকৃষ্ট হয়। একদিন সে একথা গায়ত্রীকে জানাল, বলল,—'আজকাল বিধবা বিবাহের রেওয়াজ হয়েছে, তবু যদি সমাজ তা অস্বীকার করে তাহলে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করব।'

গায়ত্রী দুঃখেকাতর হয়ে বলল,—'শরৎ দা, যে ফুল ঝরে গেছে তা দিয়ে দেবতার পুজো হয় না।' শরৎই শুধু গায়ত্রীকে প্রেম নিবেদন করেনি, পাঁচকড়ির ধনী মনিবও তার প্রতি আসক্ত হয়। সেদিন কারবারের বিষয়ে কথা বলার জন্য পাঁচকড়িকে তার বাড়িতে খুঁজতে এসে গায়ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়। এর পর থেকে তাকে নানান প্রলোভন দেখাতে লাগল। কখনও উপহার পাঠিয়ে বা কোনদিন কোন মহিলাকে পাঠিয়ে দিত। তারপর একদিন স্বয়ং গাড়ি নিয়ে গায়ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য হাজির। তার শক্তি ছিল, আর শরতের সাহসের অভাব ছিল না। গায়ত্রীকে রক্ষা করার জন্য তার সামনে রুখে দাঁড়াল, তখন মনে মনে সে নিশ্চয় রাজুকে স্মরণ করেছিল।

মজা দেখবার লোকের অভাব হল না। রক্তপাত হয় আর কি। গিরীন্দ্রনাথ খবর পেয়ে দৌড়ে এল, তাকে দেখে যে যার পালাল। এ-ঘটনার দু-তিন দিন পর লক্ষ্ণৌ থেকে গায়ত্রীর মেসোর চিঠি এল, 'গায়ত্রীকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দাও।'

গায়ত্রী চলে গেল, শরতের প্রণয় আর একবার ব্যর্থ হল।

এ গল্পটিও যদি পুরোপুরি মিথ্যে হয় আশ্চর্যের কিছু নয়। তার সম্বন্ধে নানান ধরনের গুজব শুনতে পাওয়া যেত। তা যদি সত্যিও হয় তাতেও কিছু যায় আসে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই গোপনে প্রকাশ্যে অনেক কিছু ঘটে। কুলীন, কৌলিন্যহীন এমন কত মেয়ের সংস্পর্শেই তো সে এসেছিল। সে তো কোন সন্ন্যাসী ছিল না। অপরের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে অন্যদের থেকে একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। বেশ্যাদের কাছে যেত ঠিকই, কিন্তু তাদের আপদে বিপদে, অসুস্থতায় অক্লেশে প্রাণ দিয়ে সেবা ও সাহায্য করতে পেছপা হত না। একবার রেঙ্গুনে বন্ধুদের সঙ্গে নাম

করা এক বাঈজীর বাড়ি গিয়ে দেখে যে তার বসন্ত হয়েছে। বন্ধু ফিরে গেল, শরৎ থেকে গেল। অনেক সেবা শুশ্রূষা করেও তাকে বাঁচানো গেল না, শেষ পর্যন্ত তার শেষকৃত্য সেরেই বাড়ি ফিরেছিল।

এই জন্যই তো ভদ্রলোকেরা তাকে চরিত্রহীন অস্পৃশ্যের মত দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাদের সান্নিধ্য পাবার লোভ শরতের কোনদিন ছিল না। সংসারী হবার পর আবার তার সৌন্দর্য ভাবনা মূর্ত হল, ভালবাসা তার ঘরে ফুলের মাধুর্যে ভরে গেল। সে বই ভালবাসত, ফুল ভালবাসত, পশুপাখী ভালবাসত, সর্বোপরি হিরণ্ময়ীর আগমনে হিন্দু গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে তুলসীর চারাও দেখা দেয়।

পাখী পোষা শরতের নেশা ছিল। একটা ময়না ছিল, আদর করে তাকে মোনা বলে ডাকত। একদিন পাখীটি দুম করে মরে গেল। নিজের সন্তান মরে গেলে যেমন দুঃখ হয় শরৎ ঠিক ততটাই দুঃখ পেয়েছিল। এরপর একটা সিঙ্গাপুরী নুরী পাখী জোগাড় করে, ভালবেসে তার নাম দেয় 'বাটু বাবা'। তাকে রাতবিরেতে খাওয়াতো। বন্ধুরা বলত—'পাখী কি রাত্তিরে খায়?'

শরৎ বলত, 'পাখীরা বনে জঙ্গলে থাকে, নিজের ইচ্ছেমত খায়, কিন্তু যখন সংসারে আমাদের মধ্যে তারা থাকে তখন আমাদের মতই তাদেরও খাওয়া দাওয়া করাতে হয়। নিজে হাতে করে যদি না খাওয়াই ওরা দুঃখ পায়। যদি ভালবাসাই না দিতে পারব, তাহলে খাঁচায় বন্ধ করে লাভ?'

রাত্রিবেলা বাটুবাবা ভারি চমৎকার গান করত। প্রতিবেশীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করত, 'শরৎবাবু! কাল রাতে আপনার বাড়িতে কেউ গান গাইছিল? 'সখীরে কি আর বলিব আমি' ভারি চমৎকার মিষ্টি গলা তো।'

শরৎ হেসে বলত,—'আরে ওতো বাটুবাবা গাইছিল।'

বাড়িতে কেউ এলে বাটুবাবা তখুনি বলত, 'কে? কে তুমি?'

শরৎ বলত, 'আমি।'

ওমনি বাটুবাবা চিৎকার জুড়ে দিত—'বাটু। টু-টু-টু।'

বাটুবাবার জন্য শরৎ রূপোর একটা দাঁড়, সোনার চেন, পায়ে স্প্রিং দেওয়া রূপোর মল গড়িয়ে ছিল। নিজের বিছানার পাশে তার শোবার ব্যবস্থা ছিল। দামী রেশমের বালিশ, তোষক ও মশারীর ব্যবস্থাও ছিল। রাত্তিরে শরৎ বাটুবাবার শেকল খুলে দিত ওমনি দাঁড় থেকে নেমে টুক করে মশারীর ভেতর ঢুকে পড়ত।

বাটুবাবা সুন্দর ছিল কিন্তু দুর্দান্ত পাজি ছিল। শরৎ যখন আদর করে চুমু খেত, গদ্‌গদ্‌ হয়ে তার গালে নিজের ছোট্ট মাথাখানি রগড়াত, কিন্তু আর কেউ আদর করতে গেলে চিল চেঁচাত, কামড়ে দিত। তাই পারতপক্ষে নতুন লোক শরতের বাড়ি যেতে চাইত না। চিরপ্রহরী কুকুরের মত বাটুবাবা সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখত। একদিন, বাড়িতে যখন কেউ ছিল না, বাড়ির ঝি রান্নাঘর থেকে ঘি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, ভেবেছিল কেউ দেখবার নেই। কিন্তু বাটুবাবা চিৎকার করে পাড়া মাত করে তুলল। প্রতিবেশীরা ভাবল বাটুবাবা যখন তখন চেঁচায় তাই কেউ গা করল না। কিন্তু বাটুবাবা ঠোঁট দিয়ে চেন ছিঁড়ে ফেলে ঝি এর উপর ঝাপটে পড়ল, আর এমন জোরে কামড়ে ধরল যে ঝি বেচারী চিৎকার করে কেঁদে ফেলল, 'ওর বাবারে মেরে ফেলরে রে।'

বাটুবাবা তাকে কিছুতেই পালাতে দেয়নি। সেই সময় শরৎ ফিরে আসাতে ঝি হাতে নাতে ধরা পড়ল।

একদিন সোনার চেন গলায় জড়িয়ে বাটুবাবা মরে গেল। দুঃখে ব্যথায় শরৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বিধিমত নদীতীরে গিয়ে তার দাহসংস্কার করে। কদিন বাড়ির বাইরে বেরোয়নি, নায়নি খায়নি, রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল, বন্ধুরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,—'আপনার কি হয়েছে শরৎবাবু? মনে হচ্ছে বড় শোক পেয়েছেন?'

শরৎ বলেছিল, 'আমার সন্তান মরে গেছে।'

শরৎ একটা খাঁটি দিশি কুকুর পুষেছিল। যেমন কুৎসিত দেখতে তেমনই অসভ্য। একজন ফকির হিরণ্ময়ী দেবীকে বলেছিলেন, 'এই কুকুরটি পুষলে তোমাদের ভাগ্য উজ্জ্বল হবে।'

কুকুরের জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক সত্যি তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই বউ বড় আদর করে কুকুরের নাম রেখেছিল বংশীবদন। ভালবাসা সুন্দর নামের পরোয়া করে না। ছোট্ট অদ্ভুত যা হোক একটা নামও ভালবাসার প্রতীক হতে পারে। তাই শরৎ বংশীবদনের নাম দিল ভেলী। ভেলীর আদরের শেষ ছিল না। এ পৃথিবীতে মানুষ সম্পন্ন ও সুন্দরকেই ভালবাসে কিন্তু শরৎ বোধহয় মনে মনে শপথ নিয়েছিল, সে তাদের ভালবাসবে, যারা অসুন্দর-সর্বহারা-বঞ্চিত…!

৯০

'চরিত্রহীন' লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। 'নারীর ইতিহাস' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল। এই সর্বপ্রথম শরতের মনে হয় বইগুলি ছাপা হলে কেমন হয়? ভাগলপুরের অন্য বন্ধুদের বই তো বেশ ছাপা হচ্ছে, তাদের থেকে সে খারাপ কিছুই লেখে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাকে লেখা যায়? সৌরীন, সুরেন, বিভূতি না প্রমথকে? প্রমথর উপর তার বিশ্বাস ছিল কিন্তু অনেক বছর হয়ে গেছে এখন সে কলকাতায় আছে কি না; আর, থাকলেও বা তার ঠিকান কি···?

কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় তার বাসায় আগুন লেগে যায়। নীচের তলায় একজন ধোপা থাকত। আগুন যখন লাগে, সবাই সে-সময় ঘুমিয়ে ছিল। প্রতিবেশীদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে হতভম্ব, তখন আগুন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। সবারআগে হিরণ্ময়ী দেবী কুকুর ভেলী ও পাখীকে নিরাপদ জায়গায় পেঁাছে দেয়। এরপর অত্যন্ত দুর্লভ এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় বই, কাপড় চোপড় লোহার একটা ট্রাঙ্কে বন্ধ করে দৌড়ে নীচে নামতে গেল কিন্তু ততক্ষণে কাঠের বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, ট্রাঙ্কটি ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে এল। তারপর সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে এই দারুণ অগ্নিকাণ্ড দেখতে লাগল। সামনের ময়দানে তার কয়েকজন বন্ধু হাওয়া খাচ্ছিল, তারা ছুটে এসে দেখে শরৎ একদৃষ্টিতে নিজের জ্বলন্ত বাড়িখানির দিকে চেয়ে রয়েছে। সহানুভূতির সঙ্গে এক বন্ধু বলেছিল—'সব জিনিসপত্র তো বাড়ির ভেতরেই রয়ে গেল, লাইব্রেরী, অয়েলপেন্টিং পাণ্ডুলিপি, সবই তো নষ্ট হয়ে গেল।'

শরৎ বিরস গলায় বলল, 'তা তো হল, কি আর করা যাবে।'

এক বিদেশী বন্ধুর কাছ থেকে সে স[illegible]

কিনেছিল। খুব যত্ন করে নিজের বই, অয়েলপেন্টিং দিয়ে সাজিয়েছিল। অভাগিনী 'নারীর ইতিহাস', 'চরিত্রহীন' না জানি কত বছর ধরে লিখেছিল, আজ সব কিছুই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

হঠাৎ ধোপার আর্তস্বর শুনতে পেল। নিজের প্রাণের ভয়ে ছাগলের দড়ি খুলতে ভুলে গিয়েছিল। শরৎ সবার বারণ সত্ত্বেও আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে থেকে ছাগল ছানাটিকে বুকে করে বিদ্যুৎগতিতে বাইরে বেরিয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত বাড়িখানা ঝুপ করে ভেঙে পড়ল।

এই অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে শরৎ নিজে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে দুটো চিঠি লেখে। এ চিঠির আগে শরৎ তাকে কোন চিঠি দিয়েছিল কি-না সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। অগ্নিকাণ্ডের প্রায় মাস খানেক পর সে লিখেছিল[১], 'প্রমথকে জানাচ্ছি যে আমি দেশে মাঝে মাঝে আসি এবং ভবিষ্যতে আশা করি আসব। গতবারে যখন এসেছিলাম দু-বার প্রমথর ঠিকানা জোগাড়ের চেষ্টা করেও পাইনি, তাই দেখাও হয়নি।

আমার শরীর ভাল নয়। বছর দুই আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আজও সুস্থ হতে পারিনি, তবে কষ্ট একটু কম। ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে আমার বাড়ি ঘর সব পুড়ে গেছে। বাড়ি পুড়ে যাবার ফলে একটা ব্যাপারে বড় মুস্কিলে পড়েছি। হাজার-দু-হাজার টাকার জিনিস তো নষ্ট হয়েছে কিন্তু একটি বহুমূল্য লাইব্রেরী ও বইয়ের পাণ্ডুলিপিও সেই সঙ্গে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মনে মনে ঠিক করেছিলাম এ মাসের শেষে সেটি প্রেসে পাঠাতে পারব। কার উপরে এ ভার দেওয়া যায় ভাবতে গিয়ে প্রমথর কথাই বারবার মনে হয়েছে, কিন্তু এ কথা মনে হয়নি যে সে এখন কলকাতায় আছে কি না? আশাকরি খবরা-খবর ভাল। মে মাসে আবার কলকাতা যাচ্ছি।'

বারোদিন পর দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিল—

প্রমথ,

তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি, এমন তো হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশী জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি।

---

১. ১১ই মার্চ, ১৯১২ সাল।

কেন না, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি তো করিবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম! তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন। লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা না স্মরণ করাইয়া দিতে। আমি মরিয়া গিয়াছি—এই কথাটা যদি কোন দিন কাহারো দেখা পাও বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরুভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্মান্তিক করিবে না, এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

১. সহরের বাহিরে একখানা ছোট বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

২. চাকুরি করি। ৯০ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা অ্যালাউন্স পাই। একটা ছোট চায়ের দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনমতে কুলাইয়া যায়, এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

৩. 'হার্ট ডিজিজ' আছে। যে কোন মুহূর্তেই—

৪. পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর 'ফিজিওলজি', 'বাইওলজি', এণ্ড 'সাইকোলজি' এবং কতক 'হিস্ট্রি' পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

৫. আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই।

লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের 'ম্যানুস্ক্রিপ্ট' 'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তাও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসর 'পাব্‌লিশ' করিব। আমার দ্বারা কিছু হয়, এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার শুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।

তোমার ক্লাবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইয়ো। নিজেও কিছু করা ভাল—হুজুগের মধ্যে এ কথাটাও ভোলা উচিত নয়। তোমার যেরকম স্বভাব তাহাতে তুমি যে এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য সভার' একটি মাত্র সভ্য নিরুপমা দেবীই সাহিত্যের চর্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না? আমার আগেকার কোন লেখা আমার কাছে নাই—কোথায় আছে, আছে কি না-আছে কিছুই জানি না—জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন 'হার্ট ডিজিজ'-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া 'অয়েল পেন্টিং' শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি 'অয়েল পেন্টিং' সংগ্রহ হইয়াছিল তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও তো তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। নভেল, হিষ্ট্রি, পেন্টিং কোনটা? কোনটা আবার শুরু করি বল ত।

তোমার স্নেহের

শরৎ

এর আগেও হয়ত চিঠি সে লিখেছিল কিন্তু মাত্র দুটি চিঠি[২] ছাড়া তার লেখাজোখা কারও কাছে পাওয়া যায় না। এই দুটি চিঠি থেকে তার জীবনে নতুন যুগের সূত্রপাতের আভাস পাওয়া যায়। গত ন' বছরে তার চারপাশে যে রকম রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার মেঘ যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। পাঁচ বছর আগে যখন 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তার ভূয়সী

২. ডিসেম্বর ১৯০২ এর চিঠি গিরীন্দ্রনাথের নামে।
ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ এর চিঠি বিভূতিভূষণ ভট্টের নামে।

প্রশংসা করেন, মনে হয় শরতের হীনমন্যতা কেটে গিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছিল। প্রথম চিঠিখানিতে সে চায়ের দোকানের কথা উল্লেখ করেছিল কথাটা সত্যি। একদিন অফিসে বন্ধুদেরও বলেছিল 'আমি একটা চায়ের দোকান খুলেছি।' বন্ধুরা অবাক হয়, কল্পনার রাজ্যে বাস করে এই বখাটে বাউণ্ডুলে লোক আবার দোকান খুলবে কি? অবিশ্বাসের সুরে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিল—'সত্যি নাকি?'

'দেখতে চাও তো চল।'

অফিসের পর খুব আগ্রহ সহকারে সে দু-চারজন বন্ধুকে নিজের দোকানে নিয়ে যায়। বাড়ির কাছেই একটা কাঠের বাড়িতে সত্যি সত্যিই একটা চায়ের দোকান। এক বন্ধু বলল,—'শরৎ বাবু, এবার আপনি চাকরি ছেড়ে দিন, চায়ের দোকানে নিজে না বসলে দু'দিনে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

শরৎ বলে, 'না রে, বসার দরকার নেই। জান আমি কি বন্দোবস্ত করেছি? একটিন দুধে কতটা চিনি মেশাতে হবে আর তাতে ক'পেয়ালা চা তৈরী হতে পারে সব আমি ঠিক ঠাক করে দিয়েছি। সকালে এক টিন দুধ কিনে দিয়ে যাব। দিন গেলে যতটা দুধ খরচ হবে সেই অনুপাতে পয়সা হিসেব করে নেব।'

এ অঙ্ক বলা যতটা সহজ কাজের বেলায় ততটাই গোলমেলে মনে হল, শরৎ অচিরেই দোকান পাট তুলে দিল।

১০.

বাড়িতে আগুন লাগার পর শরৎ স্ত্রী ও প্রিয় কুকুরকে নিয়ে কলকাতায় আসে।[১] কলকাতার রাস্তায় প্রকাশ্যে কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরুত। ছোট্ট একটুখানি দাড়ি, মাথায় অবিন্যস্ত চুল, মোটা ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে চাইনিজ কোট, যে-কেউ দেখে বলে দিতে পারত এ-লোক কখনই শহুরে নয়।

এবার সে নিজেই খোঁজ নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করল। সে সময় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'ভারতীর' সম্পাদনা করছেন। শরৎ তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কলকাতা ছাড়ার পর এই বোধহয় প্রথম দেখা। দুজনের অনেক কথা হল। শরৎ বলল, 'চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলাম তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম কিন্তু দেখা হয়নি।'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না তুমি লেখা কেন ছেড়ে দিলে। তুমি জান না যে তুমি লিখলে বাংলা সাহিত্যের কতখানি শ্রীবৃদ্ধি হবে। তোমার ভাগ্যে মহান হওয়া লেখা আছে। 'ভারতী'তে যখন 'বড়দিদি' ছাপা হয় তখন তো কী হৈ চৈ, যে এ নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের লেখা।'

সৌরীন্দ্রমোহন বিস্তারিত ভাবে সে সব গল্প শোনাল। 'বড়দিদি' পড়ে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন তা-ও বলল। শরৎ যে এ সব কথা জানত না তা নয় কিন্তু বিশ্বস্ত এক বন্ধুর মুখ থেকে শোনা সে আর এক কথা। সব শুনে শরৎ বলল, 'সেখানে গিয়ে পড়েছি আর রোজগারের ধান্ধায় এমন জড়িয়ে পড়েছি যে মন একেবারে ভেঙে গেছে।'

সৌরীন্দ্রমোহন শরৎকে নিজের বাড়ি ডেকে নিয়ে গেল। মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, একজন যুবা সাহিত্যিক ফণীন্দ্রনাথ পাল ও আরো অনেকে সেখানে

১. অক্টোবর, ১৯১২ সাল।

এসে জুটলেন। কালীপুজোর দিন, দুপুর দুটো বেজে গেছে। বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাজি-ফুলঝুরি পুড়িয়ে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। শরৎ সৌরীন্দ্রমোহনকে বলে উঠল, 'একবার 'বড়দিদি' পড়ে শোনাও তো, ঠিক মনে নেই কি গল্প লিখেছিলাম?' বৈঠকখানায় পাতা তক্তপোষের[২] উপর শুয়ে পড়ে বলল, 'তুমি পড়, আমি শুনি!'

সৌরীন্দ্রমোহন গল্প পড়ে শোনাতে লাগল, শুনতে শুনতে শরৎ অভিভূত হয়ে পড়ল, চোখে জল, মাঝে মাঝে বলে উঠছিল, 'থাম থাম তো, একি আমার লেখা? খুব খারাপ তো লিখিনি। শুনে মনটা কেমন হয়ে যায়। এ গল্প আমি নিজের হাতে লিখেছি, ভারি আশ্চর্য লাগে।'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'তাই তো বলছি! যারা এমন লিখতে পারে তারা যদি লেখা ছেড়ে দিয়ে কোলে হাত দিয়ে বসে থাকে, সে অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। তুমি যদি না লেখ তা হলে আমি মনে করব যে তুমি আত্মহত্যা করেছ। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, যদি তুমি না লেখ তাহলে নিষ্ঠুরতা হবে।'

গল্পের যে জায়গায় রোগশয্যায় শায়িত সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রী শান্তিকে দেয়ালে টাঙানো নিজের ছবি দেখিয়ে বলছে,—'এই ছবিটি যদি চারি জন ব্রাহ্মণ দিয়ে নদীর তীরে পোড়াতে পার...।' শরৎ তন্ময় হয়ে শুনছিল হঠাৎ পাগলের মত উঠে বসে সৌরীন্দ্রর হাতে ধরে বলল, 'থাম।'

তার গলা বুজে এসেছিল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল,—'এবার পড়ো।'

সৌরীন্দ্রমোহন পড়ে চলল, চোখ বন্ধ করে শরৎ পুরো গল্পটা শোনার পর বলল, 'ভালই তো লিখেছি। সত্যি এবার থেকে আমি আবার লিখব। তোমাদের বিশ্বাস যে আমি ভাল গল্প লিখতে পারি?'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল,—'ফণীন্দ্র পাল এ বছর বি. এ. পাস করেছে। সরকারী চাকরি করতে চায় না। 'যমুনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করতে চায়, তারই পেছনে জীবন কাটাবে ভেবেছে। ওর কাগজে কিন্তু তোমায় লিখতেই হবে।'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ লিখব! কিন্তু তোমরাও যদি সেই সঙ্গে লেখ। তোমরা মানে নিরুপমা, সুরেশ, গিরীন, বিভূতি, তুমি, তোমার ছোটবোন, উপেন,

---

২. এই তক্তপোষের উপর বসে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে লেখক এ সব কথা শুনেছিলেন।

তাহলে আমিও নিশ্চিত লিখব। আমি একটা অদ্ভুত রচনা লিখেছিলাম 'নারীর ইতিহাস' বলে। ফুলস্কেপ কাগজের পাঁচশো পাতা লেখা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়াতে সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কোন গল্প ছিল না, কিন্তু উপন্যাসের মত রুচিকর মন-লাগা বিষয় ছিল। অনেক ইতিহাস, পুরাতত্ত্বের বই ও অনেক জীবনী অনুশীলন করে লিখেছিলাম। ওটা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে সত্যি মনে ভারি কষ্ট পেয়েছি।'

সৌরীন্দ্রমোহন বলল, 'কিছুই কি মনে নেই ?'

'কিছু কিছু মনে আছে।'

সৌরীন্দ্র উৎসাহ দিয়ে বলল, 'যতটা মনে আছে সেটুকুর উপর ভরসা করে আবার লেখা শুরু করে দাও।'

শরৎ বলল, 'লিখব ! আর একটা প্রকাণ্ড উপন্যাস লিখেছি. এক চতুর্থাংশ লেখা আছে তোমাকে পড়বার জন্য দেব। গল্পের নাম রেখেছি 'চরিত্রহীন'। যদি শেষ করতে পারি তো নতুন জিনিস হবে। দু-তিন মাস পরে আবার কলকাতায় আসব তখন নিয়ে আসব। 'নারীর ইতিহাস' যদি লিখে উঠতে পারি সেটিও সঙ্গে আনব। এবার এসে কলকাতায় কিছুদিন থাকব ভাবছি।'

'চরিত্রহীনের' কয়েকটা পাতা শরৎ সঙ্গে করে এনেছিল। সে সময় 'সাহিত্য' পত্রিকার খুব জয় জয়কার, সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়। উপেন মামার সঙ্গে 'চরিত্রহীনে'র কয়েকটা পাতা নিয়ে সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে শরৎ দেখা করে। ফণীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা হয় কিন্তু উপন্যাসটির সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরী না থাকায় শেষ পর্যন্ত কোনরকম কিছু ধার্য হয়নি। আবার লেখার আশ্বাস দিয়ে শরৎ রেঙ্গুনে ফিরে যায়। যাবার আগে বহরমপুরে গিয়ে বিভূতিভূষণ ভট্ট ও নিরুপমা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে ভোলেনি।

আবার অফিস থেকে ছুটি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সে কলকাতায় আসে। যদিও বন্ধুদের সঙ্গে তার সদ্ভাব হয়ে গিয়েছিল তবুও এবার সে কারুর কাছেই ওঠেনি। যেখানে ওঠে সেখানে ভদ্রলোকেরা থাকার কথা ভাবতে পারে না। গতবারে সে হাওড়ার একটি বেশ্যালয়ে গিয়ে উঠেছিল। জানতে পেরে খুঁজতে খুঁজতে উপেন মামা সেখানে গিয়ে দেখে পাশের বাড়ির একটি মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে। তাকেই উপেন মামা জিজ্ঞেস করে, 'এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কি কেউ এসে উঠেছেন ? রেঙ্গুন থেকে এসেছেন।'

মেয়েটি বলে, 'দাদা ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেস করছেন? তিনি তো উপরে, এই যে সিঁড়ি দেখছেন, আপনি সোজা উপরে চলে যান, সামনেই দেখতে পাবেন।'

উপরে গিয়ে উপেন মামা দেখল যে শরৎ 'চরিত্রহীন' লেখায় ব্যস্ত।

অনেক দিন পরে[৩] ফণীন্দ্রনাথ পাল লিখেছিলেন, 'সেদিনের কথা মনে পড়ছে, যেদিন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় খবর দিলেন যে, শরৎ কলকাতায় এসেছে। গতকাল সে আমার বাড়িতে এসেছিল। কিন্তু কোথায় উঠেছে জানিয়ে যায়নি। কি করে কোথায় তাকে খোঁজা যায়, সে নিয়ে অনেক গবেষণা হল। সে যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাকে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম।'

এবার শরৎ চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে এনেছিল। বাদামী রংয়ের ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের প্রায়-সত্তর আশী পৃষ্ঠা হবে। সৌরীন্দ্র-মোহনকে বলল, 'পড়ে দেখ, চলবে কি না। প্রকাণ্ড উপন্যাস—তোমাদের রায় জানতে পারলে শেষ করব। এখন পর্যন্ত গল্পে নায়িকার পদার্পণ হয়নি, গল্পের নায়িকা 'কিরণময়ী' একটি নতুন জিনিস।'

'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্র পালকেও পড়ে শোনায় উপন্যাসটি। পাল মশায় তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে বারবার অনুরোধ করেন উপন্যাসটি যাতে শরৎ শেষ করে। বললেন, 'যমুনায় এটি আমি ছাপতে চাই।'

'ভারতী' ও 'সাহিত্য' সম্পাদক দুজনের সঙ্গেও এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয় কিন্তু কোন কারণবশতঃ সাহিত্যের সম্পাদক রাজী হতে পারেননি। 'ভারতী'র দাবি সর্বাগ্রে, কারণ লোক-সমক্ষে সে-ই সর্বপ্রথম 'বড়দিদি' প্রকাশ করেছিল। সৌরীন্দ্রমোহন 'চরিত্রহীন'-এর প্রথম অংশটুকু পড়ে স্বর্ণকুমারীকে দেয়। তিনি পড়ে তো একেবারে বিভোর, বললেন—'চমৎকার রচনা, কিন্তু সম্পূর্ণ না পড়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না। বই লেখা শেষ হলে আমায় জানিও, আমি একশো টাকা পর্যন্ত দিতে পারি।'

এ প্রস্তাবে শরতের মন ওঠেনি, বলেছিল, 'তাড়াতাড়িতে এ জিনিস লেখা হয়ে উঠবে না। আমি অনেক ভেবে চিন্তে লিখি। কিরণময়ীর কথা যখন লেখা হবে তখন কি সেটি কোন মহিলা দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকায় ছাপার যোগ্য হবে? আমার মনে হয় না।'

৩. ১৯২৮ সাল।

বাকি থাকল 'যমুনা'। ঠিক হল যে ধারাবাহিকভাবে এটি ছাপা হবে। ফণীন্দ্রনাথ পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়াতে রাজী হলেন। কিন্তু তখনও লেখাই তো শেষ হয়নি। তাই প্রথমে 'যমুনা'য় শরতের একটা পুরনো গল্প 'বোঝা' ছাপা হয়। 'বড়দিদি'র পর তার নামে কোন পত্রিকায় ছাপা এটি প্রথম রচনা। এ ব্যাপারেও শরৎকে কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন মনে করেনি। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্পটি নিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন 'বোঝা' গল্পটি 'যমুনা' পত্রিকায় দিয়ে দেয়। শরৎ জানতে পেরে খুব দুঃখ পেয়েছিল। তখুনি বন্ধুদের লিখে জানায় 'এবার থেকে আমার অনুমতি ছাড়া আমার কোন পুরনো লেখা যেন ছাপা না হয়।'

নিজের পুরনো লেখাগুলো শরৎ তেমন উঁচুদরের বলে মনে করত না। কিন্তু বন্ধুরা সেগুলো ছাপাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভারি আশ্চর্য লাগে, পাঁচ বছর আগে যখন 'বড়দিদি' বের হয় তখন এরা কেন চুপ করে ছিল, কেন তারা শরতের খোঁজ করেনি বা তাকে দিয়ে লেখাবার চেষ্টা করেনি। এও কি অবাক হবার কথা নয় যে 'বড়দিদি'র অভূতপূর্ব সাফল্য ও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা শুনেও নতুন কিছু লেখবার বা ছাপাবার প্রবৃত্তি কি শরতের হয়নি ?

নিশ্চয় তা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। শরতের কাছেও তেমন একটা কোন উঁচু লক্ষ্য অবশ্যই ছিল। 'চরিত্রহীন' লেখার পেছনে যে সাধনার ইতিহাস দেখা যায় তা তার সেই কামনার সাক্ষী বৈ আর কিছু নয়।

এবারে কলকাতায় বসে অজ্ঞাতবাসের আর প্রয়োজন রইল না, অপরিচয়ের অন্ধকার পেরিয়ে সে আলোকিত পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। খ্যাতিমান লেখকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাই মনে মনে চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিল। বলেছিল, 'লিখলে যদি মাসিক একশ টাকা মত আয় হয় তাহলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি কলকাতায় এসে বাস করব।'

'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী আর 'যমুনার' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল এ ব্যাপারে রাজী হলেন। এমনকি পালমশায় শরতের একেবারে ভক্ত হয়ে গেলেন। ফণীন্দ্রের মা শরৎকে স্নেহ করতেন, সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন, নিজের মা-র মৃত্যুর প্রায় ১৫—১৬ বছর পর শরৎ আবার স্নেহের পরশ পেল। ফণীন্দ্রকে বলল, 'তোমার মায়ের স্নেহে যেন আমি নিজের মায়ের ভালবাসা আবার ফিরে পেলাম।'

রেঙ্গুন ফিরে যাবার পর তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ফণীন্দ্রর মা তার কুশল সংবাদের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। শরৎ ফণিকে লেখে,—'আমার সম্বাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে, কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।...'

এর কিছুদিন পর রেঙ্গুন থেকেই বন্ধু প্রমথনাথকে লেখে,—'প্রমথ, একটা অহংকার করব, মাপ করবে? যদি কর ত' বলি। আমার চেয়ে ভাল নভেল কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য বলে মনে হবে—সেইদিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কর। তার পূর্বে নয়—এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে কারও কাছে অসত্য খাতির চাই না—আমি সত্য চাই।' উপেন্দ্রমামাকে সে আরো স্পষ্ট ভাবে লেখে, 'আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোর না গর্ব করচি —কিন্তু আমার আত্মনির্ভরই বল, আর 'প্রাউড'ই বল, এই আমার নিজের ধারণা।'[৪]

শরতের এ ধারণা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বদলায়নি। বহু বছর পর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমার বয়স হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়স হল, এখন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়। এর পরে বাংলার উপন্যাস সাহিত্যের স্থানটা হয়'ত একটু নেমে পড়বে।'

সেই সময় বাংলা-সাহিত্য জগতে এক আলোড়নকারী ঘটনার সূত্রপাত হয়। খবরে প্রকাশিত হয় যে খুব শীঘ্র 'ভারতবর্ষ' নামে একটি পত্রিকা বের হবে। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তার সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য রাখা হয়েছে ৬্ টাকা। সে সময়কার কোন পত্রিকার দামই তিন টাকা ছ আনার বেশী ছিল না। নিজের মূল্যের জন্য 'ভারতবর্ষ' লোকেদের মনে দারুণ বিস্ময় ও কৌতূহল জাগাল।

কয়েক বছর আগে কলকাতায় 'ইভনিং ক্লাব' নামে একটি সান্ধ্য সমিতির স্থাপনা হয়। সভাপতি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং সম্পাদক ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এর

৪. ২২শে আগষ্ট ১৯১৩ সাল।

মালিক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ক্লাবের প্রধান সভ্য ও পৃষ্ঠপোষক। অন্যান্য সদস্যরাও যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রমথই প্রস্তাব দেয় যে সমিতির তরফ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হোক।

অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বললেন,'কিন্তু তাতে তো ক্লাবের বেশ ক্ষতি হবে। সদস্য সংখ্যা যখন একশো পর্যন্ত বাঁধা তখন কোন পত্রিকা প্রকাশ করা মূর্খতা।'

অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর কথা সমর্থন করল। কিন্তু প্রমথ ছিল দারুণ জেদী মানুষ, ক্লাবের তরফ থেকে না হলেও পত্রিকা বের করা হবেই। রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় 'ভারতবর্ষ' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বন্ধু ও সহপাঠী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজী করায় আর ভরসা দেয় যে যদি শরৎকে লিখতে বাধ্য করা হয় তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। অন্য কোন পত্রিকা এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। শরতের লেখনীর উপর বন্ধুদের এই অগাধ প্রীতি ও বিশ্বাস তাকে নিশ্চয় লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। প্রমথ শরতের বিশিষ্ট বন্ধু, তাদের দল পয়সার দিক দিয়েও বেশ ভারি ছিল। ফণীন্দ্র পাল এসব দেখে তো বেশ চিন্তায় পড়ল; শরৎ যদি 'ভারতবর্ষে' লেখে তাহলে 'যমুনার' কি হবে? পারিশ্রমিক না নিয়ে 'যমুনা'য় কি শরৎ লিখবে?

শরৎ যখন ফণীন্দ্রের দুর্ভাবনার কথা জানতে পারল তখন তাকে ডেকে কথা দেয় 'যমুনা'য় সে অবশ্যই লেখা দেবে। টাকার গোলাম সে নয়, আর 'ভারতবর্ষ' তো এখনও বেরই হয়নি।

১১.

রেঙ্গুন ফিরে গিয়ে শরৎ একটা গল্প লেখা আরম্ভ করে। একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার ছাড়া এ রহস্য আর কেউ জানত না। যতটুকু সে লিখত প্রতিদিন অফিসে গিয়ে তাকে শোনাত। যোগেন্দ্রনাথ গল্প শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে শরতের স্বভাব জানা সত্ত্বেও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে এ রহস্য উন্মোচন না করে পারেননি কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। কেমন করেই বা করত তাদেরই এক কেরানী বন্ধু যে ভাল গল্প লিখিয়ে, বিশ্বাস করা শক্ত ব্যাপার বই কি? শুধু পোষ্ট অফিসের বিভূতিবাবু সে কথা বিশ্বাস করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ যোগেনদা, শরৎদার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু আছে এ সন্দেহ আমার মনে বহুদিন হয়েছে বিশেষ করে তার ছবি আঁকা দেখে। এখন ভাবছি তুমি যা বলেছ মিথ্যে হতে পারে না।'

দশদিন কাবার হবার পরও গল্প আর শেষ হল না, অসম্পূর্ণই থেকে গেল। একটি সংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট মনে করে সেই অসম্পূর্ণ লেখাটিই শরৎ ফণীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেয়, নাম দিয়েছিল 'রামের সুমতি'। সব সময়েই শরৎ কিছু না কিছু লিখত কিন্তু 'রামের সুমতি' তার নতুন জীবনের প্রথম লেখা। 'যমুনা'র সম্পাদক 'রামের সুমতি' পড়ে বিস্ময়ে বিভোর হয়ে গেলেন। সারা বাংলাদেশে হৈ চৈ পড়ে গেল। কলকাতায় একদিন জাহ্নবী কার্যালয়ে অনেক সাহিত্যিক একত্রিত হয়েছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এসে বললেন, 'যমুনা'য় 'রামের সুমতি'[১] নামে একটা অদ্ভুত গল্প বেরিয়েছে এমন গল্প আমি এর আগে কখনও পড়িনি।'

একথা শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কার লেখা গল্প?'

১. ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)।

প্রভাতকুমার বললেন, 'কেউ একজন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

হেমেন্দ্র হঠাৎ কথাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না, তখুনি গল্পটি পড়তে বসে গেলেন।

তিনি লিখেছেন, 'পড়তে পড়তে অভাবিত বিস্ময়ে মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বাংলা ভাষায় সত্য সত্যই সে শ্রেণীর গল্প আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। একেবারে প্রথম শ্রেণীর অসাধারণ লেখনীর দান। মনে মনে মানলুম প্রভাত একটি অদ্ভুত আবিষ্কার করেছেন বটে।'

কিন্তু কে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?

এটি কি কোন বিখ্যাত লেখকের ছদ্মনাম? নূতন কোন লেখকেরই হাত একেবারে এত বেশী পাকা হতেই পারে না। অমন যে প্রতিভার অবতার রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও প্রথম-দিককার রচনায় বয়সোচিত দুর্বলতার অভাব নেই। হাঁসের বাচ্চারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার কেটে জলে ভাসতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্যিকরা লেখনী ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই পাকা লেখা লিখতে পারেন না। কত শত চেষ্টা ও পরিশ্রমের এবং দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার পর একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

হেমেন্দ্র রায় চুপ করে রইলেন না। লেখকের খোঁজে উঠে-পড়ে লাগলেন। দুদিনের মধ্যেই জানতে পারলেন, শরৎচন্দ্র নতুন লেখক বটে তবে ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য সাধনায় রত। দু'বছর আগে তার লেখা 'বড়দিদি' নামক গল্প 'ভারতী'তে বের হয়েছিল, তখনও সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও 'রামের সুমতি' পড়ে আত্মবিভোর হয়ে ইভনিং ক্লাবে গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন। প্রমথনাথকে বলেছিলেন, 'এঁর লেখা তুমি 'ভারতবর্ষের' জন্য পাবার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগ ইনি সৃষ্টি করবেন।'

সত্যি সত্যিই শরৎচন্দ্রের গল্প সে সময়কার বিখ্যাত গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। দুর্দান্ত রামকে ঘরের ভেতর বন্ধ করে নারায়ণী যখন একের পর এক বেত মারছে আর রাম কাঁদতে কাঁদতে পালাচ্ছে, এ দৃশ্য পড়ার পর রায়মশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ভায়া প্রমথ, এ লোকের সঙ্গে বড় দেখা করতে ইচ্ছে করছে।'

তিনি নাট্যকার ছিলেন, তাই গল্পের নাটকীয় রসে এমন অভিভূত হলেন যে মেয়ে মায়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রামের সুমতি কেমন লাগল?'

মায়া বেচারী তো মেয়েই—বলল, 'খুব ভাল লেগেছে বাবা।' রায় মহাশয় হেসে বললেন, 'খুব ভাল বলছিস কেন রে? বল না ভারি চমৎকার হয়েছে।'

রায় মহাশয়ের ছেলে দিলীপকুমার রায়ও এ গল্প পড়ে দারুণ প্রভাবিত হয়, কয়েকদিন আগে সে প্রমথনাথের সঙ্গে শরৎ ও প্রভাতকে নিয়ে তর্ক করেছিল। দিলীপ প্রভাতের অনুরাগী আর প্রমথ শরতের। কিন্তু সেই দিলীপ যখন 'রামের সুমতি' পড়ে তখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ভুলে গেল। পড়তে পড়তে চোখের জলে লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে যেত, মনে হত এমন গল্প তো আগে কখনও পড়িনি। এ গল্পে না আছে তরুণ তরুণীর আবেগ উচ্ছ্বাস, আর না আছে পুলিসের দোর্দণ্ড কায়দা কানুনের রকমারী গল্প।

এতে আছে মাতৃরূপা বৌদির স্নেহ আর দুর্দান্ত এক বালকের কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। প্রমথ দিলীপকে জিজ্ঞেস করে, 'কি? কেমন লাগল শরতের 'রামের সুমতি'? প্রভাতবাবুর থেকে কোন অংশে কম?'

দিলীপকুমার বলে, 'তিনি বর্মায় কেন থাকেন?'

প্রমথ বলে, 'সে একটা পাগল, নইলে এমন দুর্গতি তার হয়। বর্মা তো ছাগল ভেড়ার বাড়া, দুঃখের কথা আর কি বলব সে কেন রেঙ্গুনে থাকে।'

দিলীপ বলল, 'কী বলছেন আপনি? রেঙ্গুন তো শুনেছি প্রকাণ্ড শহর, কলকাতার চেয়েও বড়।'

'বড় হলে কি বাড়া হয় না, সুন্দরবনও তো কলকাতার চেয়ে বড় কিন্তু তা বলে কি সেটা ইডেন গার্ডেন হতে পারে?'

'তা না হয় পারে না। কিন্তু রেঙ্গুনের উপর আপনার এত রাগ কেন?'

'—ঠিক রাগ নয়। কিন্তু রেঙ্গুন শহরের নাম শুনলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাই। সেখানের লোকেরা নাপ্পি খায়[২] তার দুর্গন্ধে ভূত পালায়। কিন্তু সে তো ওই কিস্কিন্ধ্যাতে থেকেই পড়াশোনা করে, আমি তাকে লিখি যে 'ওরে ন্যাড়া[৩] শুধু বই পড়ে হবেটা কি? তুই কলম ধর। কিন্তু কে শোনে কার কথা! আজকাল আবার আর একটা ভূত চেপেছে—সে নাকি আজকাল ছবি আঁকে।'

'ছবি আঁকেন? কি বলছেন আপনি?'

'আমি আর কি বলব। মতিভ্রম হয়েছে, কতবার লিখলাম কলকাতায় চলে আয় কিন্তু কে শোনে কার কথা, সে জবাবই দেয় না।'

২. এক রকমের পচা মাছ।

৩. শরতের ডাক-নাম।

সেদিন সারা বাংলাদেশ একটা কথা জানতে পেরেছিল যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পীর জন্ম হয়েছে ও অতীতের দীপ নির্বাপিত হয়েছে।[৪]

যমুনার গ্রাহক সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে যায়। বহু পত্রিকা শরৎবাবুকে লেখার জন্য আহ্বান জানায়। 'চরিত্রহীন' ছাপতে যিনি অস্বীকার করেছিলেন, সেই সমাজপতি মহাশয় চিঠি লিখলেন। সে সময়কার সাহিত্যিক মহলে সমাজপতি মহাশয়ের দুন্দুভি বাজত, যে লেখকের উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পড়ত তিনিই কৃতার্থ হয়ে যেতেন। সেই লোক যখন অত্যন্ত বিনীতভাবে শরৎচন্দ্রকে গল্পলেখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন, বন্ধুরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। কিন্তু শরৎ সেই রকমই নীরব হয়ে রইল, অন্তত প্রকাশ্যে কোনরকম উত্তেজনা সে ব্যক্ত করেনি। এক বন্ধুকে জানিয়েছিল, 'আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্প টল্প বড় লিখতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে পড়ে গল্প লেখা। যা হোক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়। অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতিদিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০/১২ ঘণ্টা পড়ি।'

কিন্তু এ অহংকার থাকা সত্ত্বেও সে লেখা থেকে নিবৃত্ত হতে পারেনি। অন্তরের সুপ্ত ইচ্ছা আবার জাগ্রত হয়ে উঠল। 'যমুনা'র প্রতি তার একটা বিশেষ টান ছিল, ফণীন্দ্রনাথকে লেখে, 'যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে তবে, আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতিমাসেই ছোট করে গল্প (১০।১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।'

এরপর লেখে 'তিনটে নামে লেখা পাঠাব।'

১. সমালোচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

২. ছোট গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩. বড় গল্প—অনুপমা।

এ প্রস্তাব শরৎ এই ভেবেই করেছিল যে, যদি সব লেখা একই নামে ছাপে

৪. ওডেন ল্যাটিমোর লিখেছেন, 'দশম শতাব্দীতে ইসলাম জন্মগ্রহণ করে. আর অতীতের দীপ নির্বাপিত হয়ে যায়।'

তাহলে পাঠক ভাববে, ওই একটা লোক ছাড়া ওদের কাছে আর কোন লেখক নেই। শরতের এই অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার আর একটা পরিণাম হল যে ছেলেবেলায় লেখা তার যে-সব রচনা বন্ধুদের কাছে ছিল, সেগুলিও তারা খুঁজে পেতে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত করতে লাগল। 'বোঝা'র পর 'বাল্যস্মৃতি', 'হরিচরণ', 'কাশীনাথ', 'অনুপমার প্রেম', 'চন্দ্রনাথ', 'আলো ও ছায়া', এক বছরের মধ্যেই 'সাহিত্য' ও 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়। শরতের কিন্তু এ-সব মোটেও ভাল লাগেনি, তার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না যে এ সব গল্প ছাপা হোক। মনে করত, সেগুলো অপরিণত বয়সের রচনা। অতিশয় ভাবপ্রবণতা ও যুবকোচিত অতিরঞ্জন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে। বার বার চিঠি লিখে সে নিজের রাগ ও মনের বেদনা প্রকাশ করেছিল—'তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল করনি। ওটা 'বোঝা'র জুড়ি, ছেলেবেলার হাত-পাকানোর গল্প। ছাপান তো দূরের কথা লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা, যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোর না, একা 'বোঝা'ই যথেষ্ট হয়েছে।'[৫]

'এবারের 'সাহিত্যে' আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তাহলেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলায় অনেক লেখে, সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেছেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েছেন।'[৬]

'দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। সুরেনরা আমার সব লেখারই বড় তারিফ করে, তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই। ওটা ছাপা হয়, তাও আমার ইচ্ছা নয়।'[৭] 'দেবদাস' নিয়োনা, নেবার চেষ্টাও করো না। ঐ বইটা একেবারে মাতাল হইয়া বোতল বোতল খাইয়া লেখা। ওটার জন্য আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা 'ইম্‌মরাল্'। বেশ্যা চরিত্র ত আছেই, তা ছাড়া আর কি কি আছে ব'লে মনে হয় যেন। আর আগেকার লেখাও প্রকাশ করা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি,......আষাঢ়ের 'যমুনা'য় 'আলো ও ছায়া' বলে একটা অর্ধসমাপ্ত গল্প বেরিয়েছে দেখলাম। আমার আশঙ্কা

৫. ১০ জানুয়ারী ১৯১৩ সাল।
৬. মাঘ (জানুয়ারী) ১৯১৩ সাল।
৭. ৮ই এপ্রিল ১৯১৩ সাল।

হচ্ছে হয়ত বা আমারই লেখা।...হয়ত আমার ছেলেবেলার লেখার অনুকরণে আর কেউ লিখেছে।'[৮]

রবীন্দ্রনাথের মত লিখতে পারবে এ বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তাই তার মনে হয় ছেলেবেলার লেখা গল্পগুলি যদি ছাপা-ই হয় তাহলে চাপার আগে একবার পরিমার্জনার জন্য দেখা দরকার। 'কাশীনাথ' যখন পুস্তককারে ছাপে, যথেষ্ট সংশোধন তাতে করা হয়। পত্রিকায় যখন গল্পটি ছাপা হয় তখন এটির শেষ বড় মর্মান্তিক ছিল, কাশীনাথ নিহত হয় ও কমলা আত্মহত্যা করে। কিন্তু বই যখন ছাপা হয় তখন গল্পটি মিলনান্তক করা হয়।

'সাহিত্য' পত্রিকায় যখন গল্পটি প্রকাশিত হয় তখন হরিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে একটি তরুণ তার সঙ্গে দেখা করে। গল্পটি ছেলেটির খুব ভাল লাগে কিন্তু গল্পের শেষ ভাল লাগেনি। তার আপত্তি শুনে শরৎ বলে, 'শুধু 'কাশীনাথ' কেন, 'সাহিত্য' পত্রিকাটিতে আমার আরো কয়েকটি গল্প বেরিয়েছে সেগুলির সব কটিই আমার ছেলেবয়সের লেখা। আমাকে না বলেই একেবারে ছেপে দিয়েছে, যদি প্রুফও দেখতে দিত তাহলে একটু অন্তত রদবদল করা যেতে পারত।'

হরিকৃষ্ণ পরামর্শ দিয়ে বলে, 'এখন কি আর কোনরকম পরিবর্তন সম্ভব নয় ?'

শরৎ বলল, 'ঠিক বলতে পারছি না বই হিসেবে ছাপবে কি না ? যদি ছাপে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন করব।'

'কাশীনাথ' ছাড়া 'চন্দ্রনাথ' গল্পেও বেশ পরিবর্তন করা হয়। 'চন্দ্রনাথ' গল্প প্রকাশ করা নিয়ে ভারি হাঙ্গামা বাধে। উপেন্দ্রর ইচ্ছে ছিল ওটি 'যমুনা'য় ছাপা হোক, যমুনায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র ও গিরীন্দ্র এতে খুব দুঃখিত হয়ে পড়ে, এ নিয়ে উপেন্দ্রর সঙ্গে তাদের ঝগড়াও হয়, কারণ 'চন্দ্রনাথের' পাণ্ডুলিপি তাদের কাছ থেকেই চেয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুরেন্দ্র এ ব্যাপার শরৎকে লিখে জানাতে শরৎ লেখে, যে অংশটুকু ছাপা হয়ে গেছে তা বাদ দিয়ে পাণ্ডুলিপিখানি যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংশোধন করে সে সেটি যমুনায় পাঠিয়ে দেবে।

সংশোধন করার পর ফণীন্দ্রনাথকে গল্পটি পাঠাবার সময় শরৎ লেখে যে,

৮. ২৫শে জুন ১৯১৩ সাল।

'চন্দ্রনাথ' গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পূর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলায়, অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভবত ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি, তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। ...এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ 'ইম্‌মরালিটি'র সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে।'[১]

যে লোকের উপর চিরটা কাল অনৈতিকতার দোষ আরোপিত করা হয়েছে এবং যে নৈতিকতাকে একটা নতুন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে, সে লোকের মন এ প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল ভেবে ভারি অবাক লাগে। মনে হয় দিশাহীন আরম্ভিক ভাবপ্রবণতা ও আবেগপূর্ণ উগ্রতা সংযত হতে চাইছিল। হয়ত সে জন্যই নতুন কোন লেখা সে খুব পরিশ্রম সহকারে লিখত। যতক্ষণ না মনোমত কথা মনে পড়ত ততক্ষণ পর্যন্ত লেখা কাটাকুটি করত। মনের সুরের সঙ্গে কথার সুর যতক্ষণ না মিলত ততক্ষণ কোন কিছুই তার মনঃপূত হত না। তাই পাণ্ডুলিপি কখনও কখনও এমন কাটাকুটিতে ভরে যেত যে অপরের পক্ষে বোধগম্য হওয়া মুস্কিল হয়ে যেত। একবার একখানি পাণ্ডুলিপি প্রিয়বন্ধু ও সহকর্মী কুমুদিনীকান্ত করকে দিয়ে বলেছিল, 'এ দেখ কত কাটাকুটি করেছি, কোন জায়গা বাকী নেই, শত চেষ্টা করেও তুমি পড়তে পারবে না।'

১. ৩রা মে ১৯১১ সাল।

১২.

'রামের সুমতি'র পর 'পথ নির্দেশ' লেখা শরৎ শুরু করে। আগের মতই যতটুকু সে লিখত অফিসে গিয়ে যোগেন্দ্রনাথকে পড়ার জন্য দিত। দা' ঠাকুরের চায়ের দোকানে বসে এ সব গল্প আলোচনা হত। টিফিনের পর সবাই সেখানে চা খেতে জুটত, কথা কইতে কইতে কখনো কখনো টিফিনের সময় পার হয়ে যেত। দেরি করে অফিসে ঢুকলে সিংহল দেশ-বাসী-বৃদ্ধ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটু হেসে বলতেন, 'বেশ, বেশ আপনারা দুজনে আবার দেরি করে ফিরেছেন।'

দুজনেই লজ্জায় মরমে মরে যেত। এর পর দু-তিন দিন পর্যন্ত নিতান্ত ভাল মানুষের মত টিফিনের পর অফিসে আসত, কিন্তু আবার যে-কে সেই। 'রামের সুমতি'র সঙ্গে যেন শরতের সুমতিও ফিরে এসেছিল। তার মতে 'পথ নির্দেশ' 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের মতে গল্পের শেষ ঠিক হয়নি। রাধাকৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমের উল্লেখ করে যোগেন্দ্রনাথ বলে, 'শরৎ দা, আপনি বলেন যে আপনি বৈষ্ণব, ভাবছি যে বৃন্দাবনের সেই চির কিশোর-কিশোরীদের প্রেমলীলার কথা, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার লেখার যে রকম অসাধারণ ক্ষমতা তাতে মনে হয়, আপনার লেখায় সে ভাবের রস খুব ভাল উৎরোবে।'

শরৎ বলল, 'তোমাদের যেমন রুচি, কিন্তু ওভাবে তো আর গল্প উপন্যাস লেখা যায় না। তুমি তো সব কিছুই ধর্ম মর্ম ও কর্মের চোখ দিয়ে দেখতে চাও।'

যোগেন্দ্র বলল, 'আপনি লেখক, আমি পাঠক, আমারও তো ভাল লাগা উচিত।'

শরৎ গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ সে তো লাগাই উচিত কিন্তু লেখকেরও

নিজস্ব বিচারের একটা ক্ষমতা আছে। অনেকে অনেক রকমের উল্টো-পাল্টা কথা বলে কিন্তু পাঁচজনের মতামতের উপর নির্ভর করে কি কাজ করা যায়? এভাবে সংসার চলতে পারে না।'

আবহাওয়া গরম হয়ে উঠছিল, যোগেন্দ্র চট করে কোন জবাব দিল না; একটু পরে বলল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ শরৎদা; কিন্তু এ কথা তার চেয়েও ঠিক যে, কাউকে জিজ্ঞেস করা হলে সে নিজের পছন্দের কথা নিশ্চয়ই বলবে, যদি না সে নিতান্তই তোষামুদে হয়।'

শরৎ মনে মনে রেগে যায় কিন্তু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, 'বেশ বল, কি করলে তুমি খুশী হও?'

যোগেন্দ্র বলে, 'সে তো আমি তোমায় বলেইছি শরৎদা। এরপর তোমার মর্জি, আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

'ঠিক আছে, দেখি কিছু করতে পারি কি না।'

শরৎ এ প্রসঙ্গ সেখানেই থামিয়ে দেয়। যোগেন্দ্র বুঝতে পারে শরৎ মনঃক্ষুন্ন হয়েছে, কাছে এসে বলল, 'শরৎদা! তুমি যেমন গল্পের শেষটুকু আমায় বলে মনের ভার হাল্কা করে ফেলেছ, তেমনি আমিও নিজের মনের কথা তোমায় বলেছি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, তুমি নিজেদের বিবেচনায় যা ঠিক মনে কর তাই কেন করো না।''

শরৎ বলল, 'না-হে সরকার অন্যায় কিছুই হয়নি, ভাবছি তোমার কথাটাও মন্দ নয়, দেখি কি করতে পারি।'

'নিশ্চয় পারবে শরৎদা, নিশ্চয় পারবে।'

'যদি না পারি সে অপরাধ কিন্তু আমার নয়।'

'বেশ! সেই কথাই রইল অপরাধ তো আমারই শরৎদা।'

যোগেন্দ্রনাথ সরকার লিখেছেন, 'যেদিন সম্পূর্ণ গল্পটি পুনরায় পড়িবার অবকাশ পাইলাম, সেদিন মনে হইল, ঐন্দ্রজালিকের কাঠির স্পর্শে শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আগাগোড়া গল্পটিকে এমন শ্রী সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে, যাহা এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—অনুপম।'[১]

'পথ নির্দেশ' একটি প্রেমের গল্প। হেমনলিনী ও তার মাকে গুণেন্দ্রর আশ্রয়ে এসে থাকতে হয়। এখানেই হেম ও গুণেন্দ্রর মধ্যে প্রেম হয়। দুজনেই পরস্পরকে ঐকান্তিক ভাবে চায় কিন্তু গুণেন্দ্র ব্রাহ্ম। সেই জন্য

১. ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র—যোগেন্দ্রনাথ সরকার।

'হেমের মা গুণেন্দ্রর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হেমের বিয়ে অন্যত্র দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একবছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে আবার সে গুণেন্দ্রর আশ্রয়ে ফিরে আসে। মা বেদনায় ভেঙে পড়ে, এই ব্যথার মধ্যেই মা নিজের ভুল বুঝতে পারে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গুণেন্দ্রকে তার সঙ্গে হেমের পুনর্বিবাহের ইচ্ছে জানিয়ে যান। মেয়েকে তিনি মুখে কিছু বলে যেতে পারেন নি, তাঁর মৃত্যুর পর গুণেন্দ্রও ততখানি সাহসী হয়ে উঠতে পারেনি। এইভাবে তার প্রেম ও দ্বিধার মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ভালবাসাকে মহিমান্বিত করার জন্য দুজনেই কাশী চলে যায়।

প্রথমে শরৎ গুণেন্দ্র ও হেমের মিলনে গল্পের শেষ করেছিল, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তার জন্য বড় বিরোধ করেন। অনেক অন্তর্মন্থনের পর শরৎ তাঁর পরামর্শ মেনে নেয়। যখন গুণেন্দ্র হেমকে কাশীবাসের প্রস্তাব জানায় তখন অশ্রুসিক্ত হেম বলছে, 'চল, কিন্তু এই কি তোমার শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ্য করতে পারব ?'

গুণেন্দ্র বলে, 'পারবে। যখন বুঝবে সংসারে ভালবাসাকে মহামহিমান্বিত করবার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীরে অবজ্ঞায় যায়নি—তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখন সইতে পারবে হেম। উঠে বস—চল, আজই আমরা কাশী যাই। কটা দিন আরো আছি, সে কটা দিনের শেষ সেবা তোমার ভগবানের আশীর্বাদে অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারা-জীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে।'

গল্পের শেষ যোগেন্দ্রনাথ সরকারেরই যে ভাল লেগেছিল তা নয় সৌরীন্দ্রমোহনেরও খুব ভাল লাগে।

শরৎকে যোগেন্দ্র বলে, 'দেখলে তো আমি ঠিকই বলেছিলাম।'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ, সরকার তুমি ঠিকই বলেছিলে। সত্যি সবসময় নিজের ধারণা ঠিক হয়না।'

একদিন সৌরীন্দ্রের কথায় শরৎ 'বড়দিদি'র শেষের দু লাইন কেটে দিয়েছিল, হরিকৃষ্ণের কথায় 'কাশীনাথে'র শেষটুকু বদলে দিয়েছিল, এবারও যোগেন্দ্রর

কথায় 'পথ নির্দেশ'-এর শেষটুকু অন্যভাবে লেখে। অন্তের বিচার ধারা তার অন্তর্মনে প্রেরণা জোগাত, তা মানা বা না-মানা নিজের মর্যাদার বিরুদ্ধে মনে করত না। রাষ্ট্রপতি হিসেবে আব্রাহাম লিংকন নিজের প্রথম ভাষণে বন্ধু সেওয়ার্ড-এর পরামর্শে ভাবনাত্মক আপীলের কয়েকটি কথা যোগ করেছিলেন, সে কথা বহু বছর পরও লোকেরা মনে রেখেছিল।

'পথ নির্দেশ'-এর এই বর্তমান শেষটুকু শরৎ সাহিত্যের মূল ভাবনার সঙ্গে জড়িত। তার প্রেম তো চিরকাল মিলনের অভাবে সম্পূর্ণ ও ব্যথায় মধুর হয়ে উঠেছে সুরদাসের রাধিকার মতো ;—

> "মেরে নয়না বিরহ কি বেলী ভঙ্গ
> সঁচেত নীর নয়নকে সজনী
> মূল পাতাল গঙ্গ।"

শরতের নিজের বিবেচনায় 'পথ নির্দেশ' গল্পটি 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল হয়েছিল। এমন লোকও ছিল এবং আজও আছে যারা মনে করে যে হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধে বিপর্যস্ত ও অসফল প্রেমের গভীর বেদনা সত্ত্বেও চরিত্র-চিত্রনের দৃষ্টিতে 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথ নির্দেশ' অনেকাংশে নীরস। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রের বাইরে একজন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে যে প্রশংসা সে পেয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে উৎসাহজনক মনে করা যেতে পারে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শরৎকে লিখেছিলেন, 'সফলতা কত ক্ষুদ্র, বিফলতা যে কত বড়। আপনার গল্প 'পথ নির্দেশ' পড়িতে পড়িতে ভয় হইয়াছিল যে অত কষ্টের পর সফলতার মোহ ভুলিতে পারিবেন না। কিন্তু দেখিয়া সুখী হইলাম যে, যে-পথটা বড় তাহা নির্দেশ করিতে ভুলিয়া যান নাই।'[২]

'পথ নির্দেশ' তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এ কথা বোধ হয় কেউ জানত না। প্রমথকে লিখেছিল,[৩] 'পথ নির্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা?'

এর পর 'বিন্দুর ছেলে' নামে আর একখানি গল্প সে শুরু করে। এ গল্পের আভাস তার লেখা একটি চিঠিতে পাওয়া যায়, 'রামের সুমতির' মত প্রেমবর্জিত আমাদের বাঙ্গালীর ঘরের কথা—(যাহাতে মানুষের শিক্ষাও হয়) 'সিরিজ অব স্টোরিজ' লিখিব মনে করিয়াছি। বাঙ্গালীর 'আইডিয়েল'

---

২. ৪ ডিসেম্বর ১৯১৩ সাল

৩. মে ১৯১৩ সাল।

অন্তঃপুর যে কি, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়।'

"বিন্দুর ছেলে বলিয়া আর একটা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি—একবার মনে করিয়াছিলাম একবার তোমাকে দেখাইব, কিন্তু সময় হইল না। অবশ্য তোমাদের 'ভারতবর্ষ' কাগজের যোগ্য সেটা মোটেই হয় নাই, তার উপর আবার একটু বড় আয়তনের হইয়া পড়িয়াছে।...তাই, ও কাগজে ছাপান অসম্ভব বুঝিয়াই 'যমুনা'য় পাঠাইয়া দিয়াছি।"

'রামের সুমতি' 'বিন্দুর ছেলে' 'পথ নির্দেশ' ক্রমান্বয়ে এই তিনটি গল্প সম্বন্ধে শরৎ বারবার বন্ধুদের চিঠি লিখেছিল, সেগুলি পড়লে তার মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিন্দুর ছেলে আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্তত: করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম।...যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভাল করিয়াছেন।"[৪]

"পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথ নির্দেশের' কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে, অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া 'রামের সুমতি'র মত একটা নমুনা লিখি—এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যতরকমের সম্বন্ধ আছে—সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে।"[৫]

"বিন্দুর ছেলে পড়ে দেখো।...একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙ্গালীর ঘরের কথা।...বেশী ক্যারেকটার আছে—তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে।...গল্প শেষ করে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ' তবে আবার গল্প কি? 'রামের সুমতি', 'পথ নির্দেশ' 'বিন্দুর ছেলে' সব এই ছাঁচে ঢালা। আচ্ছা 'বিন্দুর ছেলে' পড়ে যদি এমন সাহস দাও যে ওটা তোমাদের 'ভারতবর্ষে' পাঠালেও নিশ্চয় ছাপা হোত তাহলে নিজের ওজন বুঝে দেখবার চেষ্টা করব—এই কথা দিলাম।"[৬]

৪. ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সাল। ফণীন্দ্রকে লেখা।
৫. ডাকমোহর ১২ মে, ১৯১৩ সাল।
৬. ৮ এপ্রিল ১৯১৩ সাল।

"যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে 'রামের সুমতি' যদিও বা লেখা যায় 'পথ নির্দেশ' লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না।...আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এ দেশের লোকের মত দুটো গল্পই সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে একসেলেণ্ট। দ্বিজুবাবু বলেন, গল্পের আদর্শ।"[৭]

শরতের রচনা-প্রক্রিয়া, মান্যতা, তার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব, সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরালে নিহিত উদ্দেশ্য সব কিছুই এই সব চিঠিতে পাওয়া যায়। এ গল্পগুলি তৎকালীন বাংলার প্রবুদ্ধ মানসকে আলোড়িত করে তুলেছে একথা শরৎ বুঝতে পেরেছিল, তাই তার অন্তরে সুপ্ত অহং তার হীনমন্যতাকে ডিঙিয়ে যায়। এই চিঠিটি[৮] (প্রমথ না জানি আরো কত চিঠিই সে লিখেছিল),—'বিন্দুর ছেলে' পড়ে লিখেছিল, "এর চেয়ে ভাল গল্প বাঙ্গলা ভাষায় বার হয়েছে কিনা সন্দেহ। তুমি লিখেছ—'ওটা ভাল হয়নি'—কি মন্দ হয়েছে তুমি জান, আমি বলতেও পারিনা, বুঝতেও পারিনা। তুমি ঐ অছিলা করেছ বোধহয় 'ভারতবর্ষ'কে এটা প্রকাশ করবার গৌরব থেকে বঞ্চিত করবার জন্য।...আমার বিশ্বাস 'ভারতবর্ষ' কেন, এর চেয়ে ঢের খারাপ গল্প প্রকাশ করতে পেলেঅনেক কাগজ ধন্য হয়।...তুমি তো কখনই ঠিক গৃহী নও, বরাবর উদাসীন। তোমার কি করে এত 'কীন অবজারভেশন উইথ মাইনিউটনেস অব ডিটেলস' জন্মাল? অবাক হয়ে গেছি।...যা লিখেছ সবই জানি—কিন্তু এমন সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে যেন নিজের সংসারের ঘটনা।"

মহান টলষ্টয়ের শালী তানিয়া একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি জানি তুমি জমিদার, পিতা, জেনারেল ও সৈন্যদের চরিত্র-চিত্রণে সমর্থ, কিন্তু ভালবাসার দুঃখে বিহ্বল যুবতীর মনের ব্যথা ও মায়ের অনুভূতি কি করে ভাষায় ব্যক্ত কর কিছুতেই বুঝতে পারি না।'

বেচারী তানিয়া হয়ত জানত না যে তার প্রেমের বেদনার তিনি সর্বক্ষণের নীরব সাক্ষী। নিজের স্ত্রীর মধ্যে তিনি নারী ও মাকে যুগপৎ পেয়েছিলেন। শরৎও কত নীরব প্রেমের ব্যথার সাক্ষী, কত সংসারের সুখদুঃখের সে শরিক। প্রথম প্রেমের অসফলতার বেদনা বুকে চেপে শান্তিকে স্ত্রীরূপে পেয়েছিল, আবার তাকে হারিয়েও ছিল। তারপর জীবন সঙ্গিনী হিরণ্ময়ীর প্রেমচ্ছায়ায়

৭. ১০মে ১৯১৩ সাল।

৮. ১৯ জুলাই ১৯১৩ সাল।

সেই উচ্ছৃঙ্খল ব্রাত্য ব্যক্তি জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায়। কিন্তু নিজেকে গোপন করার বিদ্যেয় সে এমনই নিপুণ ছিল, শেষ পর্যন্ত অনেকেই তাকে অবিবাহিত মনে করে। বহুবছর পর হিন্দির সুপ্রসিদ্ধ লেখক জৈনেন্দ্রকুমার যেন তানিয়ার স্বরেই লিখেছেন,—'সেই লোক যে স্ত্রীরূপে কোন নারীকে কোনদিন পান নি, দুর্দান্ত প্রতিভা পেয়েছেন, বাষট্টি বছরের বয়স পেয়েছেন, অসীম মমতায় ভরা আত্মা ও মন পেয়েছেন তবুও নারীকে স্ত্রীরূপে পান নি—সেই মানুষ মানুষের মনকে যতখানি স্পন্দনময় ও সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছেন, কোন সংসারী লোক কি তা পেরেছেন? তাই এই বৈরাগী, সংসারী লোকেদের প্রতি চিরদিন উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

সব মানুষেরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, কিন্তু তাকে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক দৃষ্টি ছাড়া কোন যথার্থ শিল্পীর জন্ম হতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই শরতের সে দৃষ্টি ছিল। এই তিনটি গল্প ছাড়া 'নারীর মূল্য' নামে আর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সে লেখে। 'নারীর ইতিহাস' যেটা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল সেই স্মৃতির আধারেই শরৎ এই প্রবন্ধটি লেখে। 'যমুনা'য় ধারাবাহিক ভাবে সেটি প্রকাশ করা হয়।[৯] কিন্তু নিজের নামে সে এটা ছাপতে দেয়নি, বড়বোন অনিলা দেবীর নামে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। দিদির নাম দিয়েই কয়েকটি মহিলা লেখিকার লেখা বইয়ের সমালোচনা 'নারীর লেখা' নামে লিখেছিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথকে সে বলে, 'আমার দিদির কথা বোধহয় তোমায় বলা হয় নি। এ লেখাটা[১০] তার নামেই ছাপা হবে। সে খুব ভাল লেখাপড়া জানে, কিন্তু গৃহস্থালীর কাজকর্মে এমনই জড়িয়ে পড়েছে যে চর্চা করবার সময় পায়না।'

যদিও প্রবন্ধে শরতের নাম ছিল না তবু অনেক পরিচিত ও অপরিচিত লোক তাকে চিঠি লিখেছিল। প্রবন্ধটির ভাষাশৈলী পাঠকদের খুব ভাল লাগে! শরতের ইচ্ছে ছিল এ-রকমভাবে বারটি 'মূল্যে'র প্রবন্ধ লিখবার। 'নারীর মূল্য', 'ধর্মের মূল্য', 'ঈশ্বরের মূল্য' 'সাহিত্যের মূল্য, 'সমাজের মূল্য' 'অধর্মের মূল্য', 'বেশ্যার মূল্য' ও 'সত্যের মূল্য'। কিছুদিন পর 'সাংখ্যের মূল্য' ও 'বেদান্তের মূল্য', এর সঙ্গে যোগ করা হয়।

---

৯. এপ্রিল থেকে অক্টোবর ১৯১৩ সাল।

১০. পুস্তকরূপে এটি ১৮ মার্চ ১৯২৪ এ প্রকাশিত হয়।

অনেক রকম পরিকল্পনা করা তার একটা নেশা ছিল কিন্তু পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ছন্নছাড়া স্বভাবের দরুন তা আর কার্যকর করা হয়ে উঠত না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি পড়ে প্রশংসা করেন, তখন প্রমথ আর চুপ করে থাকতে পারেনি। রহস্য ফাঁস করে দেয় যে ওটি শরতের লেখা। তাই শরৎ লিখেছে—'লোকে আমার নাম জানলে কি করে? হয় ফণীর দ্বারা, না হয় তোমার দ্বারা এই অনিষ্ট ঘটেছে। এবার কি শুরু করি বল ত? দশটা মূল্যের, বেশ্যার মূল্য আর নেশার মূল্য যা বোধকরি সবচেয়ে ইণ্টারেষ্টিং হত, তাইতেই বন্ধু-বান্ধবের ভীষণ আপত্তি। তারা কিছুতেই রাজী নয় যে, আমি এ দুটো দিদির নাম দিয়ে লিখি। মনে করেছি 'ইভলিউশন অব আইডিয়া অব সোল' শুরু করব। অবশ্য ঠিক 'নারীর মূল্যে'র ধরনেই।'

আবার লেখে—'এক একবার ইচ্ছা করে এইচ স্পেনসার-এর সমস্ত 'সিস্থেটিক ফিলোসফির' একটা বাংলা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য ফিলোসফার যাঁরা স্পেনসার-এর শত্রু-মিত্র তাঁদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া, দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না।'

এ ধরনের চিঠিপত্র দেখলে মনে হয় শরৎ খুব গভীর ভাবে পড়াশোনা করত। কিন্তু কোন কারণবশতঃ 'সমাজধর্মের মূল্য' ছাড়া আর কোন মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ সে লেখেনি। গল্প কাহিনী লেখে বন্ধুদেরও বিশেষ আগ্রহে, তাছাড়া অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। প্রকাশকদের মতে প্রবন্ধ ইত্যাদির চেয়ে যে কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে গল্প লিখলেও বাজারে হাজার কপি অবশ্যই বিকোবে।

প্রবন্ধ না লেখার আর একটা কারণ ছিল বিভূতিভূষণ ভট্ট। সবাই যখন 'নারীর মূল্যে'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন বিভূতিভূষণ প্রবন্ধটির রীতিমত নিন্দে করে। সৌরীন্দ্রমোহনকে সে লেখে,—'মিসেস পঙ্করস্ট (Pankurust) এর আদর্শ আমাদের মধ্যে আনিতে যাওয়া বোধহয় একটু দুঃসাহসিকতা। আমি বুড়িকে (নিরুপমা দেবী) এই স্ত্রী-নাম ধারী উদ্ধত মহাপুরুষের অথবা স্ত্রী লোকের স্বত্ব-রক্ষাকারী ডন্ কুইক্সোট-এর কথার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছি।...'

এ খবর শুনে শরৎ একেবারে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। ঠিক করে এ ধরনের প্রবন্ধ সে আর লিখবে না। সৌরীন্দ্রকে শরৎ লেখে, 'পুঁটুকে (বিভূতিভূষণ)

লিখিয়া দিলাম, বুড়ি যেন এ সম্বন্ধে কিছু না লেখে। লেখার প্রতিবাদ আমার সহ্য হয় না। সেটা গালাগালির মতো দেখায়। যদি আমার লেখার বিরুদ্ধে তোমাদের কিছু বলিবার থাকে, কথায় বলিও। তাহাতে সুবিধা এই, দু-পক্ষের পরস্পরকে বুঝিতে ভুল হয় না এবং বুঝাপড়ার শেষ হয়।'

এক বন্ধুকে সে বলেছিল, 'আমার কথা-সাহিত্যের সবাই প্রশংসা করে, কিন্তু 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি আমি নিজের গল্পের চেয়ে কম সহানুভূতির সঙ্গে লিখিনি।'

যাই হোক, মূল্য নিয়ে আর কোন প্রবন্ধ সে লেখেনি। সাহিত্যের বড়ই দুর্ভাগ্য।

১৩.

'চরিত্রহীন' প্রকাশন নিয়ে বেশ হৈ চৈ চলছিল। 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়লেন যে 'চরিত্রহীন' শেষপর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' না ছাপা হয়ে যায়। প্রমথনাথ বড় আগ্রহী ছিল, শরৎকে লেখে, 'যমুনা' সম্পাদক ফণীবাবু কে, আমি তা জানি না, তবে তোমার উপর এতটা জোর খাটে যে আমাদের এতদিনকার প্রণয়ের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেখিয়া মনে মনে ঈর্ষা হইতেছে।...নতুন 'যমুনা'র প্রেমে পুরাতনদের একেবারে ভোলা কর্তব্য নহে।...তোমার 'চরিত্রহীন' চাই-ই চাই।'

এদিকে প্রমথ নাছোড়-বান্দা, ওদিকে 'সাহিত্য'র সম্পাদক একের পর এক রেজিস্ট্রি চিঠি দিচ্ছে। 'যমুনা'য় 'চরিত্রহীনে'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গেছে, এই রকম বিচিত্র পরিস্থিতিতে শরৎ দারুণ মুস্কিলে পড়ল, প্রমথকে লিখল,—

'বৈশাখের 'যমুনা'য় ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে, 'চরিত্রহীন' শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে। এ অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে

তোমাকে অদেয় আমায় কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, স্থির করা যথার্থ ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে, 'ফলস পজিশন'-এ পড়িবে, এইটাই আমায় দ্বিধায় ফেলিয়াছে—না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না। 'যমুনা'য় ছাপা উচিত কি-না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন তোমার সম্মান অসম্মানের কথা —এইটাই আসল কথা। 'চরিত্রহীনে'র যতটা লিখিয়াছিলাম পাঠাইব মনে করিয়াছি। তুমি যদি সত্যই মনে কর, এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত, তা হলে হয়তো ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয়, এই চেষ্টা করিবে, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন 'এথিক্‌স'-এর স্টুডেন্ট—সত্য স্টুডেন্ট। যাহা হোক, পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো, তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য, সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।'[১]

পাণ্ডুলিপিখানি শরৎ প্রমথকে পাঠিয়ে দেয়। প্রাপ্তি-সংবাদ না পেয়ে অস্থির হয়ে শরৎ অনেকগুলি চিঠি তাকে লেখে।

" 'চরিত্রহীন' পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না। ওটা পড়লে কি? যদি তোমার নিরপেক্ষ মত এই হয় যে, ওটা ভাল হবে না, তা হলে যাতে ভাল হয়, তার চেষ্টা করব। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখেছিলাম এটা 'চরিত্রহীন', ষট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল 'এথিকস' আর 'সাইকোলজি' ধর্ম নয়!'[২]

এ চিঠির উত্তরে প্রমথনাথ জানায়, গল্প তার খুব একটা রুচিকর মনে হয়নি, কারণ উপন্যাসের শুরুতেই একটা মেসের ঝিকে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরে শরৎ লিখল, 'যে লোক জানিয়া শুনিয়া 'মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে, সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ।

১. ১৭ এপ্রিল ১৯১৩ সাল
২. ৩ মে ১৯১৩ সাল।

প্রমথ হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই ! কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রেসারেকশন' পড়েছ কি ? 'হিজ বেস্ট বুক' একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে আমাদের দেশে এখনো অতটা আর্ট বুঝিবার সময় হয় নাই।...আমি উলঙ্গ বলিয়া আর্টকে ঘৃণা করিতে পারিবনা, তবে যাতে এটা 'ইন স্ট্রিক্টেস্ট সেন্স মরাল' হয় তা-ই মন উপসংহার করিব। আমাকে যদি কেহ এ বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত—ঝি লইয়া শুরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়তো আলাদা পথ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম। তা' সে কথা কেহই বলিয়া দেয় নাই। এখন টু লেট্।"৩

প্রমথ পাণ্ডুলিপি ফেরত দিতে দেরি করাতে ফণী পালের মনে ভয় হয় যে হয়তো শরৎ কোন প্রলোভনে পড়ে গেছে। কিন্তু শরৎ তাকে ভরসা দেয় যে 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'তেই ছাপা হবে।

শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সেটি পড়ে রায় দেন যে 'চরিত্রহীন' নিতান্তই অশ্লীল রচনা। কোন ভাল পত্রিকায় ছাপা যেতে পারে না। ভদ্রসমাজে এ উপন্যাস প্রকাশিত করা যায়না। প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ও উপন্যাসটিকে অনৈতিক এবং ছাপার অযোগ্য বলে মত দেন। প্রমথনাথ সব কথা জানিয়ে শরৎকে লেখে যে, 'এ উপন্যাস ছাপা হলে লোকে নিন্দে করবে। এ ধরণের অশ্লীল উপন্যাস তোমার লেখা উচিত হয়নি।'

প্রমথ'র চিঠি পেয়ে শরৎ দারুণ রেগে যায়, তখুনি 'চরিত্রহীন' ফিরিয়ে দেবার জন্য লেখে, আর এও লেখে যে, 'অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না। সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কি করে শুনি ? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধার হয় না। শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে। অস্টিন, ম্যারি কোরেলি প্রভৃতি এবং সারা গ্রেণ্ড সমাজের অনেক ক্ষত উদঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়।...তুমি যে লিখিয়াছ 'চরিত্রহীন' অপরের নামে প্রকাশ করিতে, এইটাতেই আমি সবচেয়ে বেশী ব্যথা পাইয়াছি।

৩. ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, মে-জুন ১৯১৩ সাল।

আমি কি এতই হীন? ভাল মন্দ যাই হোক, 'কনসিকোয়েন্স' আমার ভোগ করা চাই।...এত কুরুচিপূর্ণ তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকিলে ভায়া, এতদিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না।'[৪]

শরৎ নিজের মন দৃঢ় করে ফেলে। তার মনে হয় ছাপার আগেই যে বই নিয়ে এত মাতামাতি ছাপার পর অবশ্যই লোকে তা নিয়ে তীব্র আলোচনা করবে। জবাবের জন্য সে 'রেজারেকশান' ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনা থেকে প্রমাণাদি জোগাড় করে রাখে। তা ছাড়া যে বই নিয়ে এত বিচার বিতর্ক হয় তাতে পাঠক সংখ্যা বাড়ে বৈ কমেনা, নিন্দে করলেও পড়ার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে থাকবে। তা না হলে ফিকে উপন্যাস তো দিন-রাতই ছাপছে, কে সে সব পড়ে?

তার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। 'যমুনা'য় যখন 'চরিত্রহীনে'র প্রথম অংশটুকু ছাপা হয় তখন এমন ঝড় বয় যে খুব কম বই নিয়ে এত আলোড়ন হয়ে থাকবে। ফণীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে শরৎকে জানায়, "চরিত্রহীন' ক্রিয়েটিং এলার্মিং সেন্‌সেশান।"

মনে মনে শরৎ দারুণ খুশি হয়ে উঠল। বাংলা উপন্যাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো সুতীব্রভাবে নিজের রক্ষা কবচ তৈরি করে প্রমথকে লিখল, 'আমি জিজ্ঞাসা করি, কি আছে ওতে? একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হোক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে, আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষপর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্র ঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে, এমনকি আত্মীয় কুটম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিনীকে মনে পড়ে? আব আমার 'চরিত্রহীন' যত অপরাধী?... যাই হোক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝিনা বলিয়া করি না যে, 'চরিত্রহীনে' এক বর্ণও 'ইম্‌মরালিটি' আছে। কুরুচি থাকিতে পারে, কিন্তু যা পাঁচজনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন,' এর মধ্যে 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহারা ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে সে পড়িবে না।'

শরৎ এবার নিজের ভিতরেই আবিষ্কার করল সত্যিকারের সাহিত্যিককে।

৪. ডাক মোহর ১২ মে ১৯১৩ সাল।

১৪.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শরতের প্রশংসক ছিলেন, শরৎও তাঁর মতামতকে শেষ রায় বলে মনে করত। দ্বিজেন্দ্রলাল সে সময় কাব্যে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন তাই 'চরিত্রহীন' তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। পুরোনোর সঙ্গে নতুনের সংগ্রাম চিরদিনের। তিনি যে যুগের মানুষ ছিলেন সে সময়কার চিরাচরিত স্থাপিত মূল্য ও পরম্পরাকে অস্বীকার করা বা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু তবু মনে হয় যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ও সম্পূর্ণ উপন্যাসটি পড়তেন হয়তো তাঁর মত বদলে যেত। কারণ সাবিত্রী মেসের হলেও সতী সাবিত্রী। উচ্চবংশের সুশীলা সু-শিক্ষিতা মেয়ে। পরিস্থিতি তাকে মেসের ঝি হতে বাধ্য করেছে। তার সমস্ত ব্যথা বেদনার মধ্যেও শরৎ তাকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করেনি। কিরণময়ীর দেহজ প্রেমের তুলনায় সাবিত্রীর প্রেম বায়বীয়। সে চির আদর্শবাদিনী তাই তার পদস্খলন হয়নি। কিন্তু তৎকালীন সমাজ সে কথা বুঝতে রাজী ছিল না। সে-সময়কার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীতিবিচারই সবার চেয়ে প্রিয় ছিল। সংস্কার-মুক্ত হয়ে মিথ্যে নৈতিকতার মধ্যে উঁকি মারার সাহস তাদের ছিল না। লোক দেখানো নৈতিকতার শস্তা মুখোশের অন্তরালের কথা শরতের কাছে গোপন ছিলনা, শুধু এইটুকুই, নইলে সে পূর্ণ নৈতিক। এমন কী কিরণময়ীকে সে নষ্ট হতে দেয়নি, দিবাকরের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েও সে চরিত্রবতী।

প্রায় ছ-মাস পর্যন্ত শরতের কোন লেখা 'ভারতবর্ষে' ছাপা হয়নি। তার প্রধান কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু। কথা ছিল 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক হবেন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র। শরৎ প্রমথকে লিখল, 'দ্বিজুবাবুই এ কাজ পারতেন—এ কি সারদাবাবুর দ্বারা হবে? তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ ইনফ্লুয়েন্স পর্যন্ত গেছে।

আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর 'অ্যাপ্রিসিয়েশন'-এর লোভেও লিখতাম। সারদাবাবুর ভালমন্দ বলার দাম কি ? কে গ্রাহ্য করে ?'

শেষ অবধি সারদাবাবু 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হননি। এ ভার শেষপর্যন্ত রায়বাহাদুর জলধর সেন নেন। তাঁর সম্পাদনায় যথাসময়ে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিত্র-সহ 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যা[১] প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সৌষ্ঠব ও শ্রী দেখে সবাই খুব খুশি হয়, কিন্তু শরতের খুব একটা মনে ধরে নি। প্রমথকে লিখল, 'দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও 'ভারতবর্ষ' অক্ষয় হয়ে যেত। এখন এর 'স্ট্যাবিলিটি' সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়।'

হয়তো এসব কারণেই শরৎ বহুদিন পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' লেখা দেয় নি। ডিসেম্বর মাসে 'বিরাজ বউ' নামে একটা লেখা সে পাঠায়। ফণীন্দ্র জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার সমস্যা শরৎ বুঝতো, তাকে অনেকবার বুঝিয়ে দিল যে 'আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজ মনে করি। এর ক্ষতি করে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েছি। সেও 'অ্যাক্যুয়েনটেন্স' নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাতেই একটু ভাবিত হই, না হইলে আর কি!'

'বিরাজ বউ' উপন্যাসটি বর্মায় তার বন্ধুদের খুব ভাল লাগে, কিন্তু বিরাজের অধঃপতন তারা মানতে রাজী নয়। যোগেন্দ্রনাথ সরকার বলল, 'আচ্ছা! বিরাজের আত্মঘাতী হওয়ার চেয়ে যদি তাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া হত আর সেই অবস্থায় মাছ শিকার করতে আসা কোন শখের জমিদার নিজের বজরায় টেনে নিয়ে যেত তা হলেও কি বিরাজের কম পাপ হত? হিন্দু নারী স্বামীর উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে দেবে তারপর আত্মহত্যার চেষ্টা করবে—কি সর্বনাশ! এ ত্রুটির চেয়ে বড় পাপ সংসারে ও শাস্ত্রে আর আছে না কি ? স্বামীর উপর রাগ করে কুলত্যাগ করায় ভাবছি 'ইস্টালীন' এর কতখানি প্রভাব। যদিও সেটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

শরৎ উত্তর দেয়, 'পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। সেক্সপীয়রের রচনা যে ভালভাবে পড়েছে এ প্রমাণ তারা খুব ভালভাবে দিতে পারবে। বলতে পার, সেক্সপীয়রের থেকে কোন শ্রেষ্ঠ লোক পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, যে নর-

১. জুন ১৯১৩ সাল। সেন মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই পদে কাজ করেন।

নারীর চরিত্রকে যথাযথ বুঝতে সক্ষম ?'

এ তর্কের কোনো জবাব যোগেন্দ্রনাথ সরকার দিতে পারেনি। কলকাতা থেকে বন্ধুরা আক্ষেপ করে লিখেছিল, তার উত্তরে শরৎ বলে, 'দিনের পর দিন অনাহার ও মানসিক চিন্তায় জর্জর হয়ে যার শরীর ও মন বিকল হয়ে পড়ে, যে ক্ষণিক উত্তেজনার বশে যা খুশী করতে পারে। মানুষের সে অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

নিজের অভিজ্ঞতায় শরৎ বিশ্বাস করত যে চিরকালের সংসারী গেরস্থ মেয়েমানুষ যদি পতিতা হয় তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই সে লজ্জা-শরম ত্যাগ করে সেই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, কোন পুরুষ তা পারে না।

'বিরাজ বউ' লিখতে শরতের একমাসের কিছু বেশী সময় লাগে, অসীম ধৈর্য সহকারে প্রচুর কাটাকুটি করে যা লিখত, তা সরকারকে পড়ে শোনাত। নিজের লেখা সম্বন্ধে সরকারকে বলে, 'দেখ! যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার এক্সপ্রেশন সহজ ঝর্ণার মত না হয় ততক্ষণ তৃপ্তি পাই না। রাত্রের লেখা দিনে ভুল বলে মনে হয়।'

'এ ভুল কোন ব্যাকরণের ভুল নয়, ভাবের ভাষার অভাব। গ্রামে ঘরে চলতি বাংলার বেশী প্রয়োগ হয়, সেই ভাষা যদি কাব্যতীর্থ বা বিদ্যাসাগরের মত সংস্কৃতময়ী করে তোলা হয় তাহলে যা অবস্থা হবে ঠিক সেই রকম ভুলের কথা বলছি। অর্থাৎ যেটি যেমন হওয়া উচিত, তাই হওয়া ভাল।'

'বিরাজ বউ'-এর প্রথম কিস্তি পাঠাবার সময় যোগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা বলত, গল্পের কি নাম দেওয়া যায় ?' সরকার বলে, 'বিরাজ মোহিনী' রাখলে ভাল হয়।'

'নারে, তার চেয়ে তো 'বিরাজ বউ' নামটা আমার বেশী পছন্দ। মোহিনী চরিত্র যেন ততটা উল্লেখযোগ্য মনে হয় না, ও নাম দেওয়া ঠিক হবে না।'

সরকার বলল, 'অর্থাৎ প্রথমবার যোগেন্দ্র চ্যাটার্জীর কনে বউ, দ্বিতীয়বার শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ', এবার তৃতীয় বার শরৎবাবুর 'বিরাজ বউ' এই তো ?'

'যদি তা হয়, হোক না। তোমার ওই তো দোষ। তাঁর কনে বউ, মেজ বৌ নিয়ে যার যা খুশি করুক, আমার তাতে কি ক্ষতি ?'

বলতে বলতে নীল পেন্সিল দিয়ে পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লিখল, 'বিরাজ বউ' তার তলায় ছোট ছোট অক্ষরে লিখল—গল্প।

সরকার প্রতিবাদ করে বলল, 'তা হবে না। প্রমথর চিঠির কথা মনে নেই? লেখ, উপন্যাস।'

শরৎ গল্প কথাটা কেটে দিয়ে তার জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লিখল—'উপন্যাস'।

লেখকরূপে সম্মান পাবার পর এখন আর পরিচিত লোকেরা ও বন্ধু-বান্ধবেরা তেমন উপেক্ষা করতে সাহস পেত না। ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন যখন রেঙ্গুন যান, তখন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য যে সভার আয়োজন করা হয়, সেই সভার সভাপতির আসনে শরৎকে বসান হয়। জীবনে সেই প্রথম সে সভাপতির আসনে বসে, খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে, এক সের কি দেড় সেরের মত ভারি মালা তার গলায় পরানো হয়, মালার ভারে সোজা হয়ে সে দাঁড়াতে পারছিল না, লেখা ভাষণ—ভারি চমৎকার লেখা—তাও ঠিকমত পড়তে পারে নি।

অনেক কারণে সে নার্ভাস হয়ে পড়ে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে ক্রমশঃ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যে জীবন ক'দিন আগেও তাকে কাটাতে হয়েছে, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকাই আশ্চর্যের ব্যাপার। জ্বর, নিউরলজিক ব্যথা, আমাশা-এ সব তো তার নিত্যসঙ্গী, তার উপর আফিং খেত, রাতে নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হত। তাই বন্ধুরা তাকে লিখল, 'এবার কলকাতায় ফিরে এস।'

কিন্তু শরৎ কারও কথাই শোনে নি, ফণীন্দ্রনাথকে লিখল, 'চাকরি—বাকরি ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতে এই অসুস্থ শরীরে মোটেই পছন্দ করি না। আর কাহারো কাছে গিয়া থাকা—সে ত একেবারেই অসম্ভব। আমি বরং হাসপাতালে মরিব, কিন্তু কিছুতেই কাহারো ঘরে এই পীড়িত দেহ লইয়া গিয়া শেষ রাখা রাখিব না। ওটা আমি ঘৃণা করি।...যদি যাই, আমার বড় ভগিনীর ওখানে গিয়াই থাকিব, কেন না সেইটাই একরকম আমার বাড়িঘর দোর। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো—ক্রমাগত যাইবার জন্যও পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ শরীরে আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমার কেবলি ভয়, পাছে মরিয়া গিয়া তাঁদের বিব্রত করি।'

প্রমথনাথকে সে আগেই জানিয়েছিল, 'একবার যেন দেখা হয় এইটাই মনের শেষ সাধ। গেলে তোমার ওখানেই থাকব। মরি ত সদ্‌গতি হবে—বামুনের কাঁধে চড়ে, পরম মিত্রের মুখ দেখে, শেষ সেবা নিয়ে নিমতলায়

যাওয়া যাবে।'

শরতের বহু চিঠিপত্রে এ ধরনের অসঙ্গতি দেখা যায়। রেঙ্গুন ছাড়ার জন্য সে মনে মনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, হয়তো অফিসের চাকরি ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা, এ' দুয়ের মধ্যে পড়ে সে মনে মনে অস্থির হয়ে পড়ছিল। একটি চিঠিতে সে অফিসের বড় সাহেবের নিন্দে করে লেখে, 'আমাদের অফিস আওয়ারে, নিয়ম এই যে যদি কারও কোনদিন কোন তরফ থেকে 'রিমাইণ্ডার' আসে—ও মাসের জন্য ১০্ হিসেবে জরিমানা 'রিডাক্‌সন'। এই তো সুখের চাকরি।'

'দিন ৩-৪ পূর্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা রিমাইণ্ডার আসে। এত কাজ যে ছোট খাট কাজ আমি দেখতেই পারি না, এটি আমার 'সাব অডিটার' ভৌমিকবাবু ও পেরিয়া স্বামীর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। ইত্যবসরে 'রেজিগ্‌শন্' লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০্ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ্য করে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই পারব না, যা হোক, কি জানি নিউমার্চ দয়া করে কোন কথাই বললেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমার আর 'রেজিগ্‌নেশন্' দেওয়া হল না। কিন্তু শরীর আমার আর বয় না। লেখা-টেকাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

'এতদিন চাকরি কচ্ছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দশায় কখনও পড়িনি। সেদিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে মিত্তির মশাইকেও চিঠি লিখি যে, যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি 'রিজাইন' দিয়ে চলে যাই। তাঁর এখনো জবাব আসবার সময় হয় নি। তবে এও বুঝতে পাচ্ছি, এই সাহেব যদি না যায় শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখি নে—তা হলে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে 'অ্যাপ্লিকেশন' পর্যন্ত 'ফরওয়ার্ড' করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।'

চাকরি ছাড়া শরতের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, অফিসের উচ্চ কর্মচারীদের প্রতি সে খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে। সাহিত্যে মনোনিবেশ করার ফলে অফিসের কাজে গাফিলতি হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো অফিসের কর্তাব্যক্তিরা এটা সহ্য করবেন না। নিউমার্চ সাহেব তেমন মন্দ লোক ছিলেন না, যতটা শরৎ বাড়িয়ে বলেছে। আসলে এতদিন পর্যন্ত উপেক্ষা অবহেলা তুচ্ছতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে তা থেকে মুক্তির আনন্দ তাকে কলকাতায় টানছিল। চাকরি সম্বন্ধে তার মনে কোনোরকম দুর্বলতা ছিল না, তা প্রাইভেট

চাকরিই হোক আর সরকারী চাকরিই হোক না কেন। মনে দুরন্ত বাসনা ছিল যদি কোন পত্রিকায় কাজ জোটে তার চেয়ে ভাল কাজ আর নেই।

'এত বড় বড় কাগজ বার হচ্ছে, আমাকে কেউ সাব এডিটর কি কিছু একটা করে না? অনেক কাজ তাদের করে দিতে পারব। একটা বড় গল্প, একটা ধারাবাহিক ভাল উপন্যাস, একটা প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা-এও আমি দিতে পারব। তাছাড়া ছবি 'জাজ' করা, গানের স্বরলিপির দোষগুণ ধরা, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সাহিত্যিক আলোচনা, এও আমি ক'রে দেব। ১০ টা থেকে ৪।৫ টা পর্যন্ত খাটতে আমি খুব পারি।...আমার বর্মা আর পোষাচ্ছে না। দেশ দেশ মন কচ্ছে।'

রেঙ্গুনের ভদ্র বাঙ্গালী সমাজে তখনও শরতের কোন সম্মানই ছিল না। তার কার্যকলাপ সেখানকার প্রতিষ্ঠিত লোকের চোখে অত্যন্ত দূষণীয় ছিল। তারা শরৎকে চরিত্রহীন বখাটে বলেই মনে করত। এবার কলকাতা থেকে একটি ছেলে এসে শরতের কাছাকাছি একটি বাড়িতে ওঠে।[২] ছেলেটি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চুপচাপ রাস্তার দিকে চেয়ে থাকত। আসা-যাওয়ার পথে শরতের চোখ পড়াতে একদিন জিজ্ঞেস করে, 'একলা চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে কি দেখেন?'

ছেলেটি বলে, 'এখানে নতুন এসেছি, কারও সঙ্গে পরিচয় হয়নি এখনও।'

'তোমার নাম কি?'

'পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।'

শরৎ বলল, 'আমার নাম শরৎ চাটুজ্জ্যে। এখানে অ্যাকাউটেণ্ট জেনারেল অফিসে কেরানী। কাল তুমি আমার বাড়িতে এস।'

শরতের অনাহুত আমন্ত্রণ ছেলেটি অস্বীকার করতে পারে নি। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে তার দরজায় কড়া নাড়ে, দরজা খুলে দেয় শরৎ। ছেলেটি ভেতরে এসে দেখে, দেওয়ালের একদিকে বইয়ে ভরা আলমারি, অপরদিকে টেবিল চেয়ার পাতা, টেবিলের উপর একটা কাঠের বাক্স, কলমদানি, তাতে পাঁচ-ছটা ফাউণ্টেনপেন পর পর সাজানো রয়েছে। ফুলস্কেপ সাইজের চামড়ার বাঁধানো একটা খাতা, প্যাডের উপর গোল করে 'শরৎ' লেখা মনোগ্রাম, আর প্যাডের কাগজে খুব ছোট ছোট মুক্তোর মত অক্ষরে কিছু লেখা রয়েছে।

---

২. ১৯১৩

অক্ষরগুলিতে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে ছেলেটির মন পড়বার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই মুহূর্তেই শরৎ মুখ ফিরিয়ে বলে ওঠে, 'আরে, ও সব পাগলামী, দেখো না। চল ওদিকে বসে আড্ডা জমান যাক, আরো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসেছে।'

পাশের কামরায় এসে দেখে, সতরঞ্চিতে তিন চারজন লোক বসে আছে, তার মধ্যে আবার একজন বর্মী লোকও আছে। শরৎ বলল, 'তুমি বস! আমি এখুনি আসছি।'

একটু পরে শরৎ হাতে একখানা বই নিয়ে ফিরে এল। বইখানি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় যে পবিত্র গাঙ্গুলীর একটা কবিতা বেরিয়েছে, সে কি তোমার লেখা?'

ছেলেটি কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে থাকে। শরৎ খুসি হয়ে বলল, 'এবার তো বাড়িতে একজন কবিরও উদয় হল।'

ঠিক সেই সময় ছেলেটি যে বাড়িতে এসে উঠেছিল, সে বাড়ির চাকর এসে জানায়, 'বাবু আপনাকে এখুনি ডাকছেন।' ছেলেটি বাড়ি যেতে বন্ধু চূড়ান্ত তিরস্কার করে বলল, 'এই তাহলে তোমার কাজ, তার আড্ডায় গিয়ে বসেছ। আমার কথা মেনে যদি সেখানে না যাও ভাল কথা, একে তো বিদেশ তায় রেঙ্গুন, জায়গা মোটেই ভাল নয়।'

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরতের বাল্যবন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিল। শরৎ তাকে ভালবাসলেও 'চরিত্রহীন' বইটির দরুন তার মন চাইছিল না যে তার কাছে সে যায়। কখনও কখনও কবিতা ছাড়া বাদবাকি 'যমুনা'র সবকটি পাতা সে একাই ভরিয়ে তুলত। প্রমথকে যে সব চিঠিপত্র লিখত, তাতেও 'যমুনা'র প্রতি তার ভালবাসা গোপন থাকত না।

'তোমাকে আমার একটা নিবেদন, আমার 'যমুনা'কে একটু স্নেহ কোরো। 'ভারতবর্ষ' যেমন তোমার, 'যমুনা' তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, একটু সে দিকে নজর রেখো ভাই।...তুমি ফণীর উপরে রাগ কোর না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি করে জানবে, তুমি আমার কি এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোক মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি করে জানবে? তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না, প্রমথ।'

'যমুনা' পত্রিকাটির জন্য শরতের চিন্তা-ভাবনার অবধি ছিল না। নতুন

বন্ধু-বান্ধবদেরও বার বার 'যমুনা'য় লেখা দেবার জন্য অনুরোধ করত। সেই সঙ্গে সে সময় যে সব গল্প ইত্যাদি 'যমুনা'য় ছাপা হচ্ছিল সে বিষয়ে আলোচনা সংক্রান্ত একটি চিঠি সে সৌরীন্দ্রমোহনকে লেখে, 'আজকাল মাসিকপত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয়, তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। এবার কার্ত্তিক-এর এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে, অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই—আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির 'প্যাথস'; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজাইয়া লোক ভুলাবার চেষ্টা করা দেখিলে, মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই 'হেল্‌দি' নয়। ছোটগল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।'

এ দুর্দশা থেকে সাহিত্য মুক্ত হোক ও সকল দিক দিয়ে 'যমুনা'র শ্রীবৃদ্ধি হোক, এটুকুই ছিল শরতের মনের ঐকান্তিক কামনা।

১৫.

আসছে বছর[১] যখন দু-মাসের ছুটি নিয়ে শরৎ কলকাতায় এল, সে আসা যেন কোন বিজয়ী রাজকুমারের নিজের রাজত্বে ফিরে আসা। সে এবারেও কোন বন্ধুর কাছে গিয়ে ওঠে নি। নিজের পরিচয় ও সম্মান সম্বন্ধে চিরদিনের মতই উদাসীন হয়ে রইল। বেশভূষা চাল-চলনেও তাকে গ্রাম্য বলে মনে হত, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ও আড্ডা জমানোর নেশা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'যমুনা'র কার্যালয়ে অনেক সাহিত্যিক এসে জড়ো হতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কবি ও কথাশিল্পী সুধীন্দ্রনাথ

১. জুন ১৯১৪

ঠাকুর। শরৎকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন, শরতের চলা-বলা, হাসি ঠাট্টা তামাশা, সবেতেই তিনি আনন্দ পেতেন।

এই বৈঠকে শুধু সাহিত্যিক আলোচনাই হত না, হাস্য পরিহাস অবাধে চলত। শরৎ মুহূর্তের মধ্যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলত, সব গল্পের শেষেই বলত, 'এ আমার জীবনের সত্যি ঘটনা।'

সুধীন্দ্র হেসে বলতেন, 'তা কখনই নয় শরৎ, এ সবই তোমার মনগড়া গল্প।'

শরৎ বলত, 'দেখছেন তো? যখন গল্প লিখি তখন আপনারা বলেন মনন চিন্তন করে লিখি, আর যখন গল্প বলি তখন বলছেন মনগড়া গল্প শোনাচ্ছি। না-মশাই একেবারে সত্যি ঘটনা, যদি আপনার বিশ্বাস না হয় সাক্ষী সাবুদ দিতে পারি।'

সাক্ষী প্রমাণের প্রয়োজন হয়নি, তবে সে সব গল্পের পেছনে নিশ্চয়ই তার কোন অভিজ্ঞতা থাকত। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সহজ স্রোত শরতের জীবনের মূলধন।

সেদিন সন্ধ্যায় সৌরীন্দ্রের পথ চেয়ে শরৎ পায়চারি করছে, সবাই যে যার বাড়ি চলে গেছে, কিন্তু কম্পাউণ্ডের ভেতরে জেলের গাড়ি কয়েদী নিয়ে যাওয়ার জন্য তখনও দাঁড়িয়েছিল। কোন দাগী চোরের মামলা ছিল সেদিন, দু বছরের শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন তার উকিল ছিল। যেই সে বাইরে এসেছে, অমনি মক্কেলের রক্ষিতা এসে পায়ের উপর কেঁদে পড়ল, বলল—'আজ রাত্তিরে আপনার কাছে টাকা নিয়ে আসব, আপনি হাইকোর্টে আপীল করার ব্যবস্থা করুন, সবচেয়ে বড় উকিল ওর জন্য ঠিক করুন।'

সৌরীন্দ্রমোহন তাকে বুঝিয়ে বলে, 'আপীল করে কোন লাভ নেই, অনর্থক পয়সা নষ্ট।' মহিলাটি বলল, 'লাভ হোক আর না হোক আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। টাকার চিন্তা করবেন না, আমি সব গয়নাগাঁটি বেচে দেব।'

সৌরীন্দ্রের কোন যুক্তিই সে মানতে রাজী নয়। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশেরা আসামীকে গাড়ির কাছে নিয়ে এল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে সেখানে গিয়ে দু-চার টাকা পুলিশগুলোর হাতে গুঁজে দিল। মেয়েটির প্রণয়ী তাকে বোঝাল, 'দেখ, হাইকোর্টে যেও না। বাবার কথা শোন। টাকা যদি এভাবে সব খরচ হয়ে যায়, দু-বছর তোমার কাটবে কি করে?'

গাড়ি আসামীকে নিয়ে চলে যেতেই মেয়েটি সৌরীন্দ্রমোহনের দিকে ফিরে

বলল, 'রাতে টাকা নিয়ে আমি আপনার কাছে যাব। মানা করা ওর কর্তব্য ছিল, তা সে করেছে। আমার কর্তব্য আমি করব।'

শরৎ সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা সবই শুনে সৌরীন্দ্রমোহনকে বলল, 'মেয়েটি জোরাল। এ ঘটনা থেকে ওর মনের পরিচয় আমি পেয়েছি, সমাজের চোখে এরা ঘৃণিত, বহিষ্কৃত, কিন্তু এদের মনের ভেতর যে মনুষ্যত্ব আছে তা মরে নি, বড়ই মহৎ। অনেক সতী-সাধ্বী রমনীরাও স্বামীর বিপদে আপদে বিচলিত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে না, আর এতো একজন পতিতা রমণী, এই পতিতাদের কথা আমাদের সাহিত্যে কবে স্থান পাবে?'

শরৎ নিজের সাহিত্যে এই পতিতা মেয়েদের মর্যাদা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বর্মা থাকাকালীন এ-রকম অনেক চরিত্রের সান্নিধ্যে তাকে আসতে হয়েছিল, যাদের ছোটলোক বলা হয়, তাদের কাছে শরৎ অনেক রূপে পরিচিত ছিল। তার মধ্যে তার একটা পরিচয় ছিল হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসেবে। ডাক্তার হিসেবেই কামিনী নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। কামিনী বাংলাদেশের ভাল ঘরের বউ ছিল, কিন্তু একদিন স্বামীর সংসার ছেড়ে একজন কামারের সঙ্গে পালিয়ে যায়। কামারের নাম ছিল শীতলচন্দ্র, কাঁচড়াপাড়ার রেলের কারখানায় কাজ করত। হঠাৎ রেঙ্গুনে ভাল চাকরি পেয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসে, কামিনীও তার সঙ্গে আসে। তার বয়স চব্বিশ পেরিয়ে গিয়েছে কিন্তু যৌবনের ভরা জোয়ারে তখনও ভাটা পড়েনি। তারা শরতের বাড়ির কাছাকাছি থাকত। অফিস যাবার সময় শরৎ তাদের রোজ দেখতে পেত। তারা খুব আনন্দেই ছিল, কামিনীর জন্য শীতলচন্দ্র মদ খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে শরৎ দেখে, কামিনী দরজা ধরে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শরৎ কাছে আসতেই কামিনী বলে, 'দাদা আমার কপাল পুড়লো। আজ চারদিন হল ওর মায়ের দয়া হয়েছে, ভেবেছিলাম ঠিক হয়ে যাবে, এই ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে আপনাকে আর জড়াব না, কিন্তু কাল রাত থেকে ভীষণ জ্বর, সারা গায়ে এত বসন্তের গুটি বেরিয়েছে যে মানুষটাকে এখন চেনা যাচ্ছে না। ব্যথায় কাতরাচ্ছে, আমি তো আর তাকাতে পারছি না, আপনি দয়া করে কোন ওষুধ দিন দাদা।'

একথা বলে কামিনী পায়ে হাত দেবার জন্য যেমনি এগিয়েছে অমনি শরৎ পিছিয়ে এসে বলে, 'তুমি চিন্তা কোর না, আমি আসছি।'

বাড়ি ঢুকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটি নিয়ে তাদের বাসায় পৌঁছল, সেখানে গিয়ে রুগীকে যে অবস্থায় সে দেখল তা বর্ণনা করা যায় না। মাত্র ক'দিনের অসুখে মানুষ এমন বীভৎস কদাকার হয়ে উঠতে পারে ধারণা করা যায় না। চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি তাকে চেনা যাচ্ছিল না। কামিনী কোন রকমে তার বিকৃত মুখখানির কাছে মুখ রেখে বলল, 'শুনছ! দেখ, দাদা এসেছেন। আর কোন ভয় নেই, তাঁর হাতের এক ফোঁটা ওষুধ খেলেই সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।'

রুগীর মনে উৎসাহ দেবার জন্য শরতের ওষুধের সে তারিফ করতে লাগল। রুগীর অবস্থা দেখে এবং যতটুকু শরতের জানা ছিল ওষুধ দিল, তারপর কয়েকদিন পর্যন্ত সকাল সন্ধ্যায় দু-বেলা তাকে দেখতে যেত, কিন্তু রোগের উপশম হয়নি, যন্ত্রণাও ক্রমশঃ বেড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল কিন্তু শীতলচন্দ্রকে কেউ বাঁচাতে পারে নি। কামিনী শোকে-দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়ল, অসুখের সময় আহার নিদ্রা ভুলে কি ভাবে সে তার সেবা করেছিল, কোন সতী-সাধ্বী স্ত্রীও হয়তো এভাবে স্বামী-সেবা করতে পারে না।

শরতের মনও দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে, কোনরকমে মনের দুঃখ সামলে তার শেষকৃত্য করে। পরদিন অফিস যাবার সময় দেখে কামিনীর বাড়িতে তালা ঝুলছে। আশ্চর্য হয়ে আশে-পাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, গতকালই সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

এই সব বস্তিতে এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে, শরৎ ক্রমশঃ সে ঘটনার কথা ভুলে গেল। দু-বছর এমনি ভাবে কেটে যায়, এর মধ্যে শরৎও ঠিকানা বদল করে, নতুন মেসে উঠে অভ্যেস মত বেড়াতে বেরিয়েছে। পথে নেমে দেখে পকেটে চুরুট রয়েছে কিন্তু দেশলাই নেই। সড়কের উপর একটি মনিহারী দোকানে যেতে আশ্চর্য হয়ে গেল শরৎ, যে মহিলাটি গ্রাহকদের সওদা ওজন করে বিক্রি করছিল সে আর কেউ নয়—কামিনী।

কামিনী এই রূপে? এই ভাবে? সারা অঙ্গে গয়না, স্বাস্থ্যের বাঁধুনী, তেমনই মুখে মিষ্টি হাসি। এ কি শীতলচন্দ্রের সেই কামিনী? যে শোকে বিহ্বল হয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল?

শরৎ ভাবছিল অনেক কথাই। ততক্ষণে কিন্তু কামিনী শরৎকে দেখতে পেয়েছে। মাথায় কাপড় দিয়ে পা ছুঁয়ে শরৎকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল,

'দাদা ভাল আছেন তো ?' শরৎ বলল, 'হ্যাঁ আমি ভাল আছি, তুমি বল, তুমি কেমন আছ ? কি খবর ? দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ আনন্দেই আছ ! কি বল ?'

কামিনী বলল, 'আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি দাদা।' তারপর যেন সব পুরনো কথা মনে পড়ে গেল, সজল দুটি চোখ মেলে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যম টানলে মানুষ কি করতে পারে বলুন দাদা ? নইলে তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপনি কত চেষ্টাই না করেছিলেন।'

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এ তাঁরই মামাতো ভাই। বহুদিন থেকে রেঙ্গুনেই আছেন, বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নিত। আপনি একে নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন দাদা, তাঁর অসুখের সময় প্রায়ই আসত। এখন এর দয়াতেই দু-মুঠো খেতে পাচ্ছি, এর দুটি ছোট ছোট ছেলে, মা মরে গেছে। আহা ! সেই শিশু দুটির মুখের দিকে চেয়েই আবার সংসারী হতে হল, তা না হলে একটা পেট, সে একটা যে কোন কাজ করেও ভরাতে পারতাম। কিন্তু লোক খুব ভাল দাদা, একেবারে ঠিক তাঁরই মত—খুব ভালবাসে—আদর যত্ন করে।'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কামিনী আরও না জানি কত কি বলেছিল, শরৎ কেবল একটা কথাই বুঝেছিল যে, এই নতুন সংসারে কামিনী বেশ সুখেই আছে। নতুন প্রেমিককেও খুব ভালবাসে। তার মনে পড়ে গেল শীতলচন্দ্রের অসুখের সময় একটা লোক সেখানে যেত বটে ; জিজ্ঞেস করল,'নিবারণ নাকি ? তার নাম নিবারণ ছিল না ?' কামিনী হেসে ফেলল। মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিয়ে বলল, 'দাদার তো সব কথা মনে আছে দেখছি।'

একটুক্ষণের জন্য শরৎ যেন কোথায় হারিয়ে গেল। শীতলচন্দ্রের ঘরকন্নার মাঝে কামিনীকে সে দেখেছে, সেখানেও তো সুখেই ছিল। তারপর যখন সে অসুখে পড়ে, সেই রুগ্ন মানুষের একান্ত পাশটিতে কামিনীকে দেখেছে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে চিন্তায় আকুলপ্রাণা কামিনী শুকিয়ে যেন পোড়া-কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেই কামিনীকেই সে আবার নিবারণের সংসারের মধ্যে তাকিয়ে দেখছে। সারা-অঙ্গে যেন বসন্তের ছোঁওয়া, রূপ-লাবণ্য ফেটে পড়ছে। শীতল-চন্দ্রকে কামিনী ভালবেসেছিল, নিবারণকেও সে ভালবাসে আর কাঁচড়া-পাড়ার সেই স্বামী যাকে সে ছেড়ে চলে এসেছে, তাকেও নিশ্চয়ই সে ভালবাসত।

শরতের মন খেই হারিয়ে ফেলল। আর একটা গল্প তার মনে পড়ে গেল, নৈহাটীর একটি তরুণ বাঙ্গালী ছেলে, নাম তার যাই হোক্ তাকে দুলালচাঁদ বলে ডাকলেই হল, কলকাতার কোন অফিসে চাকরি করত, রেসের প্রচণ্ড নেশা ছিল তার, তাছাড়া মদের নেশা তো ছিলই। ফলে ধারে কর্জে জড়িয়ে পড়ে। তাগাদা ও কাবুলীর লাঠির ভয়ে একদিন সব দেনা মাথায় করে সে বর্মা পালিয়ে আসে। সে সময় বহু বাঙ্গালীই ধার-কর্জ করে, অফিসের টাকা ভেঙ্গে, জাল জুয়াচুরি করে সাধু সেজে বর্মায় পালিয়ে যেত। কারণ সেখানে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা করার উপায় ছিল না। দুলালচাঁদ সোজা পালিয়ে গিয়ে মান্দালয়ে গিয়ে পৌঁছল, সেখানে কাঠের কারখানায় কেরানীর কাজে লাগল। কারখানা একজন বর্মী ভদ্রলোকের ছিল, সে বেচারী ইংরেজীতে হিসেবপত্র করতে পারত না। দুলালচাঁদ ইংরেজী ভাল জানত, মন লাগিয়ে কাজ-কর্ম করত, বর্মী মনিব তাকে খুব পছন্দ করত। মালিকের পৃথিবী বড়ই সীমাবদ্ধ ছিল। নিজে, মেয়ে ও জামাই-এর বাইরে সে আর কিছু জানত না। জামাইও ভারি অদ্ভুত মানুষ, কোন কাজই সে করত না, খালি শখ-সৌখিনতা নিয়ে মেতে থাকত। ক্রমশঃ দুলালচাঁদ মনিবের পরামর্শদাতা হয়ে উঠল।

ছুটি-ছাটার দিন দুলালচাঁদ মালিকের বাড়িতে অতিথি হত, সেখানে কাজের কথা হত, মনিবের মেয়ের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও হত। বর্মী মেয়েরা ভারতবর্ষের মেয়েদের মতো তেমন লাজুক নয়।

এর কয়েক বছর পর হঠাৎ জামাই মারা গেল। কেউই তার উপর প্রসন্ন ছিল না, মরলে পর সবাই যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার এক বছর পর মালিকও মারা গেল, মেয়েই তখন সব কিছুর মালিক, কিন্তু আসল মালিক দুলালচাঁদ। কারণ যাবতীয় কাজকর্ম সেই দেখাশোনা করত। দু-তিন মাস পর মেয়েটি দুলালচাঁদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে।

দুলালচাঁদ হাতে স্বর্গ পেল। তখুনি রাজী হয়ে গেল, তারপর বর্মী নারীর প্রেমে দুলালচাঁদ হাবুডুবু খেতে লাগল। যে এখন বলতে গেলে রাজা, সত্যিকারের রাজা। মেয়েটিও যেন দুলালচাঁদ বলতে অজ্ঞান। সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে বেশ কটা বছর যখন কেটে গেল তখন একদিন দুলালচাঁদ স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এখানেই যখন চিরটা কাল থাকতে হবে, তখন দেশের বাড়িতে যা কিছু আছে বেচে বুচে নিয়ে আসি কি বল? সেখানে বিধবা বোন ও বুড়ো মা রয়েছেন, তাদেরও একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।'

বর্মী স্ত্রী খুশীমনে স্বামীকে যাবার অনুমতি দেয়, সে বেচারী জানত না যে দুলালচাঁদ বিবাহিত, তার স্ত্রী জীবিত, সন্তানও আছে। দুলালচাঁদ কিছুই তাকে জানায় নি। যাবার সময় স্বামীর হাতে দু-তিন হাজার টাকা আরও তুলে দেয়। কারখানার সব টাকাকড়ি দুলালচাঁদের কাছেই থাকত। দশহাজার টাকা তা থেকে বের করে নিয়ে প্রায় বার-তেরো হাজার টাকা সঙ্গে করে সে কলকাতায় রওয়ানা হল। তার বর্মী স্ত্রী স্টীমার ঘাট পর্যন্ত ছাড়তে আসে, যাবার সময় যত এগিয়ে আসছিল সে ততই কাতর হয়ে পড়ছিল, একসময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। দুলালচাঁদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি সত্যি বলছি, একমাসের ভেতর ফিরে আসব, সেখানে আমারও তো মন লাগবে না।'

স্ত্রী বলল, 'তোমায় যেতে দিতে আমার মন চাইছে না, কিন্তু কি করি? তোমার নিজের কাজ আছে। তাড়াতাড়ি কাজকর্ম মিটিয়ে ফিরে এস, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

জাহাজ ছেড়ে গেল, ক্রমশঃ চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুলালচাঁদ আর কোনদিনই বর্মায় ফিরে যায় নি। দুলালচাঁদ তার আসল নামও ছিল না। স্ত্রীকেও সে নিজের ভুল ঠিকানা দিয়েছিল। মাস গেল, বছর গেল, তিন চার বছর পর্যন্ত তার সেই বর্মী স্ত্রী তার আশায় পথ চেয়ে থাকত। খোঁজ নেবার সে বহুরকম চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মনের ব্যথায় শেষ পর্যন্ত সে বেচারী আর বাঁচেনি।

এ ধরনের চরিত্র শরৎ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছে, এরা তার গল্পের আধার। দুলালচাঁদের এই গল্প শরতের লেখনীর ছোঁয়ায় শ্রীকান্তে (দ্বিতীয় পর্ব) কি দারুণ মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বর্মী নারী শরৎ সাহিত্যে কম দেখা যায় কিন্তু তাদের প্রতি শরতের মনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বর্মী নারীর সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ নয়, কিন্তু তাদের স্বাধীনতাকে সে মনে মনে ঈর্ষা না করে পারত না। 'ঘোমটার বালাই নেই। পুরুষমানুষকে দেখে দৌড়ে পালাতে গিয়ে হোঁচট খাবার ভয় নেই, দ্বিধা-লজ্জার লেশ নেই। যেন ঝর্ণার মত স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে। মেয়েদের এত স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশের পুরুষেরা কি ঠকেছে? তাদের আপাদ-মস্তক আবৃত করে তাদের জীবনকে পঙ্গু করে আমাদের কি কিছু লাভ হয়েছে? আমাদের দেশের মেয়েরাও যদি কোনদিন।......'

১৯০৩ থেকে ১৯১২ র গোড়ার দিক পর্যন্ত শরৎ যেন অন্ধকারে চাপা ছিল। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে নিজের জীবনকে এমন ভাবে তৈরী করে নিয়েছিল, যা তাকে প্রসিদ্ধির চূড়ায় তুলে ধরতে পারে। একজন স্রষ্টার পক্ষে মানব-জীবনকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা অত্যন্ত আবশ্যক। সর্বহারাদের মধ্যে একান্ত তাদেরই হয়ে শরৎ তো তাই করেছিল। তাঁদের অন্তর্মনকে সে চিনতে পেরেছিল। সেই সঙ্গে নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্যও সে খুঁজে পেয়েছিল।

১৬.

'যমুনা' কার্যালয়ে যে সাহিত্যিক বৈঠক হত, তাতে সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার পরিচয়। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি 'যমুনা'র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালকে সাহায্য করতেন। একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি গল্প নির্বাচন করছিলেন, শরৎ সেখানে গিয়ে হাজির। কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁদের দু-জনের মধ্যে ছিল না। হেমেন্দ্র চোখ তুলে চেয়ে একবার দেখলেন, নিতান্ত সাধারণ চেহারা, রোগা পাতলা রুগ্ন শরীর। কালোরংয়ের একটি লোক চটি পরে, একটা কুৎসিত দিশি কুকুর ছানা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল, ছোট পাতলা দাড়ি, পরনে আধ ময়লা কাপড়। অবহেলা ভরে হেমেন্দ্রকুমার রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাও ?'

'ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'তিনি এখনও আসেন নি '

'আমি কি খানিকক্ষণ বসতে পারি ?'

হেমেন্দ্র ভাবলেন কোন দপ্তরী গোছের লোক হবে বোধহয়। তাই কিছু না বলে বেঞ্চির দিকে ইশারা করে বসতে বলে নিজের কাজে মন দিলেন। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। শরৎ কুকুর ছানাটির সঙ্গে খেলা করতে লাগল। কুকুরটি মাঝে মাঝে হেমেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে তার ধুতি ধরে টানাটানি

আরম্ভ করাতে, তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ছিঃ ছিঃ! অফিসের মধ্যে নেড়ি কুকুর,...'

ঠিক সেই মুহূর্তে ফণীবাবু এসে পড়লেন। শরৎকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'একি শরৎবাবু? ওখানে ওই বেঞ্চের উপর কেন বসে রয়েছেন?'

শরৎ আঙুল তুলে হেমেন্দ্রকে দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'উনি আমাকে এখানেই বসতে হুকুম করেছেন।'

ফণীবাবু বললেন, 'না, না, ওই চেয়ারে এসে বসুন! এ কি করেছেন হেমেন্দ্রবাবু? আপনি শরৎবাবুকে চেনেন না?'

হেমেন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ক্ষমা করবেন, কি করেই বা চিনব? আমি তো আগে এঁকে কখনও দেখিনি, ভেবেছিলাম কোন দপ্তরী হবে হয়ত।'

একথা শুনে শরৎ খুব একচোট হাসল, পরে হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। গল্প করতে করতে শরৎ যখন ইয়া বড়া একটা আফিং-এর গুলি মুখে পুরত, ভয় পেয়ে হেমেন্দ্রবাবু জিজ্ঞেস করতেন, 'এ কি করছেন আপনি?'

শরৎ বলত, 'আফিং খাচ্ছি! যদি ভাল লিখতে চাও তাহলে আমার মতো আফিং খাও।'

হেমেন্দ্র বললেন, 'মাফ করবেন মশাই, ওই রকম একটা আফিং-এর গোলা যদি খাই তাহলে আর সুন্দর লেখার অবসরই পাব না! খবর পেয়ে যমদূত ছুটে আসবে।'

কিন্তু শরতের মনে এ সব ব্যাপারে কোন ভয়ডর ছিল না। কখনও কখনও দশ বারো ঘণ্টা অক্লান্তভাবে সে গল্প শোনাতে পারত। রাত দুটো তিনটের সময় ফিরত, একটা কুখ্যাত গলিতে বাস করত, হেমেন্দ্র প্রায়ই তার সঙ্গে আসতেন। রাস্তা চলতে চলতে শরৎ নিজের জীবনের বিচিত্র সব কাহিনী শোনাত। হেমেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতেন, কি সরল এই মানুষটা, কোন কিছুই লুকোতে জানে না।

শরৎ বলল, 'হেমেন্দ্র, এমন কোন নেশা নেই যা আমি করি নি, এমন কোন নোংরা জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। আজ সে সব কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই যে এরপরও আমি নিজের কাছে হেরে যাইনি। আমার মনের ভেতরের মানুষটা চিরদিন নির্বিকার রয়ে গেল।'

কিন্তু সাধারণ মানুষ কি অত গভীর মনের সন্ধান পেতে পারে ? রেঙ্গুনের মতো কলকাতাতেও তাকে নিয়ে অখ্যাতি-অপপ্রচারের শেষ ছিল না। লোকে তাকে বেশ্যাসক্ত, লম্পট, চরিত্রহীন, মদ্যপ কিছু বলতেই বাকি রাখে নি।

একদিন দারুণ বৃষ্টিতে কলকাতার পথ ঘাট জলে জলময় হয়ে উঠল, সেদিন আর বৈঠক বসেনি। ন'টা বাজতে-না-বাজতেই পথ জলশূন্য হয়ে ওঠে। শরৎ ও হেমেন্দ্র যখন বাড়ি ফিরছিল রাস্তায় তখন হাঁটু জল। তাদের আগে আগে একটি স্ত্রীলোক যাচ্ছিল। জলের তোড়ে ভালভাবে চলাই দায়, এরা স্ত্রীলোকটির দিকে ভালভাবে চেয়েও দেখে নি, কিন্তু পরদিন অফিসে পেঁাছে দেখা গেল, রটনা সবার কানে কানে উঠেছে যে গতকাল রাতে শরৎ ও হেমেন্দ্র একজন বেশ্যার পিছু পিছু যাচ্ছিল।

হেমেন্দ্র শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু শরৎ হঠাৎ দারুণ ক্ষেপে গেল। বলল, 'ছিঃ ছিঃ এমন হতভাগা লোকও সব আছে। আমার নামে মিথ্যে এতবড় অপবাদ দেওয়া। আমি বুড়ো মানুষ আর হেমেন্দ্র এখনও ছেলেমানুষ, বয়সের কথাটাও তো একবার ভাবতে হয়।'

শরতের মুখচোখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল রটনাকারী ব্যক্তিকে যদি সে সামনে পেত, মেরে হাড় গোড় গুঁড়িয়ে দিত। যে-লোক বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে সত্যিসত্যিই থাকে, এই অপবাদে তাঁর এমন ক্ষেপে ওঠা কি একটু আশ্চর্য লাগে না ? এ-ঘটনার বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকতে পারে কিন্তু মনের অজান্তে সদাচারী হওয়ার কামনা তার বৈরাগী মনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। শরৎ দুঃসাহসী কিন্তু বিদ্রোহী নয় হয় তো সে জন্যই এই রকম বিরোধাভাস দেখতে পাওয়া যায়।

হেমেন্দ্র ছাড়া দ্বিতীয় স্বনামধন্য লোক যাঁর সঙ্গে শরতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি হলেন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন। তিনি নিজেই একজন বন্ধুর সঙ্গে 'যমুনা'র কার্যালয়ে গিয়েছিলেন। ফণীন্দ্র শরতের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য কিছু বলতে যেতেই শরৎ বলল, 'দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় বহু পুরনো।'

জলধর সেন অবাক হয়ে বলেন, 'আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।'

শরৎ বলল, 'আপনার হয়তো মনে আছে যে, কয়েক বছর আগে 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আপনি ছিলেন বিচারক এবং তাতে 'মন্দির' নামে একটা গল্প প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।'

জলধর সেন বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে প্রায় দেড়-শো গল্প এসেছিল, তার মধ্যে 'মন্দির' গল্পটি আমার সব থেকে ভাল লাগে। আমি গল্পের উপর লিখে দিয়েছিলাম যে, এ-যদি লেখা না ছাড়ে ভবিষ্যতে যশস্বী লেখক হবে। কিন্তু সে গল্পটি তো ভাগলপুরের শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিল।'

শরৎ হেসে বলল, 'গল্পটা আমিই লিখেছিলাম, নিজের নাম দিতে বড় লজ্জা হল তাই সুরেন্দ্র মামার নামে পাঠিয়েছিলাম। দেখলেন তো আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কত পুরনো!' জলধর সেন বললেন, 'এ আমার বড় গৌরবের কথা, এত বড় রত্ন সেদিন চিনতে ভুল করিনি।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জলধর সেন ও শরতের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। শরতের সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে যদি কারুর কোন অবদান থাকে তা হলে তা জলধর সেনের। অনেকবছর পর শরৎ লিখেছিল :[১]

'দাদা যদি লেখার জন্য এত মারামারি না করতেন, গুরুর মত তাগাদার উপর তাগাদা না দিতেন তাহলে আমার মত কুঁড়ে লোকের পক্ষে অর্ধেক কেন, যা লিখেছি তার এক চতুর্থাংশও লিখে উঠতে পারতাম না, বা প্রকাশও হত না।'

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়। শরৎ রবীন্দ্রনাথের পরমভক্ত, রবীন্দ্রনাথও শরতের প্রতিভা চিনতে পেরেছিলেন। কিছুদিন হল তিনি শরতের নতুন লেখা 'পণ্ডিতমশাই' বইখানি পড়েছিলেন।[২]

অসিতকুমার হালদার লিখেছেন,—'আমার মনে আছে 'পণ্ডিত মশাই' পড়ে তিনি বলেছিলেন, বহুদিন হল আমি এধার ওধারের কিছু পড়ি না, কিন্তু 'পণ্ডিত্ মশাই' বইখানি পড়ে মনে হচ্ছে মরুভূমিতে বাদল দেখতে পেয়েছি।

পরে শরতের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় ফিরে আসলে সলজ্জ শরৎকে ধরে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের সামনে উপস্থিত করলাম, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।'

কেউ জানত না সেদিন সেই প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণে গুরু শিষ্যে কি কথা হয়েছিল। কবিগুরুর গৌরবময় দীপ্তি ও রূপ, ফরসা ধপধপে রং, লম্বা দাড়ি, ঢিলেঢালা পোষাক, সুমিষ্ট কথাবার্তা শুনে নিশ্চয় শরৎ তাকে অন্য জগতের

১. ১৯০৩ সাল।

২. অক্টোবর ১৯১৪ সালে প্রয়াগ যাত্রার সময় রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়েছিলেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

মানুষ ভেবে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের রূপ শরতের কাছে চিরদিনের একটা বিস্ময়।

শরতের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না তাই 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' ও 'বিরাজ বউ' বই কটির সর্বসত্বাধিকার সে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে মাত্র তিনশো টাকায় বিক্রী করে দেয়। সে সময় এ সওদা অবশ্য খুব একটা খারাপ ছিল না।

সেই সময়েই ফণীন্দ্রনাথের মাধ্যমে শরৎ 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই' 'চন্দ্রনাথ', 'কাশীনাথ' 'নারীর মূল্য' 'চরিত্রহীন' প্রকাশনের অধিকার 'এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স'-কে দেয়, শুধু প্রথম সংস্করণের এ অধিকার দেওয়া হয়।

ফণীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল শরতের সমস্ত রচনা নিজে প্রকাশ করেন, কিন্তু সে সামর্থ তখন তাঁর ছিল না আর শরতেরও টাকার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ফণীন্দ্রনাথের অনুরোধেই সুধীরচন্দ্র সরকার শরৎকে দুশো টাকা অগ্রিম দেন। আসলে ফণীন্দ্রনাথ চাইতেন না যে শরৎ 'যমুনা' থেকে পৃথক হয়ে যায়।

'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা' ও পণ্ডিত মশাই'[৩] এর প্রকাশন শরতের কলকাতা থাকাকালীন হয়েছিল। 'বিরাজ বউ'[৪] কলকাতা আসার আগেই প্রকাশিত হয়। 'নিষ্কৃতি[৫] 'আলো-আঁধারে' 'মেজদিদি' ও 'দর্পচূর্ণ' ইত্যাদি নতুন ও পুরনো লেখাগুলিও এই সময়ে ছাপা হয়।

'যমুনা' শরৎকে অর্থ দিতে অপরাগ ছিল। সেদিক দিয়ে 'ভারতবর্ষ' ছিল প্রচণ্ড সক্ষম। তাছাড়া 'ভারতবর্ষে' শরতের আবাল্যের সুহৃদ প্রমথনাথ ভট্ট ছিল। সম্পাদক জলধর যেন শরৎকে স্নেহ করতেন, তাছাড়া 'ভারতবর্ষে'র সবাই শরতের গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। ফণীন্দ্রনাথ সবই বুঝতেন মনে মনে ভয়ও হত, তাই একদিন তিনি 'যমুনা'র সম্পাদক পদে শরৎকে প্রতিষ্ঠিত করে বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে দিলেন:

'যমুনার পাঠকগণ বোধহয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান মাস হইতে 'যমুনা'র সম্পাদন-কার্যে যোগদান করিলেন। যমুনার পাঠকগণের নিকটে

৩. বিন্দুর ছেলে, জুলাই ১৯১৪, পরিণীতা ১০ আগষ্ট ১৯১৪, পণ্ডিত মশাই ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সাল।

৪. বিরাজ বউ, মে ১৯১৪ সাল।

৫. এই তিনটি গল্পই যমুনায় ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত—অতএব পরিচিতের নতুন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।'

শরতের নিষেধ সত্ত্বেও 'বড়দিদি' তিনি পুস্তকরূপে প্রকাশিত করেন।[৬] শরৎ বইটি পেয়ে লেখে,[৭] 'তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেও বোধকরি ভাল হইত।'

বইটির আশানুরূপ বিক্রি হয়নি। মাত্র আট আনা দাম রেখেও সারা বছরে চারশো কপি বইও বিক্রি হয়নি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতেন। কিন্তু মনে হয় সে সময়কার পাঠকদের চোখে বইটি 'চরিত্রহীনে'র মতই অশ্লীল ছিল।

এইরকম পরিস্থিতিতে, অপরদিকে শরতের সেই সব বন্ধুরা যারা মনে প্রাণে চাইত যে, 'যমুনা'র সঙ্গে শরতের বিচ্ছেদ ঘটুক, তারা শরৎকে খবর দিল যে 'বড়দিদি' বইটির দরুণ ফণীন্দ্রনাথ প্রচুর পয়সা উপার্জন করেছে। কি জানি কেন, শরৎ এ কথা বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসের একটা কারণ এও হতে পারে যে গুরুদাসের দোকানে তার অন্য বইগুলির বেশ ভাল বিক্রি চলছিল।

একদিন শরৎ যমুনার কার্যালয়ে গিয়ে দেখে ফণীন্দ্রনাথ সেখানে নেই, তার কোন আত্মীয় বসে আছে। শরৎ তাকে বলে,—'বড়দিদি'র সবকটি কপি আমায় দিয়ে দিন, ওগুলো আমার।'

আত্মীয় ভদ্রলোক বলে, 'বই আলমারিতে বন্ধ এবং আমার কাছে চাবি নেই। তিনি এলে তাঁর কাছ থেকে বই নিয়ে যাবেন।'

শরৎ দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে বলল—'আমি অপেক্ষা করতে পারব না। চাবি না থাকে আমি পেরেক দিয়ে তালা খুলে বই নিয়ে যাব।'

সত্যি সত্যিই পেরেকের সাহায্যে শরৎ আলমারীর তালা খুলে ফেলে এবং সবকটি বই মুটের মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে ফণীন্দ্রনাথ দারুণ দুঃখ পেয়েছিল। সেইদিনই বিকেলে সৌরীন্দ্রমোহনকে সে এ কথা জানায়, সেও ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে। সৌরীন্দ্রমোহন শরৎকে বলে, 'জান, তুমি যা করেছ তা অপরাধ, এক ধরনের চুরি। বই ফণীন্দ্রনাথ নিজের খরচে ছেপেছে, ও জিনিস তারই সম্পত্তি।

৬. ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ সাল।
৭. ১০ অক্টোবর ১৯১৩ সাল।

সে যদি কাছারি যায়, তোমার হাজত বাস অবধারিত। তুমি ফণীকে বলনি কেন? তুমি যদি চাইতে সে তোমায় অবশ্যই টাকা দিত, সে কখনও গররাজি নয়। তুমি তো তার বাড়ির লোকের মতই। তোমার জন্য সে কি না করেছে।'

শরৎ এবার বুঝতে পারে সত্যিই সে ভুল কাজ করেছে, ভারি লজ্জিত হয়, কিন্তু 'যমুনা'র সঙ্গে আর তার বনিবনা হয়নি। এবার সে শুধু 'ভারতবর্ষে'র জন্যই লিখতে আরম্ভ করে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই কি এ-ধরনের অপ্রিয় ঘটনা কোনদিন ঘটেছিল? তার জীবনের অনেক প্রবাদ ও অপবাদের মতো এ ঘটনাও কি একটা প্রবাদ হতে পারে না? ফণীন্দ্রনাথের কাছে সে এক পয়সাও নেয়নি, তাছাড়া তার লেখার দরুনই যমুনার গ্রাহক সংখ্যা দুশো থেকে দু-হাজারে পরিণত হয়। গরীব দুঃখীকে দেখামাত্র যে মানুষের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, টাকার লালসা যার কোনদিন ছিল না, সে এ ভাবে চুরি করে বই নিয়ে পালাবে সহসা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। পয়সা দিয়ে শরৎকে কেনা যায় না। প্রমথকে একদিন সে স্পষ্টই বলেছিল, 'আমাকে কিনতে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, তো তোমাদের পাড়াটি তো ছোট।'

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে শরৎকে প্রকাশ্য পথে আনার সবটুকু বৈশিষ্ট্য একা ফণীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। বড় গর্বের সঙ্গে ফণীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন,— 'শরৎকে চিনেছিলেন অনেকেই, কিন্তু তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস কেউ করেনি। 'সাহিত্য'র সম্পাদক সমাজপতি 'চরিত্রহীন' বইটির প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু নিজের পত্রিকায় ছাপার সাহস করেন নি। 'নারীর মূল্য' নারীর নামে কেউ ছাপতে রাজী হয়নি। কিন্তু আমি ছেপেছি। কত গাল মন্দই না শুনতে হয়েছে সেজন্য, কিন্তু আমি ভয় পাই নি।'

'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের সব দোষ কি একা শরতের? বন্ধুদের ভালোবাসা ও পয়সার লোভেই কি ভারতবর্ষের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়, সেটাও হয়তো যুক্তিসঙ্গত একটা কারণ হতে পারে। বর্মায় থাকতে আর তার ভাল লাগছিল না, দেশে ফেরার জন্য টাকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, এ অবস্থায় শরৎকে দোষ দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু এ সব ছাড়াও আরো কারণ ছিল, ফণীন্দ্র স্বভাবতই একটু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক ছিল। বারংবার ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও তার কেবলই ভয় হত ভারতবর্ষের মত বড় পত্রিকা থাকতে

শরৎ হয়তো ছোট পত্রিকায় লিখবে না। চিন্তা করাটা হয়তো তেমন অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে। রেঙ্গুন থেকে লেখা শরতের একটা চিঠি দেখলে[৮] বুঝতে অসুবিধে হয় না, যে সম্পর্কে চিড় ধরেছে। 'আচ্ছা 'যমুনা' আজকাল কি চলে? ফণী নাকি বই ছাপিয়েছে? সে বলত, আপনার এক একটা গল্প আমি ৩০।৪০ বার পড়ে মুখস্থ করে ফেলি। আপনার লেখাই আমার আদর্শ। অথচ এমনি গুরুভক্তি যে, একখানা বইও পাঠালে না। আমি তার সব লেখাই পড়েচি এবং সে সব লেখা যে কি সে তো আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না। অবশ্য নানা কারণে আমিও তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি নাই।' ফণীন্দ্রনাথও একবার বলেছিল, 'প্রত্যেক মিলনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। শরৎ-যমুনা মিলনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। এখন যদি মথুরার রাজসিংহাসনে আহ্বান পেয়ে ব্রজধাম ছেড়ে সে যেতে চায় তা হলে মর্মান্তিক বেদনা পেলেও ব্রজবাসী অভিযোগ করবে না।'

এ রূপক সত্যি না হলেও উদ্দেশ্যর কথা নিশ্চিতরূপে সত্য না হয়ে যায় না।

১৭.

হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি শেষ হবার আগেই শরৎকে একা রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হয়। এসেই বিখ্যাত রচনা 'পল্লীসমাজ' বইখানি লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী সঙ্গে না থাকায় খুব অসুবিধে হচ্ছিল। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমথকে সে লেখে, 'এঁকে তো এবার পাঠানই চাই। আমারও চলে না—তাঁর ত প্রায় আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।...এরা না এলে লিখতেই পারি না। মেসে হয় না—সব লোকেই দেখতে চায়, উঁকি মারে—এই সব উৎপাত। আমি যে অবস্থায় অনেক লিখেছিলাম—ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে আর কিছুই হয়ে উঠছে না—দেখছি।'

৮. ৫ নভেম্বর ১৯১৫ সাল।

'পল্লীসমাজ' শরতের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। বইটিতে শবদাহ ও প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়, সে সময় বাংলাদেশে হাঁপানী ইত্যাদি কতকগুলো রোগের রুগীদের প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম ছিল। সেই সম্বন্ধেই উপন্যাসের একটি চরিত্র গোপাল সরকার রমেশকে বলছে,…'এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্তী ছয়মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া কেহ শব স্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয় মাস কাল তাহার সর্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে; আর তাহারও কিছু নাই। সেজন্য ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বেলা তো প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয় মড়া পড়েই থাকবে?'

সরকার হাসিয়া কহিল, 'উপায় কি বাবু? অশাস্তর কাজ তো আর হতে পারে না! আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে বলুন—যা হোক, মড়া পড়ে থাকবে না; যেমন করে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে! তাই ত ভিক্ষে—হ্যাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?'

'ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারটি পয়সা দেখাইল। কামিনীর মা কহিল, 'সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারিটি হালদার মশাই দিয়েচেন। কিন্তু যেমন করেই হোক না সিকের কমে তো হবে না! তাই বাবু যদি—

'রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তোমরা বাড়ি যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না। আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এ ঘটনা লেখার সময় শরতের নিশ্চয় দাদামশায় মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা মনে পড়ে থাকবে। অনেক বছর আগে জগদ্ধাত্রী পুজোয় ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণদের আপত্তিতে এই দাদামশায় শরৎকে পরিবেশনে বাধা দিয়েছিলেন। সেই দাদামশায় মারা যাওয়াতে ব্রাহ্মণেরা আবার হ্যাঙ্গাম বাধিয়েছিলেন।

'মহেন্দ্রনাথ পীড়িত। সামান্য জ্বর, সেই সঙ্গে রক্ত ওঠে। কবিরাজ বললেন —রক্ত পিত্ত।

গোঁড়াদলের দলপতিরা ঘনঘন আনাগোনা করছেন। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে। দলপতিদের ভেতর একদিন কেউ এলেন না, তাঁদের

চেলা-চামুণ্ডাদের মারফৎ খবর এল—অচিরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ফেল নইলে দহন-বহনের সময় গোল হতে পারে।

—কিসের গোল?

—রোগীর রক্ত উঠছে যে! লোকে স্পর্শ করবে না। বাড়ির চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া ঘনাচ্ছে; অতীব দুঃখের সময়। সে কথায় বড় কেউ কর্ণপাত করলে না; তবু কানাঘুষো চলতে লাগল। মহেন্দ্রনাথ কিন্তু সামলে উঠতে পারলেন না। অষ্টমী না ওই রকম কোন এক তিথিতে তাঁর মৃত্যু হল। আর যাবি কোথা! বিপক্ষ দল এমনই একটা কিছুই কামনা করেছিলেন—তাঁদের খুশী ধরে না আর। অষ্টমীতে দেহ প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থা নেই শাস্ত্রে—অতএব মড়া বাসি হতেই দলপতি মশাই নিজে বাড়ি গিয়ে এই ফতোয়া জারি করে ঘোঁট পাকিয়ে তুললেন। ফলে শবদাহ করার লোক পাওয়া দায় হল।

শবদাহের জন্য তখন যেতে হত বারারির মণ্ট ঘাটে। বাঙ্গালীটোলা থেকে তা তিন-সাড়ে-তিন মাইল পথ; পথও সুগম নয়, জায়গায় জায়গায় খোয়া উঠে তা এক রকম দুর্গম। ফাঁপরে পড়ে গেলেন গাঙ্গুলীরা।'

শরতের ছোটদাদামশাই অঘোরনাথ সাহসী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বললেন, 'হিঁদু শাস্তর কামধেনু, যা চাইবে তাই পাওয়া যাবে তাতে। নানা মুনির নানা মত! তোমরা ভয় পেও না, ব্যবস্থা হবেই হবে।'

অবশেষে ব্যবস্থা হল।

তর্করত্ন মশাই বললেন,—'ও শালা কাব্যতীর্থ, ও ন্যায়ের জানে কি? হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই! অষ্টমী, চতুর্দশী, শনি মঙ্গলবারে জীবিতের দেহ প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মড়া পচাবার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এবং ন্যায়বিরুদ্ধ। এ অসম্ভব কথা। যুক্তি হল সবার বড়—

'যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে'

তর্করত্ন পৈতে লিখে দিলেন এবং তাঁর এক শিষ্য এসে করালেন প্রায়শ্চিত্ত। শব উঠল বাড়ি থেকে।'[১]

'পল্লীসমাজ' লেখার সময় এক বন্ধুর কাছে শরৎ বলেছিল[২], 'পল্লী-সমাজে'র এই রূপ শেষ করিয়া পাঠাইলাম। সেদিন যেমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে ছিলাম, সেটা ভাল বোধ না হওয়ায় 'কনক্লুশান'টা অন্যরূপ

---

১. শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিন-প্রথম খণ্ড,-সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। পৃ—১৭

২. ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সালে।

হইল।...অবশ্য আমি নিজেই জানি 'সরস' বলিতে যা বুঝায়, এ গল্প তার ধার দিয়াও যায় না—নিতান্তই কটমটে পদার্থ খাড়া হয়েছে—তা হোক্‌, দুই একটা ইণ্টারেষ্টিং গল্পও ভাল। প্রবন্ধও ত অনেকে পড়ে।'

আর একটি চিঠিতে লেখে, 'আমার ইচ্ছা লোকে পাঁড়াগাঁয়ের কথায় মানে যেন। এই বইখানিতে একটা মূল কথাই, বিবাহের কথাটাই বলা হয় নি। ইচ্ছা করি এই কথাটি আর একখানা বই-এ বলি।...কলিকাতায় লোকে এ বই-খানিকে কি ভাবে নিলে সেটা জানি না।...বিরুদ্ধ মত কেউ বলে কি?'

'পল্লীসমাজে' দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত সংকীর্ণ কুসংস্কারের আবর্তে আবদ্ধ আজন্ম প্রচলিত গোঁড়ামীতে অন্ধ বাংলাদেশের নিম্নমধ্যমবর্গের পল্লী জীবনের একান্ত সাধাসিধে কিন্তু যথার্থ চিত্রণ তুলে ধরা হয়েছে। শরতের ছেলেবেলা এবং যৌবনের অনেকটা সময় গ্রামেই কাটে। গ্রাম সে ভালবাসতো, সেই ভালোবাসার দাবিতেই সে বইখানি লেখে।

শরৎ একথা স্বীকার করে গেছে যে, 'পাঁড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।...প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভালমন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে।'[৩]

বর্মায় পল্লীসমাজের বেশ ভাল রকম অভ্যর্থনা হয় কিন্তু কলকাতা তীব্র আলোচনায় ফেটে পড়ে। বিধবা রমা রমেশকে কেন ভালবাসবে—তা নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের আক্ষেপ করতে লাগলেন। 'সাহিত্যে'র একজন প্রবীণ সমালোচক সাহিত্যের 'স্বাস্থ্য রক্ষা' নামক গ্রন্থে রমাকে এমন তিরস্কার করেছিলেন,—

'ঠাকরুণ, তুমি বড় বুদ্ধিমতী তাই না? নিজের বুদ্ধিবলে বাপের জমিদারী সামলাচ্ছ, সেই তুমিই বাল্যবন্ধু পরপুরুষকে ভালবাসলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ…?'

এই তীব্র আক্রমণের আর একটা কারণ এই ছিল যে—রমা ও রমেশ যখন

৩. ১০ মার্চ, ১৯১৬ সালে লেখা একটি চিঠি।

পরস্পরকে এত ভালোবাসত, তখন লেখক কেন তাদের বিয়ে দিতে পারেননি। এ অভিযোগের উত্তরে শরৎ লেখে, 'পল্লীসমাজ' বলে আমার একখানা বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিকও তো আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু সমাজ স্বর্গে যায়, কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে এ-সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এতবড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ-জীবনে বিফল ব্যর্থ পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এতবড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না এ-কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হয়ে যেত।'[৪]

'পল্লীসমাজ' ছাড়া সে আরও দুটি উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত ছিল, 'গৃহদাহ' ও 'শ্রীকান্ত'। 'গৃহদাহ' সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত হয়ে পড়ে। তার একটা কারণ শরৎ নিজে, কখন কোথায় কি বলে বসত, আবার অন্য জায়গায় সে কথার প্রতিবাদ করে অন্য কথা পাড়ত। হয়ত এসব সে জেনে বুঝে ইচ্ছে করেই করত, মজা পেত। একটা চিঠিতে সে লেখে, 'এ গল্পটা 'গোরা'র পরেশবাবুর ভাব নেওয়া।...তবে ধরবার জো নেই। সামাজিক-পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে বড় উৎসাহ হয়েছে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার জো নেই।'

তবে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সে অত্যন্ত অনুরক্ত ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কোন লেখাই লেখবার সময় তার অবচেতন

৪. সাহিত্যে 'আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধ থেকে।

মনে একটা কথাই ঘুরে ফিরে অনুরণিত হত, রবীন্দ্রনাথের অমুক রচনার তুলনায় ভাল হবে তো! কিংবা অন্ততঃ তাঁর মতো যেন হয়। বন্ধুদের সে লিখেছিল, 'আমার চেয়ে ভাল নভেল কিংবা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না। যখন এই কথাটা মনে জানে সত্য বলে মনে হবে সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো।'

শরতের মনের এই বিচিত্র মনোগ্রন্থি তাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিত।

বর্মার অফিসে কাজকরাকালীনই 'শ্রীকান্ত' লেখা আরম্ভ করে; 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে তা বের হচ্ছিল। তার প্রথম লেখার সঙ্গে যেমন যোগেন্দ্রনাথ সরকারের নাম জড়িয়ে আছে তেমনই 'শ্রীকান্তের' সঙ্গে কুমুদিনী কান্ত করের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে। অনেকের বিশ্বাস 'শ্রীকান্তের' শ্রীকান্ত স্বয়ং শরৎ আর রাজলক্ষ্মী তার প্রেয়সী। এই রাজলক্ষ্মীর খোঁজ করার জন্য না জানি কত লোকই ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু কেউই তার খোঁজ পায় নি। কি করেই বা পাবে? রাজলক্ষ্মী লেখকের কল্পনার অতৃপ্ত কামনার সঙ্গী। ছেলেবেলার খেলার সাথী ধীরুকে নিয়ে সে 'দেবদাসে'র পারু ও 'শ্রীকান্তের' রাজলক্ষ্মীকে গড়েছিল। শোনা যায়, ধীরুর আসল নাম নাকি রাজলক্ষ্মী ছিল। যৌবনে একবার সে প্রেম ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সে তো রাজলক্ষ্মী হতে পারে? এবং মজঃফরপুরের রাজবালাই বা রাজলক্ষ্মী নয় কেন?

অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন, শরতের মুখ দিয়েও তারা অনেক কথা বলিয়েছেন। অনেকে আবার হিরণ্ময়ী দেবীকেই রাজলক্ষ্মী মনে করেন। ভালবেসে হয়তো কখনও তাঁকে সে লক্ষ্মী বলে ডেকে থাকবে, ব্যস্ অমনি তাঁকে রাজলক্ষ্মী ভেবে নেওয়া হল? একবন্ধু একবার শরৎকে বলেছিল,—বিয়ে করে আপনি মহৎ প্রেমের অমর্যাদা করেছেন। যা একদিন ভাগীরথীর পুণ্য স্বচ্ছ নির্মল জল ছিল, তাতে বাঁধ বেঁধে আপনি পুকুর ও গর্তে পরিণত করেছেন।

একটু চুপ থেকে শরৎ শুধু এটুকুই বলেছিল, 'এ ছাড়া আর তো কোন্ পথ ছিল না। কিন্তু তাকে আমি ছাড়ি নি।'

এ সব কথাগুলিকে কি সত্য বলে মনে করা যেতে পারে? আদৌ নয়। এ যদি সত্যি হয় তাহলে একটি চিঠিতে শরৎ একথা কেমন করে লিখত,[৫]

৫. ১৪ আগষ্ট, ১৯১৯ সাল। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা।

'রাজলক্ষ্মীকে কোথায় পাবে ? ও সব বানানো মিছে গল্প। 'শ্রীকান্ত' একটা উপন্যাস বই তো নয়। ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই।'

কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা এ নিষেধ শুনে তা বলে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তারা হিরণ্ময়ী দেবীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি রাজলক্ষ্মী ?'

এ প্রশ্ন শুনে হিরণ্ময়ী দেবী এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে লোকেদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করাই ছেড়ে দিলেন। সে বেচারী রাজলক্ষ্মীর মতো সুন্দরও ছিল না, ঐশ্বর্যময়ীও নয়। নাচ গান তো দূরের কথা, কথাবার্তাতেও তেমন দক্ষ ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সাধারণ সরল অশিক্ষিতা, কিন্তু ধর্মশীলা পতিব্রতা সেবাপরায়ণা নারী ছিলেন। শরৎকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন ও ভালবাসতেন। দিশাহারা নিরাশ্রিত একটা মানুষের জীবন যাতে সুখী হয় তিনি আপ্রাণ সেই চেষ্টাই করতেন। যথার্থ অর্থে তিনি সমর্পিতা নারী ছিলেন। ভাবপ্রবণ অর্পিতা তপস্যাময়ী এই নারীর জন্যই শরৎ যৌবনে মানুষের উপেক্ষা অপমানে দিশাহারা হয়েও ব্যর্থ হয়ে যান নি। শান্তি দেবী ও হিরণ্ময়ীর স্নেহছায়ায় শরৎ প্রাণবন্ত সাহিত্যের প্রণেতা হতে পেরেছিল। সে ছিল তেজরশ্মিপুঞ্জ এবং তাতে নারীর স্পর্শ চাই-ই। তা না হলে সেই তেজে নিজেই শুধু ভস্ম হয়ে যায় না আশেপাশের অনেক কিছুই সে নষ্ট ও দিক্‌ভ্রষ্ট করে তোলে।

যদিও শ্রীকান্ত শরতের মতই ভবঘুরে বখাটে উচ্ছৃঙ্খল ছিল এবং উপন্যাসের অনেক ঘটনাই ছিল সত্যের উপর আধারিত। এক বন্ধুকে সে লিখেছিল,—'আমার লেখা উপন্যাস পড়বার সময় দয়া করে ঘটনা ও পরিবেশের উপর জোর দেবেন না। ঘটনাকে আমি উপন্যাসের আসল বস্তু বলে মনে করি না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চরিত্র সৃষ্টি করা। ঘটনা সে সঙ্গে আপনা-আপনি এসে পড়ে, চেষ্টা করার দরকার পড়ে না। আমার সৃষ্ট চরিত্রের অন্তরালে কোন কোন জায়গার ঘটনা যথার্থ, সেগুলিকে গল্পের পৃষ্টভূমি হিসেবেই দেখান হয়েছে তার বেশী নয়।'

আর একজন বন্ধুকে সে লেখে,—'শ্রীকান্তে' নিজের কথা তো কিছু আছেই। জীবনের কোন ঘটনাকে সাহিত্যের স্তরে নিয়ে আসবার সময় কখনও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘটনাগুলিকে যোগ করে গল্প লেখার জন্য কল্পনার সাহায্য নিতেই হয়। তুমি তো শিক্ষক। মনে কর তুমি তোমার ছাত্রকে 'আপন গ্রাম' সম্বন্ধে

একটা রচনা লিখতে বলছে, সে গ্রামে না আছে কোন নদী না আছে মন্দির। কিন্তু সে ভাল নম্বর পেতে চায়, এবার ভাব সে কি করবে? আশে পাশের গাঁয়ে যে সব নদী ও মন্দির সে দেখেছে সেগুলিকে সে নিজের গাঁয়ের সঙ্গে যোগ করে রচনাটি লিখবে। সাহিত্যেও সেই একই জিনিস খাটে।'

এখানে 'শ্রীকান্ত' বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। ইন্দ্রনাথ একটি চরিত্র, শ্রীকান্তের ছেলেবেলার সঙ্গী। একদল বলেন, শরৎ ভাগলপুরের ছোটবেলার বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার অর্থাৎ রাজুকেই ইন্দ্রনাথ রূপে চিহ্নিত করেছে। রাজু ও ইন্দ্রনাথ দুজনের স্বভাব প্রায় একই রকম, সে কথা শরৎ নিজেই স্বীকার করেছে।

অন্যদল বলেন, ইন্দ্রনাথ শরতের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। গ্রামে থাকতেই দু-জনের বন্ধুত্ব হয়। বহুমত যদিও রাজেন্দ্রনাথের পক্ষেই, তবুও একথা মানতে দোষ কি যে শরৎ 'ইন্দ্রনাথ' চরিত্র সেই দুটি বাস্তব চরিত্রকে অবলম্বন করেই গড়েছিল।

ঠিক এই রকমই অন্নদা দিদির বাস্তবিকতাকে শরৎ অস্বীকার করেনি। দেবানন্দপুরের সম্পর্কে শরতের বোন অথবা ভাগলপুরের কোন মেয়ে, এ প্রশ্ন এখানে অসঙ্গত। শুধু নাম বদল করে অনেক ঘটনাই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে হুবহু একই রকম বর্ণিত হয়েছে। শরতের লেখনীর চমৎকারিত্বে তা এমনই মনোরম হয়ে উঠেছে যে আসল সত্য খুঁজে পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। নিজের স্বভাবের ছবি আঁকা একটা দারুণ শক্ত কাজ। কোন জিনিসকেই ভালভাবে দেখতে হলে, ভালভাবে বুঝতে হলে দূরত্ব ও ব্যবধানের প্রয়োজন। অত্যন্ত কাছ থেকে কোন জিনিসই ভালভাবে দেখা যায়না। কোন শিল্পীর পক্ষে নিজের ছবি আঁকা যেমন ভয়ঙ্কর শক্ত কাজ তেমনই কোন লেখকের পক্ষেও নিজের চরিত্র চিত্রণ করা ভারী শক্ত ব্যাপার।

'শ্রীকান্ত' চরিত্রে শরৎ নিজেকে চিত্রিত করেছে কিনা তার সোজা উত্তর দিতে হলে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, চিনিকে সন্দেশ বলে ভ্রম করা হবে। অন্যথায় মাঝে মাঝে তার নিজস্ব চরিত্রের একটা ঝলক ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। সব লেখকই নিজের অভিজ্ঞতার জোরেই লিখে থাকেন, সে হিসেবে প্রতিটি লেখকের লেখাই তাদের স্বরচিত জীবনী বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু উপন্যাসের মাধ্যমে ছদ্মরূপে আত্মচরিত্র লেখা শরৎ ঘৃণা করত। বহু বছর পর হিন্দির বিখ্যাত লেখক ইলাচন্দ্র যোশীকে সে বলেছিল,—

'যাদের জীবনকে গভীর ও ব্যাপকরূপে দেখার চোখ নেই, অহংকারে উঁচু প্রাচীরের ওপার দেখার সাহস যাদের নেই, সাহিত্য শিল্পে যারা নিরপেক্ষ ভাব বজায় রাখতে অক্ষম, তারাই জীবনের গোপন কথা উপন্যাসে লিখে জানান।'

শরৎ স্পষ্ট বলেছে, 'শ্রীকান্তে' জীবনের সেই সকল ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জড়িত। যে চরিত্র আমি সৃষ্টি করেছি তাদের অতি নিকট থেকে চেনা ও জানার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে 'শ্রীকান্ত' আমার আত্মচরিত। তবুও লোকেদের ধারনা জানতে পেরে ভালই লাগছে কারণ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমার সৃষ্ট চরিত্র পাঠকদের চোখে প্রাণবন্ত ও সজীব। আমার সাহিত্য যথার্থ জীবনের বড় কাছাকাছি।'

সুরেন্দ্র মামা লিখেছেন, 'অনেকে বলেন, শরৎচন্দ্র সাহিত্যে নিজেকে যতখানি তুলে ধরেছেন, জীবনী হিসেবে সেটুকু যথেষ্ট। আলাদা জীবন চরিতের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র আসলে সাহিত্যে নিজেকে দারুণভাবে লুকিয়েছে, যারা এ কথা জানে না, তাদের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।'

অন্যান্য লেখার বেলাতে যা হয়েছে 'শ্রীকান্ত'র বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শরৎ দোনা-মোনা অবস্থায় প্রকাশককে লেখে, 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য, আমি তাহা মনে করি নাই— এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল সে সকল যে, কোনমতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত' জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকিতে পারে, এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মারফতে পাঠানো।

'যদি বলেন ত আরো লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্যন্তই।[৬] তবে শেষ পর্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে। আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।...অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তাছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে।'[৭]

৬. পুস্তকে এ অংশটুকু প্রকাশিত হয়নি।
৭. ১৫ নভেম্বর ১৯১৫ সালে লেখা।

এর কিছুদিন পর লেখে, 'এ সম্বন্ধে একটা কথা যদি নির্ভয় দেন ত বলি।
এই কাহিনীটাকে সম্পাদক মহাশয়রা দয়া করিয়া যেন নেহাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য
না করেন। আমার বড় আশা আছে—ইহা অন্ততঃ যে সকল লেখা ছাপা হয়
এবং হইয়াছেও তাহাদের নিতান্ত নীচের আসনের যোগ্যও নয়। অনেক
সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যৎ জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমার অনেক চেষ্টা
ও যত্নের জিনিস, অন্ততঃ বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও একটু খাতির পাইবার মত
হইবেই। প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ—তা অনেক সত্যকার ভাল জিনিসেরও
প্রথমটা মন্দ—এমন দেখাও যায়তো। এই আমার কৈফিয়ৎ। এবার ছাপা হবে
কি? হাতের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশাতেই ওটা দেওয়া, সেত
ভূমিকাতেই লেখা আছে।'[৮]

এ চিঠিগুলিতে শরৎ এ ইঙ্গিত দিয়েছে যে, গল্পের সঙ্গে শ্রীকান্তের জীবনের
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আসলে শরতের নিজের জীবন যে রকম বৈচিত্র্য ও
রোমাঞ্চে ভরা, তাই 'শ্রীকান্ত' পড়ে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। শ্রীকান্ত
শরৎ নয়, কিন্তু তবু দু-জনের স্বভাবের কি দারুণ মিল। সহজভাবে দেখতে
হলে 'শ্রীকান্ত'কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হিসেবে দেখা যেতে পারে।

একবার শরৎ বলেছিল,—'লোকে আমার লেখায় আমায় খুঁজতে চায়।
কেউ বলে আমি গোঁড়া হিন্দু, কেউ বলে দারুণ নাস্তিক, কেউ বা আবার বলে
'চরিত্রহীন' নাকি আমারই গল্প, কেউ বিশ্বাস করে 'শ্রীকান্ত' আমার
আত্মচরিত। আমায় নিয়ে যখন এত জল্পনা-কল্পনা, আমি দূরে দাঁড়িয়ে
হাসি।'

প্রত্যেক মহৎ প্রাণ ব্যক্তির নিয়তি হয়ত তাই। যে গান্ধীকে লোকে সন্ত-
সাধু বলে গ্রহণ করেছে, তাঁকেই কেউ কেউ দাম্ভিক-ঠগ বলে মনে করেছে।
বাস্তবিকই গান্ধী একমাত্র মানুষ যে সবকিছুই হতে পারে। সব কিছু হওয়ার
জন্য অনেক বড় হিয়ার দরকার, সে হিয়া শরতের ছিল। জীবনে সে বড় দুঃখ
সয়েছিল, পাপ করেছিল অনেক, কিন্তু সবার উপরে সবকিছুকে অভিজ্ঞতার
রসে সিঞ্চিত করে প্রাণবন্ত করে তোলার মতো প্রাণশক্তি শরৎ ছাড়া আর কার
মধ্যে দেখা যায়?

সে শুধু ভোক্তা নয়, দ্রষ্টা। সাহিত্যের মূল লক্ষ্য সে খুঁজে পেয়েছিল।
চিরাচরিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যে মাথা তুলে দাঁড়ায় সে নিজের অন্তরের অজ্ঞাত

৮. ৭ ডিসেম্বর ১৯১৫ সালে লেখা।

শক্তির বলেই। কেউ বলতে পারে না তার পরিণাম কি দাঁড়াবে। স্বাধীনতা, শক্তিশালীর জন্যই, যোগ্য লোকের পক্ষেই তা লাভপ্রদ। শরতের মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা ছিল তাই সে স্রষ্টা হতে পেরেছিল।

১৮.

এখনও পর্যন্ত সে রেঙ্গুনের চাকরি ছাড়েনি। কিন্তু মন কিছুতেই টিঁকছিল না, অফিসের বাঁধাধরা নিয়মের গণ্ডিতে তার স্বাধীন মনোবৃত্তি হাঁপিয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়ে তাকে চিঠি লেখেন, ভরসা দেন যে মাসিক একশো টাকার ব্যবস্থা তার জন্য তিনি করতে পারবেন। নানান রকম ঝামেলা ও অস্থিরতার মধ্যে তার ভগ্ন স্বাস্থ্য আরও ভেঙ্গে পড়ল। শারীরিক অক্ষমতা যখন মনের দোসর পায় তার ভাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আকাশ-কুসুম হয়ে ওঠে। বন্ধুদের সে বারবার লিখেছিল, 'আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি।...ভয় হয়, হয়ত বা চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।...এই মানসিক চঞ্চলতা বশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা নাই।...আমার কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই।'

তারপর লেখে, 'এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করিনা। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি, বোধকরি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটো বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন।'

শরতের পা ফোলার রোগ কিছুতেই আর সারছিল না। ডাক্তারের মত, বর্মা ছাড়লে হয়ত এ রোগ সেরে যেতেও পারে।

প্রচণ্ড আফিং খাওয়া শরৎ কমায়নি এও স্বাস্থ্য খারাপের একটা কারণ। কারুর পরামর্শে একবার সে আফিং খাওয়া ছাড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে

শরীর আরও খারাপ হয়ে যায়, আফিং খেয়েই সে যাত্রা সে রক্ষা পেয়েছিল। আফিং-এ অভ্যস্ত মানুষ হঠাৎ নেশা ছাড়লে উল্টো বিপত্তি ঘটে এ ঘটনার উল্লেখ করে একটি পত্রে[১] সে লেখে, 'আফিং ছাড়িবার চেষ্টা করিয়াই এত দুঃখ বোধ করি পাইলাম। আর ছাড়িবার নামটিও কখনো মুখে আনিব না, বেশ করিয়া পুনরায় ধরিয়া তবে পা ভাল হইল। এইবার আর একটু ভাল করিয়া ধরিলে হাতটাও ভাল হইবে আশা হয়। আফিং কম করিয়া মাথাটা একেবারে খালি হইবার মত হইয়াছিল। আবার ধীরে ধীরে বেশ ভরিয়া আসিতেছে। কি জিনিস! আপনাদেরও ধরা বোধ হয় ভাল। আমি ত মনে করি সমস্ত ভদ্রলোকেরই এটা সেবন করা কর্তব্য।'

কিন্তু আফিং-এর কথা থাক, তামাশা করা শরতের স্বভাব। সে যাই হোক বর্মা ছাড়ার সংকল্প মনে মনে সে নিশ্চিত করে ফেলে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখে, 'আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই তাহা হইলে হয়ত বা টাকাকড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়। ...আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব।...এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া—আপনার আমার জন্য এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।'[২]

কখনও কখনও শরতের অভিমানী মন বেদনা ও করুণায় অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠত। পঙ্গু হওয়া ও টাকা পাঠাবার কথা সে বারবার লেখে। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শেষপর্যন্ত টাকা পাঠিয়ে দেন। শরৎ তাঁকে খবর দেয় এগারই এপ্রিল সে রওনা হচ্ছে। মন এত বিষণ্ন যে কোন কাজেই হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। দিলেও তা ভাল হয় না। ভাবে কলকাতা যাবার পরই আবার লিখবে।

এই সময়েই রেঙ্গুনে এমন একটা কাণ্ড ঘটে যে শরতের সে স্থান ত্যাগ করা ছাড়া আর পথ ছিল না। অফিসের কাজে কোন কালেই তার মন লাগত না, কাজ জমে থাকত, নালিশ বড় সাহেবের কানে উঠত। কয়েকবার তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ফল হয়নি। একদিন অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট বার্ণাড-এর সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া বেধে যায়, তিনি কোন

১. ৫ অক্টোবর ১৯১৫ সাল।
২. ১৫ জানুয়ারী, ১৯১৬ সাল।

ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, শরৎ জানায়—সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তার কাছে কোন ফাইল নেই।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় তার দেরাজের মধ্যেই ফাইল রাখা রয়েছে। বার্ণাড দারুণ রেগে যান। সবই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হয়ে পড়েছিল, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয় আর কি। শরৎ যেমন রোগা পাতলা, অপরদিকে বার্ণাডের তেমনই সুস্থ সবল শক্তিমান চেহারা। হাতাহাতি মারামারিতে শরৎ বেশী চোট পেয়েছিল। কাপড়-চোপড় রক্তে ভেসে যায়। রিপোর্ট বড় সাহেবের কানে যেতে তিনি ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে দোষ বার্ণাডেরই বেশী। তৎক্ষণাৎ বার্ণাডকে বরখাস্ত করা হয়। পরে শোনা যায় নব্বুই টাকা জরিমানাও করা হয় তাকে, এবং সে টাকা যেন শরৎকে দেওয়া হয়, এ নির্দেশও জারী হয়।

এ কথাও শোনা যায় যে এ রিপোর্ট যখন একাউনটেন্ট জেনারেলের কাছে যায়, তিনি শরৎকে বলেছিলেন, 'তুমি বার্নাডের বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছ, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে স্টেপ নেব। কিন্তু মনুষ্যত্বের স্তর থেকে তুমি নেমে গিয়েছ। আঘাতের পরিবর্তে যদি তুমিও আঘাত করতে এবং তারপর আমার কাছে আসতে তাহলে বুঝতাম।'

এ সব কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি নাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি সত্যি।

সে যাই হোক রেঙ্গুন পরিত্যাগের কল্পনা তার সুনিশ্চিত ছিলই। বন্ধুরাও বলত, 'তুমি এত ভাল গল্প লেখ, তোমার এত নাম, কেন অনর্থক অফিসে পড়ে রয়েছ। চাকরি ছেড়ে লেখায় মন দাও, তোমার পক্ষে সেই ভাল।'

সাহিত্যে মজা ছিল, অর্থও ছিল। শরৎ পরিশ্রমী কোনদিনই ছিল না। অফিসের কাজে গাফিলতি হওয়া এ ক্ষেত্রে অনিবার্য, শরৎ সে সব কথা ভেবে চাকরিতে পদত্যাগ পত্র দেয়। এক বছরের ছুটি বাকি ছিল, তা নিয়ে কলকাতার পথে রওনা হয়ে পড়ল। বর্মা আর সে ফিরে যায়নি 'কিন্তু ঐতিহাসিকেরা কেমন করে এ কথা ভুলে যাবেন যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পুনর্জন্ম বর্মাতেই হয়েছিল। 'শ্রীকান্ত' 'চরিত্রহীন' 'ছবি' 'পথের দাবী' এই বইগুলিতে তার বর্মা প্রবাসের ছাপ রয়েছে। বর্মা প্রবাসে সে বহু উচ্চস্তরের ধীমান লোকের সংস্পর্শে এসেছিল, কিন্তু তার বেশীর ভাগ বন্ধু-বান্ধব অমুল্লেখ্য অত্যন্ত সাধারণ অজানা-অচেনা মানুষ ছিল। তাদের প্রেরণাতেই এই দরিদ্র অর্ধ-শিক্ষিত ভবঘুরে তরুণ সাহিত্যের সেই স্থানটিতে প্রবেশ করতে পেয়েছিল, যেখানে বিরাট

শ্রেষ্ঠত্ব দুহাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

বর্মা ছাড়ার চার মাসের ভেতর তার লেখা আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হয়। 'মেজদিদি'[৩], 'পল্লীসমাজ'[৪], ও 'চন্দ্রনাথ'।[৫]

দিশাহারা মানুষের দিশান্বেষনের পালা শেষ হল, দিক্ সে খুঁজে পেল।

৩. ডিসেম্বর, ১৯১৫ সাল।

৪ ১৫ জানুয়ারী, ১৯১৬ সাল।

৫. ১২ মার্চ, ১৯১৬ সাল।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	৭	মোতিলাল	বৈকুণ্ঠনাথ
৩৩	১৩	তাঁর ছাত্র	তাঁর পুত্র
৩৬	২১	সন্ত্রাসবাদী	বিপ্লবী
৩৯	১০	থেকে গেল	বদলে গেল
৫২	১৪	আবার অগ্রণী	সবার অগ্রণী
৫৭	৫	মুড়ি	ঘুড়ি
৭২	১১	শ্রীনথার ভট্টের	শ্রীনফর ভট্টের
৯০	৪	কেন কিছুরই	কোন কিছুরই
১০৪	২৪	রেঙ্গুন কোর্টের কাছে	রেঙ্গুন পোর্টের কাছে
১১৫	৯	এই বানার্ড লাইব্রেরি	এই বানার্ড লাইব্রেরির জন্যে
১২২	১৭	বহুমুখী প্রতিভাশালী ধনী	বহুমুখী প্রতিভাময়ী
১২৪	১৮	আয়ানগো	ভ্যান গগ্
১৫৫	২৪	তাই বউ বড়	তাই বড় বউ
১৬২	২৮	মানে নিরুপমা, সুরেশ	মানে নিরুপমা, সুরেন
১৭৮	১০	সঁচেত	সিঁচত
১৮৫	৫	মরাল' হয় তাই-মন	মরাল' হয় তাইমত
১৮৭	৮	সাবিত্রী মেসের হলেও	সাবিত্রী মেসের ঝি হলেও
২০০	২৪-৩০	'ঘোমটার বালাই··· কোনদিন।'···	'ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন—যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে।... রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমনঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! অমাদের মেয়ে-রাও যদি এমনি একদিন···।'
২০৯	১৯	যেমন করেই হোক না সিকের কমে	যেমন করেই হোক ন' সিকের কমে